# সাহিত্য অঙ্গন

## (সাহিত্য আংগন // Sahitya Angan)

**ISSN : 2394 4889 Vol : X, Issue : XIX, January-June 2024**

**Website : www.sahityaangan.com**

মুখ্য সম্পাদক

*ড. জয়গোপাল মণ্ডল*

***(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)***

কার্যকরী সম্পাদক

*ড. সমরেশ ভৌমিক*

*ড. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়*

*ড. মৌসুমী সাহা*

: প্রাপ্তিস্থান :

পাতিরাম, দে'জ পাবলিশিং, দে বুক স্টোর এবং ধ্যানবিন্দু

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

অভিষেক টাওয়ার, ৪র্থ তল, ফ্ল্যাট নং-২

কলাকুশমা, ডাক-কে. জি. আশ্রম, ধানবাদ-৩২৮১০০৯

**SAHITYA ANGAN**
**An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual**
**Peer-reviewed Journal**
**ISSN : 2394 4889 Vol : X, Issue : XIX, January-June 2024**

**Chief Editor :**
Dr. Jaygopal Mandal

**Working Editor :**
Dr. Samaresh Bhowmik
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Dr. Mousumi Saha

© Publisher

**Type Setting & Cover Disign :**
Manik Sahu
Mob : 9830950380

**Printing and Binding :**
**Granco Process**
44, Biplabi Pulin Das Street
Kolkata - 700 009
Ph. : 9331801957

**Price : 350.00**

**Published By :**
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127
Phone : 09830633202 / 7003488354
E-mail : joygopalvbu@gmail.com,
Website : www.sahityaangan.com

**Advisory Board :**

Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata
Prof (Dr) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.
Amar Mitra, (Katha Sahityik : Bankim & Ananda Awarded)
Professor (Dr.) Bikash Chandra Paul, Dept. of Bengali, University
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik), Kasba, Kolkata
Dr. Ritam Mukhopadhyay, Presidency University, Kolkata
Dr. Barendu Mondal, Jadavpur University, Kolkata
Dr. Prabir Pramanik, University of Kalyani, Nadia, W.B.

**Members from the other Countries :**

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh)
Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

**Working Editor :**

Dr. Samaresh Bhowmik
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Dr. Mousumi Saha

**Working Editorial Board :**

Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Soma Bhadra Roy, Associate Professor, West Bengal State University, West Bengal
Dr. Sampa Basu, Associate Professor, Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Swapan Kumar Paramanik, SACT, Magrahat College, 24 pgs. (South)
Ujwal Kumar Pramanik, SACT, Saltora Netaji Centenary College, Bankura

# বিষয়-সূচি

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, জুন ২০২৪—জয়গোপাল মন্ডল/৭
হেমিংওয়ে ও সমরেশ বসু: মুকুরিত ভাবনা —তরুণ মুখোপাধ্যায়/১২
বাংলা সাহিত্যের উত্তমকুমার ঃ সমরেশ বসু —রবীন বসু/১৫
পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে বাস্তব রুপায়ণ : 'কুন্তী সংবাদ'—নিত্যানন্দ মণ্ডল/২১
সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গ: সমাজ পরিবর্তনের বিশ্বস্ত দলিল—নয়ন সাহা/২৬
বন্দি 'প্রজাপতি',র মুক্তির আখ্যান—সুচরিতা চক্রবর্তী/৩২
সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' : অবক্ষয়িত সমাজের প্রতিচ্ছবি—পুতুল বৈদ্য/৩৮
অমৃত কুম্ভের খোঁজে 'কালকূট'—সমরেশ বসু—অর্পণ দাস/৪৫
জাল, জলের জীবন ও মাঝিমাল্লা: সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস—বৈশালী মণ্ডল/৫২
'বি. টি. রোডের ধারে' : ব্রাত্য জীবন-সংগ্রামের আখ্যান—সৌভিক বিশ্বাস/৬৩
শ্রমিকভাবনা : বি টি রোডের ধারে—খাদিজা খাতুন/৭০
সমরেশ বসুর 'বাথান' ও 'গঙ্গা' উপন্যাস : অন্য কোন সাধনার ফল—দীপ্তি রায়/৭৫
সমরেশ বসু : বাংলা উপন্যাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র—অর্পিতা দেবনাথ/৮২
সমরেশ বসুর পাড়ি : মানবিকতার একটি বিশ্বস্ত দলিল—অর্পণ রায়/৮৯
সমকালীন সমাজ : সমরেশ বসুর সওদাগর উপন্যাস—সৈয়দ রাফিকা সুলতানা/৯৪
'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' কিংবা নির্ভেজাল
কমিউনিজমের সন্ধানে—প্রীতম চক্রবর্তী/১০০
শহীদের মা ও হাজার চুরাশির মা : রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে
তুলনামূলক পাঠ—হিমাদ্রি মণ্ডল/১১২
'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ও 'কোথায় পাবো তারে'-কালকূটের
ভারতবোধের আধার—মিঠু সরকার/১২১
পুরাণের প্রতিফলকে কালকূটের 'শাম্বাদিত্য'—রিয়া দাড়িয়া/১২৭
জনজীবনের বহুমাত্রিকতা : প্রসঙ্গ সমরেশ বসুর গল্পগ্রন্থ
'মরশুমের একদিন'—সুকান্ত মণ্ডল/১৩৪
সমরেশ বসুর 'আলোয় ফেরা' : অন্ধকার পিয়াসী এক 'আমি'-র গল্প—শ্রীনাথ মাইতি/১৪২

সমরেশ বসুর গল্পে রাজনৈতিক প্রত্যয় : সাম্যবাদ—মানিক বিশ্বাস/১৫০
সমরেশ বসুর গল্প: "আঘাত বিদীর্ণ সিক্ত শত ক্ষত মুখ"—উজ্জ্বল প্রামাণিক/১৫৯
সমরেশ বসুর ছোটগল্প : বেদনার্ত জীবন অস্তিত্বের আড়ালে
উত্তরণের গভীর আহ্বান—চন্দ্রিমা মৈত্র/১৬৬
সমরেশ বসু-র ছোটগল্প 'অকাল বৃষ্টি' : একটি উত্তরণের আখ্যান—সুব্রত দাস/১৭১
সমরেশ বসুর ছোটগল্প : প্রসঙ্গ যৌনতা—সুজিত মণ্ডল/১৭৪
মূল্যবোধ : সমরেশ বসুর ছোটগল্প—গোলক সরকার/১৮৫
যে জীবন দেখে না কেউ ফিরে: 'মরেছে প্যাল্লা ফরসা'—অনসূয়া কুণ্ডু/১৯১
সমরেশ বসুর 'নররাক্ষস' : অতীতচারী এক নররাক্ষসের জীবনদর্শন—শোভা সাঁতরা/১৯৯
আদাব—কাহিনী—সমরেশ বসু / নাট্যরূপ : জয়গোপাল মণ্ডল/২০৫

❐ *কবি গণেশ বসুর স্মরণে*

কবি গণেশ বসুর কাব্যচর্চা ঃ এক অসম দ্বৈরথের আখ্যান —অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়/২১২
গণেশ বসু'র কবিতা : সময় ও জীবনের কণ্ঠস্বর—সপ্তর্ষি রায়/২২০
কবি গণেশ বসুর 'সমুদ্র মহিষ' ও 'নিজের মুখোমুখি' হয়ে লেখা
অন্যান্য কবিতা কবি গণেশ বসু —স্বরাজ কুমার দাশ/২২৬
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—হাসি বসু/২৩৩
একাকীত্বের ইচ্ছামৃত্যু—ডাঃ কনীনিকা বসু সাহা/২৩৬
শিক্ষক গণেশ বসু স্মরণে—ডাঃ চন্দন সাহা/২৪০
জ্ঞানবৃদ্ধ কবি গণেশ বসুর রসবোধের গল্প—তাপস কুমার কোলে/২৪২

❐ *সমরেশ মজুমদার স্মরণে*

স্মরণে মননে সমরেশ মজুমদার—অর্পিতা ঘোষ পালিত/২৪৭
সমরেশ মজুমদার : তাঁর সাহিত্যিক পথ এবং বাঙালি সংস্কৃতির
সাথে যোগাযোগ—অমিতাভ ব্যানার্জী/২৫৩

❐ *হাসান আজিজুল হক স্মরণে*

একটা করবী গাছের পাশে স্বয়ং হাসান—তাপস রায়/২৬১

## আত্মজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব—

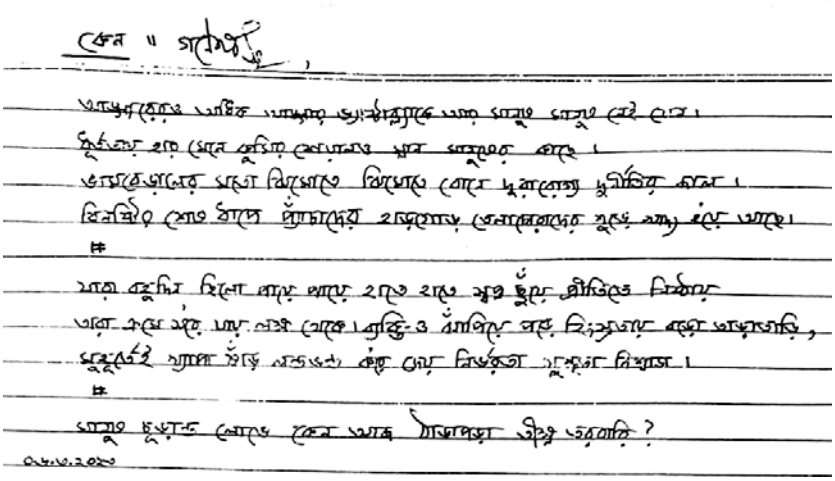

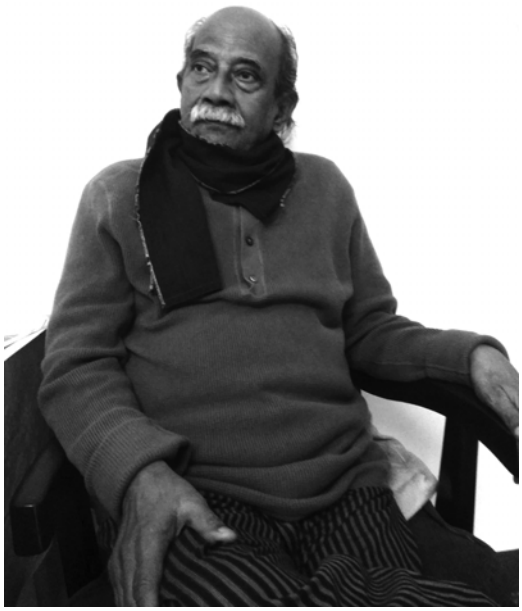

## প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, জুন ২০২৪

দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল হস্তিনাপুরের রাজসভায়, কৌরবদের উল্লাস আর অট্টহাসিতে নারীর সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য অবনতমস্তকে নীরব দর্শক এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, যিনি রাষ্ট্রের ধারক, তিনি বোধ করি যুগ যুগ ধরে অন্ধ হওয়ার অভিনয় করেন, এটা কি শাশ্বত? বিশ শতকে রাজা নির্বুদ্ধিতায় ছিল 'উলঙ্গ রাজা', তলস্তয় দেখেছিলেন 'দ্য নেকেট কিং'। একবিংশ শতকে যেন আরো নির্লজ্জ হয়ে গেল রাজমুকুট—রাণী দেখছেন, মজা নিচ্ছেন, জনগণ উলঙ্গ। রাণীর কৌশলে পারিষদবর্গ জেলবন্দি, তবুও নির্বিকার মিথ্যার বেশাতি করছেন নিত্যদিন। নারী নির্যাতনের কোনো তাপ তাকে (রানীর বেশে মমতাময়ী) দগ্ধ করে না।

সেই প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্যে প্রতিবিম্ব হয় যুগ যুগ ধরে চলে আসা রাজনৈতিক ইতিহাসের কুকীর্তি, জীবনের উত্থান পতন। গণতন্ত্রের রাজাকে তো বোঝা মুশকিল, তার ছলাকলা, অত্যাচার অন্যরকম, গোপনে জনগণ নানা কেসের আসামী। নিচ থেকে উঠে আসা, তাই তার ছ'লা-কলা ধরা সহজ নয়। কেননা পোশাকের পরিবর্তন নেই, অবস্থানের বদল ঘটে। একবার উপরে উঠে গেলে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে না, অগাধ সলিলে ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই রাজা-রাণীর হুঙ্কার শোনা যায়। কবিরা (তথাকথিত রাজরসে হাবুডুবু যারা) নীরব, তোতাপাখি, নাট্যকার এখন মন্ত্রী। বলবে কে? মোমবাতি নীরবে অন্ধকারে অশ্রু বিসর্জন দেয়। এমতাবস্থায় পুরনো ভিত্তিতেই নিজেকে শক্ত করতে হবে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এতটা অহংকারের যেই এই বিভ্রান্ত যুগের লেখকদের কাছে না গিয়ে ইতিহাসের পাতায় সেই সব অমর ব্যক্তিত্বের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর (১১ ডিসেম্বর ১৯২৪ — ১২ মার্চ ১৯৮৮) জন্ম-শতবর্ষে তাঁরই জীবনদর্শনে বাংলার চোখ ফেরানোর চেষ্টা করা যাক। তাঁর জীবন ও সংগ্রাম, দৃষ্টিভঙ্গি অনুকরণীয়। ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লালন তাঁর সাহিত্য-দর্পণ। তিনি যখন (১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯) ইছাপুর বন্দুক ফ্যাক্টরীর একজন কর্মী, তখন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৯ - ৫০ সালে জেলবাসের অভিজ্ঞতার আকরে লেখা 'স্বীকারোক্তি' গল্পে দেখি সত্য আর নিষ্ঠার দৃঢ়তা, পার্টিকর্মী হলেই যে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য বোধ বিসর্জন দিতে হবে, পার্টির অন্যায় মুখ বুজে মেনে নিতে হবে এ তাঁর কাছে স্বীকার্য নয়। তিনি একজন পার্টিকর্মী হিসেবে একজন প্রকৃত সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের কর্ম কিংবা দায় দায়িত্ব কেমন হওয়া উচিত সেকথা যেন কঠোরভাবে বুঝিয়েছেন। কারণ জীবনে ঝড়-বাদল আসবেই, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করতে হয়। এই অনির্বাচনীয় ধ্রুব-পথ তাঁরই সৃষ্টি। অথচ বর্তমানের রাজনীতি কেবলই স্বার্থচরিতায় মগ্ন। লেখক একজন পার্টিকর্মী হিসেবে এই গল্পে লিখেছেন, "এ্যাকশন কমিটি মানে পার্টির আর্মস অ্যামুনিশন

যাদের তত্ত্বাবধানে, যারা শত্রুকে চিহ্নিত করে ও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় আর কর্মীদের অপরাধের বিচার করে।"—এমন আত্মঘাতী, স্বার্থঘাতী সৃজন কে করতে পারে!

এভাবেই লেখক ছোট্ট একটি গল্পের আধারে জীবনের চলার পথে কিভাবে একটি জীবন বারে বারে স্বীকারোক্তির মুখোমুখি হয় তার সুনিপন শিল্প নির্মাণ করেছেন। এই গল্পে ফুটে উঠেছে জীবনের পরতে পরতে গড়ে ওঠা অভিজ্ঞতার দলিল :

১. "আমার চুলের মুঠি আমার বাবার হাতে, ভীষণ লাগছে। গাল দুটো জ্বালা করছে থাপ্পড়ের ঘায়ে। বাবার খালি গা, পেশল শক্ত শরীর ও ক্রুদ্ধ মুখটা মনে হচ্ছে বাঘের থেকে ভয়ংকর, সিংহের থেকে হিংস্র। গলার হিংস্র জিজ্ঞাসা : বল্ ইস্কুল পালিয়ে কোথায় গেছিলি? নৌকা বাইতে? মাছ ধরতে? বল্ বল্ বল্, তা নইলে খুন করবো আজ তোকে।"

২. তিনজন আমাকে ঘিরে ছিল। পার্টির বন্ধু। আজকের এই পার্টি নয়, অন্য পার্টি, সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী পার্টি।

৩. "আমার স্ত্রী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমার বুকের কাছে জামাটা সে খামচে ধরে আছে। হিংস্র রাগে ওর চোখ, ওর মুখ জ্বলছে। ..... স্বীকারোক্তির জন্য ও আমার জামায় হ্যাঁচকা টান মেরে ফুঁসে উঠলো, 'বল, কাল তুমি নীরার সঙ্গে দেখা করেছিলে কিনা।"

৪. "মিহির, অ্যাকশন কমিটির নেতার এই ছদ্মনাম। যার স্মার্টনেস, সাহস, চেহারা, বাকভঙ্গির খুবই নাম আছে পার্টির মধ্যে। বোনাপার্ট বলে সবাই যাকে আদর করে।..... যার চোখ তীক্ষ্ণ ঈগলের মতো। সেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'উম— মম হ্যাঁ কমরেড।..... ধ্রুবকে আপনি কোনো সেল্টারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কিনা।"

জীবনের পদে পদে ঘটে যাওয়া স্বীকারোক্তির মুখোমুখি হওয়া কথক তথা লেখক এখন রাজনৈতিক জেলবন্দি। রাজনৈতিক স্বার্থে সত্যিটা স্বীকার করা একজন বিপ্লবীর পক্ষে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি জীবনের আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে এমন অনেক সত্যি স্বীকার করা অসম্ভব, কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু এই অনির্বাণ সত্যের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন সৃজনের ছত্রে ছত্রে। লেখক কিভাবে কোন প্রদর্শিত পথে নিজেকে সংহত রেখেছিলেন 'স্বীকারোক্তি' সেই সংগ্রামী জীবনের কথকতা।

তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাতায় পাতায় আছে জেলে-জীবনের সংগ্রাম, বিশ্বাস উত্তোলনের লড়াই, আছে ভারতভ্রমণের অন্তর্নিহিত ভাবনার উৎসার, আছে শ্রম জীবনের কথা, যৌন চেতনার নানা রূপ নিপুণ বর্ণনার চালচিত্রে পরিপূর্ণ। বিচিত্র বিষয় স্বকীয় আঙ্গিকে কালের প্রতিচ্ছবি উপস্থাপিত তাঁর সারস্বতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই যেমন নিজেকে বলেছিলেন 'কলমচি', সমরেশ বসু ও ছিলেন 'পেশাদার লেখক'। জীবন ও জীবিকা যেখানে এক সূত্রে গাঁথা, লেখনীর জাদুতে সেই অমরত্বে তিনি আজও ষোলআনা প্রাসঙ্গিক। এবারে তাঁকে নিয়ে যাঁরা প্রবন্ধ রচনায় প্রয়াসী তাদের অধিকাংশ গবেষক, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখক খোঁজার

ক্ষেত্রে এবার আমরা একটু উদাসীন ছিলাম। হোক না কাঁচা হাতে পাকা সোনার গড়ন, কেমন হবে দেখবেন পাঠক। হয়তো পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কখনো কখনো। তবুও এ চলা মসৃণ নয়। হিমাদ্রী মণ্ডলের লেখা "শহীদের মা ও হাজার চুরাশির মা : রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে" বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তেমনই এক পর্যবেক্ষণ।

কী দেখি জীবনে, কী শিখি সমাজ-রাজনীতির কদর্য পাঁকে মজ্জমান থেকে, ভবিষ্যৎ বাংলার রাজনীতির নগ্ন পরিণাম এই দুই উপন্যাসের ভিত্তিভূমিতে প্রত্যক্ষ হয়। সারস্বত সাধকেরা এই ভয়ংকর পরিণামের ইঙ্গিত দিলেও আজও কি বাঙালি রাজনৈতিক নগ্নতা থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে? না কি আরো উলঙ্গ হয়েছে রাজা-রানী তথাকথিত রাজনীতির ঘোলাজলে হাবুডুবু খেকো জনগণ। কীভাবে ধূরন্ধর শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুস্কৃতিদের সামনে পঙ্গু হয়ে বসে থাকে তার প্রাক্ আভাস যেমন আলোচ্য দুটি উপন্যাস, তেমনি বর্তমান বাংলা তথা ভারতবর্ষের মুক নাগরিক। গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার প্রয়াস ছিল, আজ শহর ঘিরে ছেলেছে গ্রামীণ সরলতা, প্রেম-ভালোবাসা, সম্পর্কের মধুর যাপন। এই তুলনামূলক পাঠ যদি দু'একজনের চোখ খুলে দিতে পারে তবেই সার্থক হবে 'শহীদের মা' ও 'হাজার চুরাশির মা'।

আজ যখন সমগ্র বাংলা পথভ্রষ্ট, রাজনৈতিক দৈন্যতায় রুদ্ধ, দুষ্কৃতীরা নির্বিবাদে শাসকের গদিতে, তখন অনন্য স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' যেমন বারে বারে সন্ধ্যাবাতি জ্বলে অন্ধকার কারাকক্ষে, বারে বারে দেখতে হবে তাঁর প্রদর্শিত পথ, তেমনি বরেণ্য সাহিত্যিকদের শিষ্ট শিল্পের পাঠে মূল্যবোধ জাগরণের প্রয়াস প্রয়োজন। সমরেশ বসুর জন্ম-শতবর্ষে তাঁর জীবন ও সাহিত্য ছুঁয়ে বাঁচুক বাঙালি। একই সঙ্গে গত বছর স্বকলমে মুখর ছিলেন যে দু'জন লেখক, কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ও কবি গণেশ বসু তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আমাদের অন্যতম অভিমুখ। প্রসঙ্গত অধুনা বাংলাদেশের লেখক হাসান আজিজুল হক নিয়ে লেখা দিয়েছেন কবি ও কথাসাহিত্যিক তাপস রায়। তাঁকেও জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা।

সালটা ২০১৮, কবি আশিস সান্যাল মহাশয়ের বাটিতে উপস্থিত হয়েছি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবর্ষে সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার একটি সংখ্যার জন্য লেখা দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কবি-পিতা বললেন, সুভাষদার ঘনিষ্ঠ ছিল গণেশ। ওঁর কাছে যাও। মনে পড়ে গেল ২০০৭ সালে 'কবিতার আঙিনায় কৃষক আন্দোলন : একাল সেকাল' বইটি প্রস্তুত করতে গিয়ে কবি তরুণ সান্যালের সৌজন্যে তাঁরই বাড়িতে সাক্ষাৎ হয়েছিল কবি গণেশ বসুর সাথে। অজানা আনন্দ বয়ে যায় মনের গহ্বরে। আশিস স্যার বললেন, 'ঐ যে পিছে যে রাস্তা দিয়ে এলে, কাছেই বাড়ি'। আর দেরি নয়। পৌঁছে গেলাম কবি গণেশ বসুর 'বসুধারায়'। তারপর সন্তান-স্নেহ, বন্ধু-বাৎসল্যে, অগাধ ভালবাসা, কখনো শিক্ষক, কখনো অভিভাবক—আর ছেদ পড়েনি। তাঁর কবিতা সংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)

প্রকাশের অফুরান খুশি আমাকে পরিচিতি দেয়। কবিতা লেখা, প্রবন্ধ রচনা, গল্প সৃজন, পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন সবেতেই তাঁর ব্যাকুল উপস্থিতি আমাকে ঋণী করেছে, চিনতে শিখিয়েছেন সেই ষাটদশক থেকে বর্তমানের সাহিত্য চর্চার অলিগলি। গত বছর ১৫ অক্টোবর 'সাহিত্য অঙ্গন' পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য, সূচক শব্দ সবাইকে আপ্লুত করে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত কবিতা দিলেন, আর বললেন, নির্মমভাবে নির্বাচন করো, আমার শেষ কাব্যগ্রন্থের মুখ। আমি সেসময়ে কেমন এক আঁধারে ছিলাম জানি না, পড়তে দেরি হয়ে গেছে। বলেছিলাম, স্যার কালীপুজোর পর ধরব। আর সুযোগ এলো না। ১০ নভেম্বর আচমকা বিনা মেঘে বজ্রপাত। কবি পত্নী-বিয়োগে এতটাই একাকী, তিনি মৃত্যু-চেতনায় রুদ্ধ হলেন। কখনো লিখেছেন, 'আলো নেই, জ্ঞান নেই, স্বস্তির বিনাশ/হৃদয়েও তালাচাবি, সে সময়ে গান আর কবিতাই বিরল বিভাস।'(বিমূর্ত বাস্তব) 'হয়তো অবান্তর' নাম দিয়ে খুঁজেছেন মৃত্যু-উত্তীর্ণ জীবনের জিজ্ঞাসা— "বোধের ভিতরে তবু জিজ্ঞাসার খড়্গ খোঁজে মৃত্যুর পরে কি ফের জীবন সুন্দর?" এ যুগের বুদ্ধিমানেরা নিজেকে বিকিয়ে সময় সুযোগ বুঝে মোমবাতি মিছিল করে, কবির যখন তিনকাল গিয়ে ঠেকেছে শেষকালে তখনও বলছেন, "তবু আমি চোখ তুলি, মুঠো রাখি হাত/গান গাই, ছবি আঁকি, কবিতাও লিখি/ মাথা না বিকিয়ে।" পত্নী-বিয়োগের পর মৃত্যু তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে, বারে বারে কবিতার আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে সে ভয়, আবার মৃত্যভয়কে উপেক্ষা করার চিরনতুন অনুভূতি— 'কখনো কেউ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মৃত্যুর পরেই। স্রষ্টা থেকে যায় অদ্ভুত আঁধারে।' সমালোচকেরা বলেন, জীবনানন্দ দাশ নাকি মৃত্যুর পর এইরূপে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। জীবনের উপান্তে একক নিশিতে এই সান্ত্বনা ছাড়া আর কী-বা থাকতে পারে!

অবশেষে নিজের কথাকে সত্য প্রতিষ্ঠিত করে না জানিয়ে চলে গেলেন। তিনি যেন প্রিয় পত্নীর ডাক শুনতে পেতেন বার বার। একেবারে শেষের দিকে লেখা 'বাসনা' কবিতায় লিখেছেন "পৌঁছুতে পারিনি আমি। সুদূরেই রয়ে গেছে বাসনার দ্বীপ। / শরীর শীতল হতে খুব বেশি দেরি নেই আর।"

সচেতন, প্রজ্ঞাবান, স্মৃতিধর ছিলেন কবি গণেশ বসু। এখনও জানার ছিল আমাদের। আমরা অপূর্ণ থেকে গেলাম। তবু যেটুকু রেখে গেছেন ভবিষ্যতের জন্য অনেক রাস্তা পাওয়া যাবে। একজন প্রতিবাদী, প্রকৃত কমিউনিস্ট অলক্ষে কোনা রাজার (শাসক) ডাক পাননি তিনি, পেয়েছেন প্রিয়তমমার সকাতর সুমধুর প্রত্যাবর্তনের ধ্বনি। জীবন ত্যাগ করে, সরকার পোষিত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থেকেও আত্মপ্রচারবিমুখ কবি রেখে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনন্য সাধারণ অনেক কবিতা। তাঁর শানিত বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলেও পাঠকের চোখে পড়বেই।

কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের সাথে ব্যক্তিগত কোনো স্মৃতি নেই। দু'বার দে'জ পাবলিশিং হাউসে পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠানে দেখেছিলাম। পরবর্তী সময়ে তাঁকে নিয়ে বিস্তারিত কাজের অবকাশ থাকল।

**জয়গোপাল মন্ডল**
**জুন, ২০২৪**

# হেমিংওয়ে ও সমরেশ বসু: মুকুরিত ভাবনা

তরুণ মুখোপাধ্যায়

আমেরিকার খ্যাতিনামা লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। যাঁকে সকলেই চেনেন শুধু তাঁর Old Man and the Sea উপন্যাসের জন্য। যদিও আর অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, গল্প তিনি লিখেছিলেন। ছিলেন বর্ণময় জীবনের অধিকারী। তবু নিজের বন্দুকেই আত্মহত্যা করেছিলেন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ১৮৯৯এ জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল-কলেজের পাঠ শেষে অ্যাম্বুলেন্সের চালকের চাকরি নিয়ে যান ইতালি। সেখানে সৈন্যদের মধ্যে চকলেট-সিগারেট বিলি করার সময় আহত হন। নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন থাকার সময়ে তিনি সেবিকা অ্যাগনেস ভন কুরোস্কির সান্নিধ্য পান। যার মমতায় আরোগ্য লাভ করেন এবং তাকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হন। এরপর আমেরিকায় ফিরে আসেন ও কয়েক বছর পরে বিয়ে করেন হ্যাডলি রিচার্ডসকে। এটা ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। সংবাদপত্রে লেখালেখির সূত্রে হেমিংওয়ে পরিচিত নাম হয়ে ওঠেন। ১৯২৬এ তাঁর 'দি সান অলসো রাইজেস' প্রকাশিত হলে আরও খ্যাতিলাভ করেন। ১৯২৮এ হ্যাডলির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। প্রকাশিত হয় 'মেন উইদাউট উইমেন' গল্পগ্রন্থ। পলিন পিকারকে বিয়ে করেন। ১৯২৯এ প্রকাশিত হয় 'এ ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস'। যার বিষয় মুখ্যত চিকিৎসা কেন্দ্র। ১৯৩৯এ পলিনের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। পরের বছর বিয়ে করেন মার্থা গেল হর্নকে। মাত্র পাঁচ বছর পরে মার্থার সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ১৯৪৬এ হেমিংওয়ে বিয়ে করেন মেরি ওয়েলসকে।

রাজনীতি তাঁর পচ্ছন্দের বিষয় হলেও তিনি দলতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। সমাজতন্ত্রে তাঁর আস্থা ছিল। সেজন্য ১৯৬০এ ১২ জানুয়ারি বাক লানহামকে চিঠিতে জানান, "কিউবার বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।" একাধিক বিয়ে করলেও (তাঁর স্ত্রীরা আবার বয়সে তাঁর চেয়ে বড়ো) অবাধ যৌনতা তিনি পছন্দ করেননি। তিনি সাহসী, কর্মী, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নারীদের পছন্দ করতেন। তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে নারী ও পুরুষের পরস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা দেখা যায়। যেমন লেডি ব্রেট অ্যাশলে (দি সান অলসো রাইজেস)। বাবা ও মায়ের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে হেমিংওয়ে খুশি ছিলেন না। মায়ের কর্তৃত্বপনা পছন্দ করতেন না।

১৯৫২তে প্রকাশিত হলো সাড়া জাগানো উপন্যাস 'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী'। এই উপন্যাসে নারী চরিত্র নেই। এমনকি সান্টিয়াগো দেওয়াল থেকে তার মৃতা স্ত্রীর ছবি সরিয়েও দেন। যদিও উপন্যাসটিতে কিউবার পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বালক পিতাকে মান্য করবে, এটাই এখানে পাই। সেই সঙ্গে আছে একজন মানুষের লড়াকু মনোভাব। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্ধলক্ষ কপি বিক্রি হয়। সপ্তাহেই তিন হাজার কপি বিক্রি হতো। জোসেফ হেনরি জ্যাকসন বললেন, এই বই "নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইয়ের একটা অতিলৌকিক

নাটক।" এই বইটির জন্য হেমিংওয়ে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫৪তে। আর ১৯৬১তে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন।

'Old Man and the Sea' উপন্যাসের একাধিক বঙ্গানুবাদ হয়েছে 'বুড়ো ও সাগর' কিংবা 'বুড়ো লোকটা ও সমুদ্র' ইত্যাদি নামে। লীলা মজুদার, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, অমর দে, পুষ্কর গুপ্ত প্রমুখ অনুবাদ করেছেন। এই উপন্যাসে আমরা দেখি এক অশক্ত বৃদ্ধ শুধু মনের জোরে নৌকা বেয়ে মাছ ধরতে গেছে। বড়ো তেজি সার্ডিন মাছ। জলের তাজা মাছ আর এক ডাঙার বৃদ্ধ মিলে যে অসম লড়াই, তা সত্যিই রূপকের বাতাবরণ তৈরি করে। মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সে কি কোনো মানবেতর প্রাণীর কাছে হেতে যেতে পারে? মানুষ তো যুদ্ধ করেই বাঁচে। সে জানে "man is not made for defeat", কীভাবে বৃদ্ধ মাছের সঙ্গে তার বিরামহীন লড়াই করেছে (হাঙরের জন্য আস্ত মাছ আনতে পারেনি যদিও) তার কিছু বর্ণনা দিই।

ক) ঠিক সেই সময় মাছটা হঠাৎ আবার ঝাঁপিয়ে উঠল, টানের চোটে বুড়ো গলুইয়ের উপর পড়ে গেল।

খ) বুড়ো সুতোটাকে বারবার এমন করে টেনে ধরছিল যে বারবার ছিঁড়ে যাবার যোগাড় হচ্ছিল।

গ) কিন্তু মাছটা ধীরে ধীরে চক্কর দিয়েই চলেছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে বুড়ো ঘামে নেয়ে উঠল।

ঘ) তখন মৃত্যুর স্পর্শ লেগে মাছ জীবন্ত হয়ে উঠল। জল থেকে অনেক উঁচুতে উঠে এল আর তার দেহের অপরূপ দৈর্ঘ্য আর প্রসারতা তার সমস্ত শক্তি আর সৌন্দর্য প্রকাশ পেলো।

ঙ) মুগুর পিটে হাঙর মারবার বয়স আর নেই। কিন্তু যতক্ষণ দাঁড়গুলো বেঁটে মুগুর আর হালের ডান্ডা আছে, ততক্ষণ চেষ্টা করে দেখব।

চ) সেইখানে হাঙরটার মাথার উপর হালের কাঠি দিয়ে মোক্ষম বাড়ি দিল। একবার দুবার মারল। (বুড়ো ও সাগর/লীলা মজুমদার অনূদিত)

বাংলা সাহিত্যে হেমিংওয়ে তুল্য লেখক নেই। তবু মহৎ এই লেখকের পদাঙ্কানুসরণ তো হতেই পারে। জেনে বা না জেনে হেমিংওয়ের ভাবনায় উজ্জীবিত হতে দেখি বুদ্ধদেব বসু (মাছধরা কবিতা), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্মানদীর মাঝি), সমরেশ বসু (গঙ্গা) প্রমুখকে। তবে সমরেশ বসুর একটি গল্পে 'বুড়ো ও সাগর'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়— গল্পেরও নাম 'লড়াই'।

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) লেখকরূপে 'আদাব' গল্প লিখে আত্মপ্রকাশ করেন। দারিদ্র্য ও বিরুদ্ধ প্রতিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমা স্ত্রী গৌরী তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেও মধ্যজীবনে তিনি শ্যালিকাকে বিয়ে করেন। বাইরে সুখী দম্পতি হলেও সাধ্বী স্ত্রীর যন্ত্রণা নিশ্চয় তিনি ভুলতে পারেননি। স্বভাবে ভবঘুরেমিও ছিল। কালকূট ছদ্মনামে যেসব ভ্রমণকাহিনি লিখেছেন, সেখানে তাঁর মধ্যে কাম ও প্রেমের দ্বন্দু দেখা যায়। ব্যক্তিজীবনে অভাব, বস্তিবাস ও প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং কম্যুনিজম তাঁকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী করেছিল। যা তাঁর বহু গল্পে ও উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হেমিংওয়ের মতো তিনিও রাজনৈতিক

ব্যাপারে আগ্রহী এবং সমালোচকও। খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা স্পষ্ট। জেলেদের জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের সঙ্গে মিশেছেন। 'গঙ্গা' উপন্যাস তার প্রমাণ। 'লড়াই' গল্পেও পাই তেমনি জেলেজীবনের একটুকরো ঘটনা। হার না-মানা লড়াই-এ যারা সামিল। যাদের কাছে পরাজয় নয়, মৃত্যুই বরণীয়।

বেতনি নদী, বদি ও মাছ ধরা নিয়ে 'লড়াই' গল্প রচিত হয়েছে। যে নদীর জোয়ারে বদির বাপ ভেসে গেছে। বদির ধারণা ফেঁপে ওঠা জল দানো বাবার প্রেত। সাঁইমারার চরে বদি মাছ ধরতে আসে। সেখানেই জলচর প্রাণীটির সঙ্গে (পাঙাস মাছ) অসম লড়াইয়ে সে প্রাণ হারায়। তার লড়াইয়ের ছবি যেভাবে সমরেশ এঁকেছেন তার নমুনা দিলেই বোঝা যাবে, নেপথ্যে শোনা এই কথা কত সত্য —

"সংসারের এই বিধি, লড়েই বাঁচতে হয় বাবা।

আমাদের লড়েই মরতে হয়।"*

জলে নেমেছে বদি। স্রোত তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উত্তরে। ফেরার উপায় নেই। কারণ, "মানুষকে ক্ষুধা দিয়েছেন উনি, আর তার জ্বালায় লড়তে বলেছেন"। এতো চিরসত্য কথা। একটা কাঠের মুগুর হাতে কিশোর বালক পাঙাস মাছের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রস্তুত হয়। তার থেকে বড়ো পাঙাস। বুড়ো সমুদ্রে যেমন আঠার ফুট মাছ পেয়েছিল।

ক) দু'হাতে মুগুর তুলে মাছগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বদি।.... মুগুর দিয়ে আপ্রাণ পিটতে লাগল বদি। চিৎকার করতে লাগল, 'লড়ে যা, লড়ে যা।'

খ) মাছটা লাফ দিল। এক লাফে বদির মাথা ছাড়িয়ে উঠল। আর পড়ল একেবারে ঘাড়ের ওপরে। 'এই শালা, ছাড়।'

গ) বদি দু'হাত দিয়ে প্রকান্ড পাঙাসের পিছল শরীরটাকে জড়িয়ে ধরল। আর ছাড়তে • **'Man can be destroyed– but not defeated –Hemingway'** চাইল। পারছে না। জল আরও নেমেছে। বদি দেখল, রক্ত পড়ছে। ... মনে হলো, বদির বুকের মধ্যে কিছু বিঁধেছে গিয়ে আমূল।

ঘ) ও শেষবারের জন্য মুক্তির চেষ্টা করল। পারল না।

সমরেশ বসুর গল্প ও শৈলী নিয়ে গবেষণা করেছেন অজয় কুমার দলই। এই গল্প প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত উদ্ধৃত করছি। হেমিংওয়ের গল্পের শেষে পাই এই মন্তব্য — **'up the road in his shack– the old man– was sleeping again?** অজয়বাবু বলেন, গল্পের শেষে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে এ গল্পটির সঙ্গে সমরেশ বসু-র 'লড়াই' গল্পের সাদৃশ্য মেলে।.... হেমিংওয়ের শৈলী সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর বস্তুনির্বাচন, বিন্যাস কৌশল, ভাষা নির্ণয় সিদ্ধান্তে এবং সর্বাত্মক সামঞ্জস্যে স্বাতন্ত্র লক্ষিত হয়। চরিত্রের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ নিবিড় মমতার সম্বন্ধ হেমিংওয়ের মধ্যে ছিল। সমরেশ বসুর সঙ্গে এখানে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

(গল্পের শৈলী সমরেশ বসু ও অন্যান্য)

আপাত সাদৃশ্য থাকলেও হেমিংওয়ের বিকল্প তো নেই। যদিও সমরেশ বসু তাঁর নিজস্বতায় ভাস্বর।

# বাংলা সাহিত্যের উত্তমকুমার ঃ সমরেশ বসু

রবীন বসু

তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের উত্তমকুমার। জনপ্রিয়তা ও স্টারডমে উত্তমকুমার যেমন বাঙালির ম্যাটিনি আইডল ছিলেন, ছিলেন লক্ষ বাঙালি ললনার হৃদয়হরণকারী স্বপ্নের রাজপুত্র, তেমনই সাহিত্যিক সমরেশ বসু ছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যের উত্তুঙ্গ জনপ্রিয় এক লেখক। বাঙালি পাঠক-ললনাদের প্রিয় অচিনবাবু। অমৃত-বিষে এই দুই জীবনশিল্পীর জীবন যেন অনেকটা মিলেমিশে যায়। প্রথম দিকে সাফল্য না এলেও পরবর্তীতে দু'জনেই সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করেছিলেন। কিন্তু এই সাফল্য নিরঙ্কুশ অনায়াসসাধ্য ছিল না। ছিল আয়াসসাধ্য এক কঠিন লড়াই, অধ্যবসায় আর অসম্ভব মানসিক জোরের ফল। দু' জনেই জানতেন নিজের সাফল্যের ভিত নিজেকেই বানাতে হবে। তার জন্য যেমন একদিকে নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত থাকতে হবে, তেমনই নিজের শিল্পীসত্তার সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ করা চলবে না। ব্যক্তিগত জীবনে নানান ঘটনা -দুর্ঘটনা, আনন্দ-শোক, আস্থা-অনাস্থা পেরিয়ে অম্লমধুর এক বিরল জীবনসত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই সত্য তাঁদের শিল্পীসত্তাতে আগুন ধরিয়েছিল। ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আর প্রতিভার জোরে একজন অভিনয় শিল্পে মহানায়ক হলেন, অন্যজন বাংলা সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্যের চির-স্মরণীয় কালের রাখাল। তাঁর বাঁশির সুরে আমরা যে শুধু মোহিত হয়েছি তাই নয়, অমৃত-বিষে মানবজীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। তাঁর সাহিত্যের কুশিলব দীনদরিদ্র শ্রমজীবী, জনমজুর, মৎস্যজীবী, তাঁতশিল্পী সর্বোপরি সংগ্রামী মানুষ। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন কেটেছে। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে 'আদাব' (পরিচয়: ১৯৪৬) গল্প দিয়ে তাঁর সাহিত্যে প্রবেশ। তবে তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' (১৯৪৬), জেলে বসে লিখেছেন 'উত্তরঙ্গ' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস (১৯৫১)। সমরেশ বসুর আগে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ততদিনে বাংলা উপন্যাসে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন সমাজে শ্রেণীর সঙ্কট, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ব্যক্তির সঙ্কট আর বিভূতিভূষণ বলেছেন বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষের অনুভূতির কথা। কিন্তু সমরেশ বসুর উপন্যাসে আমরা পেলাম সময়ের সঙ্কট। চল্লিশের দশকে বাঙালি জীবনে এসেছিল ভয়াবহ সঙ্কট। আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সেই সঙ্কট খুব কাছ থেকে লেখক সমরেশ উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯, শেষ হয় ১৯৪৫। ৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, ৪৩-এর মন্বন্তর ও ৪৬-এর দাঙ্গা এর পর ৪৭-এর দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। বিপুল উদ্বাস্তু স্রোত, তাদের পুনর্বাসন ও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারি, মালিকের অধিক মুনাফার লোভ, শ্রমিক ছাঁটাই, বেকারত্ব—বাঙালির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে চুর চুর করে ভেঙে দিল।

৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে গ্রাম বাংলা উজাড় হয়ে গেল। তার উপর জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের আগ্রাসনে নিরন্ন কৃষকেরা বাস্তুহারা হয়ে শহরের ফুটপাতে আশ্রয় নিল। এই পরিস্থিতি এবং পটভূমিতে লিখতে এসে সমরেশ বসু দুঃসহ এই সময়কে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। কাপড়ের কল, চটকল, লোহা-ইস্পাত কারখানা, কয়লাখনি, ডক শ্রমিকদের মধ্যে ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি আস্তে আস্তে কমিউনিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত হন।

ছোটবেলা থেকেই সমরেশের মধ্যে ছিল বহু প্রতিভা। তিনি ভাল গান গাইতেন, অভিনয় করতে পারতেন, ছবি আঁকতেন, সুন্দর বাঁশি বাজাতেন। ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন আর প্রচুর বই পড়তেন। প্রথাগত পড়াশোনায় তেমন মন ছিল না। স্কুলের ক্লাসে প্রায়ই ফেল করতেন। ক্লাস না করে পথের পাশে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতেন ও সিগারেট খেতেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গী ছিল জেলে মেথরদের ছেলেরা। তরুণ ও বখাটে রিকশাওয়ালা থেকে বয়সে বড় নানান পেশার মানুষজনের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। ঢাকা থেকে এসে নৈহাটিতে তাঁর বড়দাদা মন্মথনাথ বসুর বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্য ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য দাদা বিরক্ত হয়ে তাঁকে আবার ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। সেখানে কাপড়ের কলে ট্রেনি হিসেবে কাজে যোগ দেন। কিন্তু বোহেমিয়ান সমরেশ প্রায়ই কারখানা থেকে বেরিয়ে যেতেন— নদীর পাড়, পুরনো ঘিঞ্জি গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো আবার চলে যেতেন কুষ্ঠরোগীদের ক্যাম্পে। আসলে তখন থেকেই সমরেশের মধ্যে জীবনকে দেখার এক অদ্ভুত কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মে ছিল। যা পরবর্তীকালে তাঁর লেখক সত্তাকে পরিপুষ্ট করেছে।

এরপর স্বাধীনতা পূর্ববতী গুজব রাজনৈতিক অস্থিরতা আর দেশভাগের আবহে সমরেশ আবার নৈহাটি ফিরে এসে স্কুলে ভর্তি হলেন। যখন দশম শ্রেণীতে পড়েন, তখন একবার ম্যালেরিয়া ও জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুঃস্থ দাদা মন্মথনাথ ভায়ের এই বোহেমিয়ান স্বভাবে বিরক্ত হতাশ হয়ে এই সময় কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়েন। সমরেশ বিনা চিকিৎসায় ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ছিলেন। খবর পেয়ে স্কুল বন্ধু দেবশঙ্কর মুখার্জি এসে বন্ধুকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে ছিল তার বিবাহ বিচ্ছিন্না বড়দিদি গৌরী। তিনি সমরেশের থেকে বয়সে তিন-চার বছরের বড় ছিলেন। সেই দিদির সেবাযত্নে অসুস্থ সমরেশ আস্তে আস্তে কিছুটা সুস্থ হলেন। তবে সম্পূর্ণ না। ডাক্তারের পরামর্শে এই গৌরী নিজের সোনার গয়না বিক্রি করে ভাইয়ের বন্ধু সমরেশকে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে নিয়ে গেলেন ভাল চিকিৎসার জন্য। সমরেশ সুস্থ হয়ে ফিরে এল নৈহাটিতে। ইতিমধ্যে দুই অসম বয়সী তরুণ-তরুণী পরস্পরকে মন দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু গৌরী ছিল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের আইনত বিচ্ছেদ না-হওয়া একটি তরুণী মেয়ে। তাদের এই প্রেমের কোনো সামাজিক পরিণতি নেই জেনে তারা নৈহাটি থেকে পালিয়ে জগদ্দল ও

শ্যামনগরের মাঝে আতপুরে বস্তিতে এক মিস্ত্রীর বাড়ির ছোট এক চিলতে বারান্দাসহ একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন। রোজগারহীন সমরেশ তখন সম্পূর্ণ বেকার। দারুণ অভাব আর অনটনের মধ্যে তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হল। বাধ্য হয়ে তিনি জগদ্দল চটকলের সাহেবদের কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে ডিম সবজি ফেরি সহ আরো অনেক ছোটখাটো কাজ করেন। তাতেও সপ্তাহে স্বামী-স্ত্রীকে দু'-তিন দিন উপোষ থাকতে হত। কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে ১৯৪২-এ তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় কমিউনিস্ট নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের। এই আলাপের ফলে তরুণ সমরেশ কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি আসেন। সত্যপ্রসন্ন তাঁকে জগদ্দল চটকল এলাকায় সংগঠনের কিছু দায়িত্ব দেন। তাঁরই সুপারিশে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে ইন্সপেক্টর অফ স্মল আর্মস-এর ড্রয়িং অফিসে চাকরি পান। এতে সংসারে কিছুটা সুরাহা এল বটে, তবে সমরেশ আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা, বই পড়া ও সংস্কৃতি-চর্চার মধ্য দিয়ে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন। 'উদয়ন' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা তাঁর জীবনে এক নতুন বাঁক নিয়ে এল। এই সময় ১৯৪৪-এ একই সঙ্গে তিনি ও গৌরীদেবী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। তাঁর লেখক জীবনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অবদান অনস্বীকার্য। তিনি নিজেই তাঁর লেখায় সে কথা স্বীকার করেছেন। "কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই আমার চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়। আমার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে।" কিন্তু এই সময় অকস্মাৎ এক বোমা বিস্ফোরণে ওঁনার রাজনৈতিক গুরু সত্যপ্রসন্ন নিহত হন। এই ঘটনা যে পার্টির অন্তঃকলহের ফল, পার্টির মধ্যে ক্ষমতা দখল করার লড়াই, তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। তাই স্থানীয় পার্টি নেতাদের প্রতি তিনি যে শুধু বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, সোচ্চার প্রতিবাদও করেছিলেন।

১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষণা হলে সমরেশ গ্রেপ্তার হন। জেলে বসে চাকরি চলে যাওয়ার নোটিশ পেলেন। দিশেহারা সারস্বত সাধক ১৯৫১-তে জেলে বসেই স্থির করে ফেলেন তাঁর জীবনের লক্ষ্য। রাজনীতি না, তিনি এবার সাহিত্য রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। যখন জেলে ছিলেন, সেই সময় গৌরীদেবী অনেক চেষ্টা চরিত্র করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ১৫০ টাকা মাসিক সাহায্য জোগাড় করেন। এ বিষয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মহানুভবতাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। জেলে বসে লিখে ফেললেন 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হলেও একুশ বছর বয়সে লেখা 'নয়নপুরের মাটি' তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঠিক করলেন তিনি লেখাকেই পেশা হিসেবে নেবেন। কতটা দুঃসাহস আর মনের জোর থাকলে তবে সেই সঙ্কটাপন্ন সাংসারিক অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়! অবশ্য তখন গৌরী দেবী তাঁর পাশে ছায়ার মতো এসে দাঁড়ান। তিনি ভরসা দেন, মনে সাহস জোগান। নিজে সকাল

বিকেল গানের টিউশনি করে, রাতে পোষাক সেলাই করে সংসার নির্বাহের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করেন। স্ত্রীর কাছ থেকে এই নির্ভরতা ও প্রশ্রয় পেয়ে সমরেশ পুরোপুরি লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। একে একে লিখলেন 'নয়নপুরের মাটি', 'বি টি রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', 'গঙ্গা', 'বাঘিনী', 'ত্রিধারা', 'তিন ভুবনের পারে', 'টানাপোড়েন', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'—এর মতো কালজয়ী সব উপন্যাস। ১৯৬৫-তে লেখেন 'বিবর' উপন্যাস। এরপর প্রকাশিত হয় 'প্রজাপতি', 'পাতক' ও 'স্বীকারোক্তি' উপন্যাস। এই তিনটি উপন্যাস ঘিরে এক সময় বাংলা সাহিত্যে তোলপাড় হয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে তৎকালীন নগর জীবনের মৌখিক চলতি স্ল্যাং ভাষায় লেখা অবক্ষয়িত সময়ের এক বিশ্বস্ত দলিল।

১৯৬৭-তে প্রকাশিত এই 'প্রজাপতি' উপন্যাসকে অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তার বিরুদ্ধে সেই সময় আদালতে বহু লেখক বুদ্ধিজীবী ও পত্রিকা সম্পাদকরা নিজেদের অভিমত জানান। তারা বেশির ভাগ সমরেশ বসুর পক্ষে মত দেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু মহাভারত রামায়ণ ও বিভিন্ন বিদেশী সাহিত্য থেকে উদাহরণ সহযোগে এই অশ্লীলতা অভিযোগের বিরোধিতা করেন। এবং পরিশেষে আদালতের রায়ে উপন্যাস এবং তার লেখক সম্পূর্ণ অভিযোগমুক্ত হন। সমরেশ বসু তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে কাহিনী, চরিত্র ও আঙ্গিক নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা করেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছেন, পাঠক চিত্ত যেমন জয় করেছিলেন, তেমনই সমালোচকদেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন। আপোষহীন এই লেখক সারাজীবন সত্যের সন্ধান করে গেছেন। নিজের বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ দিয়ে তিনি উপন্যাসের কাঠামো গড়েছেন। সেখানে আমরা তাঁর এক প্রত্যয়ী লেখক সত্তাকে দেখতে পাই।

আগেই বলেছি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সেই অস্থির সময়ের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই তিনি প্রথমদিকের উপন্যাসে ভাষারূপ দিয়েছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর রচনায় বিম্বিত হয়েছে। পরবর্তীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনিও মানবজীবনের যৌনতাকে সাহিত্যে অসঙ্কোচে সুপ্রকট করেছেন। জীবন এক ব্যাপক বিস্ময়। মুগ্ধতার সঙ্গে তিনি তাকে অনুসরণ করেছিলেন, বিশ্লেষণ করেছিলেন আবার নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস এক জীবনসত্য। নানান দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনের উপর আলো ফেলেছেন। সেই আলোয় আমরা পাঠক হিসেবে তৎকালীন সমাজজীবনকে পরিষ্কার দেখতে পাই। আবার তাঁর সাহিত্যের আর একটি দ্বিতীয় অভিমুখ আছে, যা তাঁর নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর বিষয়। উত্তাল সত্তর দশক, তার পরবর্তীকালে কলকাতা ও মফস্বল শহরকে কেন্দ্র করে যে গুন্ডারাজ, ওয়াগান ব্রেকিং, খুন, রাজনৈতিক ভণ্ডামী, গুপ্তহত্যা, তোলাবাজি,

তার সাথে পুলিশি অত্যাচার ও দমননীতি সবই নিখুঁতভাবে তাঁর সৃজন শৈলীতে শিল্পরূপ লাভ করেছে। যেন ফটোগ্রাফি। সে হিসেবে তিনি একজন বস্তুনিষ্ঠ সময় ও সমাজসচেতন ঔপন্যাসিক ছিলেন।

আর এক জায়গায় উত্তমকুমার ও সমরেশ বসুর মিল আছে। দু'জনে ছিলেন আদ্যোপান্ত প্রেমিক মানুষ। প্রেমের জন্য আকুল হয়েছেন, হয়েছেন রক্তাক্ত। প্রচলিত-সমাজধারণা ও আবেষ্টনের কাঠামো ভেঙে দু'জনেই নিজস্ব প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলি, কিংবদন্তি দুই অভিনেতা ও সাহিত্যিকের প্রথমা স্ত্রীর নামেও কিন্তু মিল ছিল। গৌরী দেবী। দু'জনেই তাঁদের প্রেমে ও সাংসারিক দায়িত্বে ছিলেন বিশ্বস্ত অটল। নিজেদের অনেক কিছু ত্যাগ করে, কষ্ট স্বীকার করে তাঁরা লড়াকু তরুণ দুই স্বামীকে শিল্পসৃষ্টিতে নিরঙ্কুশ উৎসাহ দিয়েছেন। যাতে তাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিখ্যাত হতে পারে।

খ্যাতির পিছনে অপবাদ রাহুর মতো তাড়া করেছে ক্রমাগত দু'জনকেই। তবু এই দ্বন্দ্ব ও বিরহ থেকে রসদ নিয়ে এক না-ধরা প্রেমের পিছনে ছুটেছেন তাঁরা। তাঁদের শিল্পীসত্তা দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে। জীবনের হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে হয়েছেন নীলকণ্ঠ।

আবার দুই জীবনশিল্পীর জীবনের পরিণতিও অনেকটা এক। নিত্যদিনের কাজের চাপ, মানসিক যন্ত্রণা, শরীরের প্রতি উদাসীনতায় হৃদরোগে আক্রান্ত হন বার বার। শেষ পরিণতি মৃত্যু। নিজেকে সর্বভারতীয় স্তরের অভিনেতা প্রমাণ করতে উত্তমকুমার মুম্বাই পাড়ি দিয়েছিলেন। নিজের প্রযোজনায় বানাতে গিয়েছিলেন হিন্দী ও বাংলা ডবল ভার্সান ছবি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, গোপন ষড়যন্ত্র ও বিশ্বস্ত মানুষজনের অসহযোগিতায় তিনি ব্যর্থ হন। বহু টাকায় নির্মিত তাঁর ছবি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে। কার্যত, বিপুল টাকার দেনা মাথায় নিয়ে তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। ভগ্ন হৃদয়ে অসম্ভব মানসিক কষ্টের মধ্যেও দেনা পরিশোধ করতে যা ছবি পেয়েছেন হাতে সব নিয়েছেন। অমানুষিক সেই পরিশ্রম, তার উপর পারিবারিক সমস্যা তাঁকে জর্জরিত করেছিল। ভার সহ্য করতে পারলেন না, শুটিং ফ্লোরেই হার্ট অ্যাটাক হল। ১৯৮০, ২৪ জুলাই চিরনিদ্রায় চলে গেলেন ২৫০-এর বেশি ছবির কিংবদন্তি অভিনেতা অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, বা আমাদের মহানায়ক উত্তম কুমার।

সমরেশ বসু বস্তুনিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হলেও তাঁর দ্বিতীয় সত্তা ছিল কালকূট। সেখানে তিনি একজন স্বপ্নদর্শী প্রেমিক মানুষ। যেন নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী। বিশ্বাস করতেন, প্রেম হল মানুষের জীবনের চালিকাশক্তি। খানাখন্দে ভরা জীবন আবর্তে যেন আলোর উৎস। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাবো তারে'-এর মতো ক্লাসিক উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন। সেখানে আপাত শান্ত, ভদ্র জীবনের অন্তরালে কত দুঃখ-বেদনা, শঠতা-প্রতারণা, বঞ্চনা ও প্রাপ্তির ইতিকথা লুকিয়ে আছে, তা তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। আমরা মুগ্ধ হয়েছি। হতাশাগ্রস্ত মানুষও জীবনকে ভালবাসতে শিখেছে।

১৯৮৭ তে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয় সমরেশ বসুর সারা জীবনের

সাহিত্য সৃষ্টির সেরা ফসল 'দেখি নাই ফিরে'। আত্মমগ্ন সন্ন্যাসী চিত্রশিল্পী ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের রৌদ্রদগ্ধ জীবন অবলম্বনে সোনার অক্ষরে লেখা এই উপন্যাস। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে অনিঃশেষ সংগ্রাম আর সফলতার অপর নাম রামকিঙ্কর। জীবননিষ্ঠ রূপনিষ্ঠ এই শিল্পী সুনাম দুর্নাম উভয়কেই বক্ষে ধারণ করে শিল্প সৃষ্টি করেছেন। ঠিক সমরেশ যেমন করেছেন। দীর্ঘ প্রায় এক দশকের অক্লান্ত অন্বেষণ, পরিশ্রম পড়াশোনা ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি এই ধ্রুপদী জীবন উপন্যসের বীজ বপন করেন। নিজের উত্তুঙ্গ আকাঙ্ক্ষা, তীক্ষ্ণ মেধা অনুভব শক্তির গাঢ়তা ও ঐশ্বরিক প্রতিভায় সমরেশ মৃত্যুর আগে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি লিখলেন। দুঃখের বিষয় উপন্যাস শেষ করতে পারেননি। অসমাপ্ত এই উপন্যাসটিই শুধু যদি লিখতেন তিনি, তাহলেও বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকতেন।

সমরেশের প্রথম পর্বের উপন্যাসে ছিল গোষ্ঠী ও সমাজ-মানুষের সংগ্রামের কথা। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে ছিল মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিদিনের জীবন সংগ্রাম, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর যৌনতা ও ভ্রষ্টাচারী জীবনের স্পষ্ট ছবি। তৃতীয় পর্বের উপন্যাসে ছিল শিকল ছেঁড়ার গান। রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ডামিকে তিনি ঘৃণা করেছেন কিন্তু রাজনীতিকে নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনাই মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত করে তোলে। আর একজন প্রকৃত শিক্ষিত ও বোধসম্পন্ন মানুষই পারে প্রতিকূলতা থেকে নিজেকে উন্নীত করতে। তাই একদিন সমাজের রক্তচক্ষু ও অনুশাসন থেকে বাঁচতে যে তরুণ সমরেশ রাতের অন্ধকারে নিজ বাসভূমি নৈহাটি ছেড়েছিলেন, সেই সমরেশ একদিন জনপ্রিয় লেখক সমরেশ বসু হয়ে নৈহাটি ফিরে এলেন। এবং আপামর মানুষ সাগ্রহে তাঁকে বরণ করে নিল।

নিবন্ধ শুরু করেছিলাম, যে উত্তমকুমারকে নিয়ে, তিনি অকাল প্রয়াত হয়েছিলেন। সমরেশ বসুও 'দেখি নাই ফিরে' লিখতে গিয়ে নিজের শরীরের উপর যথেষ্ট চাপ নিয়েছিলেন, ফলে তিনি সময়ের অনেক আগেই চলে গেলেন। তবু দু'জনেই যেন ম্যাটিনি আইডল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমাদের যুবক বয়সে, চায়ের দোকানে, পাড়ার ঠেকে, কফি হাউসে সর্বত্র লেখক সমরেশ বসুকে নিয়ে আলোচনা হত। তাঁর উপন্যাসের কথা উঠে আসত। তাঁর নায়কের মুখের ভাষায় আমাদের সময়কার লেখকদের মুখের ভাষা মিলে যেত।"

তাহলে বুঝতে পারছেন, আমার এই নিবন্ধের নাম কেন রাখলাম, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উত্তমকুমার হলেন সমরেশ বসু।

# পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে বাস্তব রুপায়ণ : 'কুন্তী সংবাদ'

**নিত্যানন্দ মণ্ডল**

সমরেশ বসু ১৯২৪ সালে ১১ই ডিসেম্বর ঢাকার বিক্রম পুরে জন্ম গ্রহন করেন। তার ডাকনাম সুরথনাথ বসু। পিতা মোহিনী মোহন বসু। মাতা শৈবালিনী বসু। দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহন করার ফলে লেখা পড়া করার সুযোগ খুব একটা পাননি। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার পর তাকে কর্ম জীবনে প্রবেশ করতে হয়। এক সময় মাথায় ফেরি করে ডিম বিক্রি করেছেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯ ইছাপুর বন্দুক কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেছেন। ঐ সময়ে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। সরকারের কুনজরে পড়ার কারণে ১৯৪৯-১৯৫০ সালে জেল খাটতে হয়। বাস্তব মানুষের জীবন তথা খেটে খাওয়া মানুষের জীবন তিনি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই সাথে সমাজের নীচু তলার মানুষের জীবনের চাওয়া পাওয়া, পেয়ে হারানোর বেদনা অনুভব করেছিলেন। মানব মনের টানা পোড়েনের সাথে রাজনৈতিক জীবনে যে শিক্ষা তিনি নিয়েছিলেন তা তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল।

যৌন জীবন, অবৈধ সম্পর্ক, সম্পর্কের টানা পোড়েন তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে বারে বারে। প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' ১৯৫১ সালে প্রকাশিত। যেটি জেলখানায় রচিত। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'বিবর'—লেখককে বহু প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। 'কালকুট' ও 'ভ্রমর' ছদ্মনামে একশত উপন্যাস ও দুইশত-এর মতো ছোটগল্প লেখেন। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। ১৯৮৩ সালে 'শাম্ব' উপন্যাসের জন্য 'সাহিত্য অকাডেমি' পুরস্কার পান। ১২ই মার্চ ১৯৮৮সালে কোলকাতায় পরলোক গমন করেন। সমরেশ বসুর একটি অন্যতম গল্প 'কুন্তী সংবাদ'।

দেশভাগ, দাঙ্গা, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে বারে বারে। সমাজের উঁচুতলার মানুষের জীবন যাপনের সাথে নিচুতলার তথা বস্তিবাসী মানুষের জীবনযাত্রাও অকপটে শিল্পরূপ পেয়েছে তার লেখায়। আবার 'কুন্তী সংবাদ' গল্পে উঠে এসেছে সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী নরনারীর জীবনালেখ্য।

।। ২।।

কুন্তী মহাভারতের চরিত্র। আদর্শ নারীর দৃষ্টান্ত তিনি। মহাঋষি দুর্বাসাকে সেবা করে সন্তুষ্ট করার ফলে দুর্বাসা তাকে 'মহামন্ত্র' প্রদান করেন। যে মন্ত্র উচ্চারণ করে, যখন যাকে আহ্বান করবেন। তার কাছ থেকে তিনি সন্তান লাভ করবেন। কুন্তী চার মাস দুর্বাসাকে সেবা করেছে। সেবায় ঋষি সন্তুষ্ট। মন্ত্রও দিয়ে দিলেন কুন্তীকে।

'এই মন্ত্র পড়ি তারে করিবা আহ্বান।
অবিলম্বে সে দেব আসিবে তব স্থান।।'

(মহাভারত, প্রথম খণ্ড, কাশীরাম দাস বিরচিত, ৩২ তম সংস্করণ, ১৩৫৭, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। আদিপর্ব, পুত্তোৎপাদনে কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর অনুমতি। পৃষ্ঠা -১০০)।

এবার কুন্তীর পালা। তিনি মন্ত্রের গুনাগুন যাচাই করতে চান। যমুনা নদীতে জল আনতে যাওয়ার সময় মনের সংশয় দূর করার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করে "সূর্য" দেবতাকে আহ্বান জানালেন। সূর্য দেবতা উপস্থিত। কুন্তী তখন অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও সূর্যদেব মুনির বাক্য মিথ্যা হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ফলে কুমারী কুন্তী মন্ত্রের গুনাগুন পরীক্ষা করার জন্য সূর্য দেবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। কুন্তী জন্ম দিলেন কর্ণকে।

'আমার নন্দন কর্ণ কেহ না জানিল।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কর্ণের হইল।।'

(মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড,কাশীরাম দাস বিরচিত, ৩৩ তম সংস্করণ, ১৩৯৫, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। উদ্যোগ পর্ব, কর্ণের জন্ম-বিবরণ, পৃষ্ঠা -৭৯)। কুমারীকালীন সন্তানকে রাখা সম্ভব নয়। যমুনা নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। রাধা ও অধিরথ কর্ণকে লালন পালন করেন -এ কথা সকলের জানা।

লেখক সমরেশ বসু বিহারের সাঁওতাল পরগণার মেয়ে মুনিয়ার জীবন কাহিনী নিয়ে রচনা করলেন 'কুন্তী সংবাদ' নামক গল্পটি। গল্পে পাই গ্রামের মেয়ে মুনিয়া। "তার বয়স এগারো-বারোর বেশি না, জানি না, তার চেয়েও কম কিনা। মেয়েটির কালো চোখ, একটু বোঁচা বোঁচা নাক, কিন্তু কটা কটা মুখখানি বেশ মিষ্টি, বটের পাতার মতো গড়ন।"(সমরেশ বসু রচনাবলী-৪,সম্পাদনা-সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা-৯, জানুয়ারী-২০০০। গল্প গ্রন্থ-চেতনার অন্ধকারে, গল্প-কুন্তী সংবাদ, পৃষ্ঠা -৬৪৯)।

পাশের গ্রামে তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সে বাপের বাড়িতে থাকে। মাঠে গরু- মহিষ চরাতে যায়। একদিন গরু চরানোর সময় গাছতলায় মুনিয়া ঘুমিয়ে পড়ে। সে সময় কোনো এক সুদর্শন যুবক মুনিয়ার পাশে শুয়ে পড়ে। তার গায়ের কাপড় সরে যায়। বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সেই যুবক খেলা করে। মুনিয়া বলে-"তাকে আমি চিনি না। তাকে আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি। না ভঁইষটাঁড়ে, না শামপুরে, না শহরে বাজারে হাটে, না সাত দেবীতলা মেলায়, যেখানে তামাম দুনিয়ার লোক আসে। তাকে আমি কখনও দেখিনি।"(উক্ত-কুন্তী সংবাদ, পৃষ্ঠা -৬৫৩)। মুনিয়া তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। মুনিয়ার "খুব ভাল লাগছিল"। মুনিয়া বাধা দিতে পারেনি। এগারো বছরের অপরিণত মেয়ে সে। অজানা অচেনা পুরুষের সাথে শাররীক মিলনের পর প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হতে চললো। আজ মুনিয়ার মা জানতে পারে। গ্রামের পঞ্চায়েতকে খবর দেয়। মুনিয়ার মা ও বাবা দুজনে মিলে মুনিয়াকে কঞ্চির লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে।

লেখক ঐ দিন বিকালে গ্রামে ঘুরতে গিয়ে মুনিয়াকে দেখতে পায়। তার দুই হাত ও দুই পা পিছমোড়া করে বাঁধা। মুনিয়ার মা গায়ের ঝাল মেটাতে মাঝে মাঝে কঞ্চির লাঠি দিয়ে পিটিয়ে নিচ্ছে। সেই সাথে অকথ্য গালি গালাচ সমানে চলছে। সমবয়সি গ্রাম্য মেয়েরা যা দেখে ও শুনে মুখ টিপে হাসাহাসি করছে। আর মুনিয়া নির্বিকার চিত্তে তার সাথে যা ঘটেছে তা সমস্ত সত্য সহ সকলের কাছে অকপটে স্বীকার করে চলছে। গ্রামের পঞ্চায়েত কোনো সমাধান সূত্রে আসতে পারে না। সেই কারণে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পঞ্চায়েতের বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

মুনিয়ার কথাতে, তার ভালো লেগেছিলো। এই ভালো লাগার ফসল তার গর্ভে। যে জন্য তাকে পেটানো হচ্ছে ও বিচার চলছে। এই সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে গল্পের কাহিনীতে ঠাঁই পেয়েছে মহাভারতের চরিত্র কুন্তী। যে নিজের ইচ্ছায় দেবতার সাথে মিলিত হয়েছে বিয়ের আগে। আর বিয়ের পরে স্বামীর ইচ্ছায় মিলিত হয়েছে তিন জন দেবতার সাথে।

"সেই মন্ত্র জপি ধর্মে করিল আহ্বান।
তৎক্ষনে আইল ধর্ম কুন্তি বিদ্যমান।।"

(মহাভারত, প্রথম খণ্ড, কাশীরাম দাস বিরচিত, ৩২ তম সংস্করণ, ১৩৫৭, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। আদিপর্ব, পৃষ্ঠা -১০১)।-এভাবে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম দিলেন যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে। পাণ্ডুর আরো সন্তান চাই। পাণ্ডু সন্তান আকাঙ্ক্ষায় অন্ধ। অথচ নিজে নিয়তির হাতের ক্রিড়ানক মাত্র। দৈব্যের বিধান খণ্ডানো তার পক্ষে কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। মহাভারতে উল্লেখ আছে—

'চতুর্থ পুরুষে গতা হয় যে স্বৈরিণী।
পঞ্চম পুরুষ হৈলে বেশ্যা মধ্যে গণি।।'

(উক্ত-মহাভারত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -১০২)- ফলে বিয়ের পর কুন্তী তাই তিন জন দেবতার দ্বারা সন্তুষ্ট হতে বাধ্য থাকেন। অথচ সন্তান উৎপাদনে অক্ষম স্বামী পাণ্ডুর আরো সন্তান চাই। দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রী, সে ও মা হতে চায়। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী সেই মন্ত্র একবার মাত্র মাদ্রীকে দিতে সম্মত হয়। আর মাদ্রী একবার মন্ত্র নিয়ে কিভাবে একাধিক সন্তানের জন্ম দিতে পারে সেই কৌশল খুঁজতে থাকে। মনের অভিসন্ধি পুরাতে "অশ্বিনী কুমারদ্বয়" কে আহ্বান জানালেন। জন্ম হলো নকুল ও সহদেব-এর।

অথচ বাস্তবের কুন্তী মুনিয়ার একটি সন্তান জন্ম দিতে প্রবল বাধার সম্মুখিন হতে হয়। মুনিয়া জানে না এর কি পরিণতি। শেষ পর্যন্ত অন্ধ বুড়ি সোতিয়া এই সমস্যার সমাধান করে দেয়। সে বলে মুনিয়ার সাথে যা ঘটেছে তা কোনো অপদেবতা বা মানুষের কাজ নয়। এটা দেবতার কাজ। সোতিয়া বুড়ি আরো বলে-"মুনিয়ার পেটে কোনও মানুষের বাচ্চাও

নেই। মানুষ হলে, মুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হত না। ও চেঁচামেচি করত, আঁচড়ে কামড়ে দিত। আমাদের পশুপাখিদের এখনও মড়ক লাগেনি। গ্রামেও মড়ক লাগেনি। মাঠে এখনও ফসলের কোনও ক্ষতি হয়নি, ফসল ভালই হয়েছে। আমার মনে হয়, এ কোনও দেবতারই কাজ।' (উক্ত- কুন্তী সংবাদ, পৃষ্ঠা -৬৫৫)। আর মুনিয়া কখনো মিথ্যা বলতে পারে না। সোতিয়া বিধান দেয়। যদি মুনিয়ার স্বামী 'শামপুরের লছমনের ব্যাটা' মুনিয়াকে নিতে না চায়। তবে মুনিয়া 'গ্রামের দেবী মঙ্গলার পূজা করবে'(উক্ত- কুন্তী সংবাদ, পৃষ্ঠা -৬৫৫)। মন্দিরে দেবতার সেবা করে সারাটা জীবন অতিবাহিত করবে। অন্ধ সোতিয়া আরো বলে মুনিয়া যদি কোনো পাপ কাজ করতো তবে গ্রামে মড়ক লাগতো, বন্যা-খরা, ওলাওঠার মতো নানা রোগে গ্রাম উজাড় হয়ে যেতো। সেই সব যদিচ এখনো ঘটেনি, তাই অন্ধ সোতিয়ার দাবি। এটা দেবতার কাজ। আর কারো দ্বারা এটি হওয়া সম্ভব নয়।

।। ৩।।

চরিত্রপ্রধান গল্প এটি। গল্পে মুনিয়ার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আদিবাসী মেয়ে মুনিয়া এবং মহাভারতের আদর্শ চরিত্র কুন্তী দু'জনকে লেখক একাসনে বসাতে চেয়েছেন। মুনিয়ার জীবনে যা ঘটেছে তা বহু আদিবাসী রমণীর জীবনে ঘটাটাই স্বাভাবিক। নির্জনে বনের ভিতর একা কোনো নারীর সাথে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একাজ ঘটে থাকে। যা আমরা প্রতিনিয়ত মিডিয়ার দৌলতে দেখতে পাই। আবার পাইও না। মুনিয়া যদি উচ্চ সম্প্রদায়ের মেয়ে হতো তবে গ্রামের পঞ্চায়েত বসতো না। সারা দিন বিচারের নামে প্রহসন চলতো না। সকলের সামনে বেঁধে রাখা হতো না। সমাজ সেখানে শুধুমাত্র দর্শকের ভুমিকা পালন করতো।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথের মতো বলতে শোনা যেতো 'আমিই সমাজ সৃষ্টি করি, সমাজ আমার কি করবে'। অথচ মুনিয়াকে সামাজিকভাবে পীড়ন করা হচ্ছে। মানসিক ও শারীরিক ভাবে অত্যাচারিত হতে দেখে আমরা চুপ থাকি। কোনো প্রতিবাদ করতে পারি না। রাজনীতির ঘোলা জলে সব-ই সমান্তরাল দেখি। ভেদাভেদ করতে ভুলে যাই।

মহাভারতের চরিত্র কুন্তীকে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় নি কখনো। না সামাজিক ভাবে না পারিবারিক ভাবে। তাই হয়তো কুন্তীকে শারীরিক ভাবে পীড়ন করা হয়নি কখনো। কিন্তু মানসিক পীড়া তাকে বিধ্বস্ত করেছে বারে বারে। সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যে মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের আগের রাতে কুন্তীকে কর্ণের কাছে গিয়ে নিজের মুখে সব সত্য স্বীকার করতে হয়েছে অকপটে। তবু সন্তানের স্বীকৃতি না দিতে পারার যে যন্ত্রণা তা সারাজীবন ধরে তাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে, এক অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণার সাথে।

সে দিক থেকে মুনিয়া অনেকটা রেহাই পেয়েছে। গ্রামের পঞ্চায়েত তার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে অনেকটা। সোতিয়া বুড়ির কথাতে তার একটা হিল্লে হয়ে যায়। গল্পের শেষে দেখলাম—"মুনিয়ার মা এসে মুনিয়ার হাত ধরে মাটি থেকে তুলল। মুনিয়ার

মুখ নিচু। চোখ জলে ভাসছে। কয়েক পলক আমি ওর দিক থেকে চোখ সরাতে পারলাম না। আমার মনে তখনও নানান প্রশ্ন ও বিস্ময়।" (উক্ত- কুন্তী সংবাদ, পৃষ্ঠা -৬৫৫)। কিন্তু বাস্তবে কি এতো সহজে সবই সমাধান হয়ে যায়। লেখক হয়তো —"Literature is a creative art– written by creative Literary artist." (W. H. Hudson -"An outline History of English Literature " p- 291 )-এই উক্তির সামনে দাঁড় করিয়ে গল্পের ইতি টানেন। এভাবে মুনিয়ারা ভূলুণ্ঠিত হতে হতে মহাভারতের আদর্শ নারীর মর্যাদায় ভূষিত হয় ওঠে। আর সমরেশ বসুর মতো লেখককেরা কালকে অতিক্রম করে কালজয়ী খেতাবে ভুষিত হন।

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১। প্রাক 'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু- ড. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।

# সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গ: সমাজ পরিবর্তনের বিশ্বস্ত দলিল

নয়ন সাহা

**সূচক শব্দ :** মার্কসবাদ, জীবন সংগ্রাম, অবক্ষয়িত সমাজ, সিপাহী বিদ্রোহ , বিশ্বযুদ্ধ।

**সারসংক্ষেপ :** বাংলা কথাসাহিত্যের একজন অন্যতম ধারার কথাশিল্পী হলেন সমরেশ বসু। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৪ সালে, মৃত্যু হয় ১২ই মার্চ, ১৯৮৮ সালে। জন্মসূত্রে প্রকৃত নাম ছিল সুরথনাথ বসু, পরবর্তী সময়ে তিনি সমরেশ বসু নামে পরিচিতি লাভ করেন। 'কালকূট' ছদ্মনামেও একাধিক সাহিত্য রচনা করেন। সমরেশ বসুর কথাসাহিত্য বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ। মার্কসীয় জীবন দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি, 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে জীবনের সেই কঠিন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে এই উপন্যাসটি। ১৯৪৯ সালে জেলবন্দি অবস্থায় লেখক উপন্যাসটি রচনা করেন। সিপাহী বিদ্রোহের একজন পলাতক নায়ককে (লখাই) কেন্দ্র করে তিনি তুলে ধরেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্বাভাবিক অসহায়, অস্থির পরিস্থিতি চিত্র।

**মূল বক্তব্য :**

জীবন, মানুষ এবং শিল্প—এই তিনটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে এবং একত্রে যে কথাশিল্পীর অধিগত থাকে, তিনি কখনই আপোষ করেন না চারপাশের কৃত্রিম, মেকি সমাজগঠন, জীবনব্যবস্থা ও শিল্প প্রকরণের সঙ্গে। সমরেশ বসুর জীবনের ইতিহাস তারই প্রমাণ দেয়। লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশের আগে তাঁর জীবনের কঠিন সংগ্রামের কথা আজ আর অবিদিত নয়। ডিমের ফেরিওয়ালা থেকে শুয়োরের খোঁয়াড়ে চাকরি, ইছাপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির সামান্য মাইনের চাকরিতে সংসার প্রতিপালন, রাজনীতি- এসবের মধ্যে থেকে যে মানুষ 'নয়নপুরের মাটি', 'উত্তরঙ্গে'র মতো উপন্যাস লিখতে পারেন তিনিই তো যথার্থ জীবনশিল্পী।

অভিজ্ঞতা একজন বলিষ্ঠ কথাকারের সব থেকে বড় মূলধন। সচেতন বাস্তব দৃষ্টি এবং কঠিন সংগ্রামী জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া তীক্ষ্ণ বোধ নিয়ে সমরেশ বসু দেশকালের বৃহৎ পটটিকে ধরতে চাইলেন কথাসাহিত্যে। জীবন ধারণের সমস্ত রকম জটিলতাকে মেনে নিয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্বাভাবিক, অসহায়, কঠিন আড়ষ্ট ও অবক্ষয়িত পরিবেশে নিজেকে স্থিত করেও তিনি লিখতে পেরেছেন কালজয়ী অজস্র গল্প-উপন্যাস। মার্কসীয় জীবনদীক্ষা তাঁকে মাটির কাছাকাছি বাস্তবের মধ্যে এনে দিয়েছিল। তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছিল জীবনের সঙ্গে, জীবনের যোগে প্রত্যপ্ত প্রত্যায়িত। র‍্যালফ কক্স বলেছিলেন—

"It must show man not marely critical– or man at hopeless war with a society he can not fit into as an individual– but man

is action to change his conditions– to master life– man in Her money with the Course of literary and able to become the Lord of his own destiry."[১]

সমরেশ বসু এই সংগ্রামী জীবনের, এই অনিরুদ্ধ প্রতিবাদী প্রাণশক্তির চালচিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর প্রাক-বিবর পর্বে। 'উত্তরঙ্গ' এই পর্বের প্রথম উপন্যাস।

'উত্তরঙ্গ' সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। যদিও এর আগে লেখা হয়ে গেছে "নয়নপুরের মাটি' কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশ পেয়েছে 'আদাব' গল্পটি পরিচয় পত্রিকায়। সে গল্পটি লেখার গল্প শুনিয়েছেন রণেন মুখোপাধ্যায়:

"১৯৪৬ সালের আগস্ট মাস। সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ততায় মত্ত।... এমনি একদিন ছবি আঁকছিলেন সমরেশ বসু, সুন্দর একটি নারী মূর্তি। এমনি সময়ে ঘরে প্রবেশ করলেন সত্যমাস্টার। সমরেশের আঁকা নারী মূর্তি দেখে সত্যমাস্টারের মুখ বিষাদে ভরে গেল। বললেন, "দেশের এমন দুর্দিনে দেশের যুবকেরা এমনি ছবি এঁকে দিন কাটাবে বৈকি" .....সেই দিনই ইছাপুর কারখানায় নিজের টেবিলে বসে সমরেশ লিখলেন একটি গল্প 'আদাব'।"[২]

১৯৪৯-এ গ্রেপ্তার লেখক গ্রেপ্তার হলেন, ছাড়া পেলেন ১৯৫০-এ। 'কমিউনিস্ট পার্টি করব না' এই মুচলেখা দিলে চাকরি ফিরে পাবেন কিন্তু গোটা সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েও সিদ্ধান্ত নিলেন, মুচলেকা দেবেন না। তাঁর ব্যক্তিজীবনের এই উজ্জ্বলকালের ফসল 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস। জেলে বসেই লেখেন 'উত্তরঙ্গ'। স্রষ্টা স্বয়ং বলেছেন—

"মানবচরিত্র যা ছিল আমার কাছে গভীর অন্ধকারে, জেলের মধ্যেই সেই মানবচরিত্রের গায়ে কোথাও কোথাও টুকরো আলোকপাত হয়েছিল। সম্ভবত দুঃখ এবং গ্লানির মধ্যেই নিজেকে এবং অপরকে কিছুটা চেনা যায়।"[৩]

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (অখণ্ড) সদস্যপদ পাওয়া এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শ, ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টির কাজকর্ম করতে গিয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সমরেশ বসু অর্জন করেছিলেন, তাকে সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করবার কুশলতায় তিনি নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ উত্তরসূরী।

১৩৫৮ সালের আশ্বিনে বুক ওয়ার্ল থেকে প্রকাশিত হয় 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ভূমিকায় বলেন, 'যে উপাখ্যান আমি রচনা করেছি, তা উপাখ্যান হলেও ইতিবৃত্তও বটে।' উপন্যাস শুরু হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের এক পলাতক নায়কের আশ্রয়লাভের ঘটনা দিয়ে। হুগলী নদীর পুব-তীরবর্তী সেনপাড়া-দুলেপাড়ার জনপদটিতে বিদ্রোহী নায়কের নবজন্ম ঘটেছিল। গাঙের স্রোতে তার অতীত পরিচয়টি ভেসে গেলেও একটা পৌরাণিক প্রভাব তার চরিত্রে লেগে রইল। এ প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

"উত্তরঙ্গ'-এ সিপাহী-বিপ্লবের রণক্ষেত্র হইতে পলায়িত এক হিন্দুস্থানী সিপাহীর

সেনপাড়া-জগদ্দলের এক বাগদী-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ ও ঐ পরিবারভুক্ত হইয়া যাওয়ার কথা বলা হইয়াছে। তৎকাল-প্রচলিত অন্ধ ধর্মসংস্কার তাহাকে মনসার কৃপায় পুনর্জীবিত মৃত ব্যক্তি ও মনসার অনুগ্রহভাজন-এই পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"[৪]

সিপাহী বিদ্রোহের শ্রমিক হীরালাল জগদ্দল সেনপাড়ায় পরিচিত হল লখাই নামে। ফরাস ডাঙার ফরাসী প্রহরীর হাত থেকে নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য ইংরেজদের তাড়া খাওয়া সিপাহী হীরালাল লখীন্দর হবার আগে মরণপণ সাঁতার কাটতে কাটতে চেঁচিয়ে উঠে বলতে চাইল '..... জয় হোক হিন্দ সিপাহীর। বরবাদ হোক কোম্পানী।' ১৮৫৩ সালে কলকাতা-হুগলী রেলপথ চালু হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি একটি বৃহৎ প্রশ্নচিহ্নর সামনে দাঁড়িয়ে গেল। ১৮৫৫-তে রিষড়ায় পাটকল চালু হল, চালু হল তেলেনিপাড়াতেও। চাষের জমি হুহু করে নামমাত্র দামে বিক্রি (অধিগ্রহণ) হতে থাকল। গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হল। উপন্যাসে এই পরিবর্তমান পট সমরেশ বসু বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

"ওদিকে জোলা তাঁতী যুগী-সবাই তখন মাঠে নেমে এসেছে। সারা দেশে নাকি তুলো নেই, সুতো নেই। এমনকি, মুচি ডোম পর্যন্ত চামড়ার জন্য হা- পিত্যেশ করে রইল। দেশে নাকি চামড়াও নেই। জোলা হল জেলে, মুচি হল চাষী। হাড়ের বোতাম চিরুণি গড়ত যারা তারাও নামল মাঠে। সারা পরগণায় পায়রার খুপরির মত জমি ভাগ হল কুটি কুটি।"[৫]

এ প্রসঙ্গেও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—

".....গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় কল-কারখানার প্রতিষ্ঠায় গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন-গ্রামের চাষা-কারিকর অভাবের তাড়নায় চটকলে কাজ করিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছে ও কারখানার নূতন আবহাওয়া ও কুঠিয়াল সাহেবদের অসংকোচ ইন্দ্রিয়লালসা ও যথেচ্ছাচার তাহাদের সমস্ত শৃঙ্খলাবোধ ও ধর্মসংস্কারকে উন্মলিত করিয়াছে।"[৬]

যে সময়ে 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে, তখন উপন্যাস সাহিত্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাসের পরিবর্তে সমাজব্যবস্থা, তার রীতি-সংস্কারের ইতিহাসকে, সমাজের রাজনৈতিক ইতিহাসকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করার একটা ধারার প্রবর্তন করেছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গৌড়মল্লার' ও সমরেশ বসু তাঁর 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে। এদিক থেকে দেখতে গেলে 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান আছে। কিন্তু তার প্রয়োগ প্রতীকের ব্যঞ্জনায় সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়। শ্যাম বাগদীর ঘরে আশ্রয় প্রাপ্ত লখাইয়ের মধ্যে সিপাহী হীরালালের সত্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখনি, যখন সে দেখে, ইংরেজ বণিক চটকল তৈরী করে ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। গোটা উপন্যাসে লখাই এসব কিছুরই নিরাসক্ত দর্শক। তার সমস্ত রকম ঘৃণা ও বিরূপতা-যা তার তীব্রতম বিদ্রোহের অভিজ্ঞান—তা নিষ্ফল হয়ে যায়। কাঞ্চী বউয়ের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত চটকলের প্রসারণ ও গ্রামীণ মানুষগুলির সেখানে কাজ নেওয়ার অসহায়তা, নিজের মধ্যে

দুই বিদ্রোহী সত্তার অসহায় দ্বন্দ্বে নায়ক লখাই-এর মধ্যে নৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্কের শিল্পিত দ্বন্দ্বময় দিকগুলি মূর্ত হতে থাকে। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস এসবেরই উজ্জ্বল প্রবহমান আলেখ্য।

লখাইয়ের মত নায়ক চরিত্র সৃজনে সমরেশ বসু তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরমুখী হয়েও স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পথের নির্দেশক। ইতিহাস, সমকালীন সমাজ ও অর্থনীতি, তার ভাঙন-এর মধ্যে লখাই চরিত্র স্থাপন করে শিল্প-দক্ষতায় তাকে অঙ্কনের যে শিল্পিত প্রয়াস, তার মধ্যেই আছে নায়ক চরিত্রের নতুন অভীক্ষা। আর আছে নতুন জীবনের উপন্যাসের আধুনিকতা ও তীব্র বাস্তববোধ। উপন্যাসে হীরালাল লখাইয়ে পরিণত হল কিন্তু সে সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল জানত না। লখাই এই বিষয়ে খবর পাই সেনবাড়ীর মেজকর্তার কাছে। রাণী ভিক্টোরিয়া এখন ভারতেশ্বরী—এ খবরে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে লখাই। তার যাবতীয় আশা যেন শেষ হয়ে আসে। এরপরই আসে সেনদের গুহার মত অন্ধকার কয়েদখানার বর্ণনা। লখাইয়ের মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন ক্রোধ পায় প্রতীকী ব্যঞ্জনা। মজুমদার বাড়ীর সেজবাবু ব্যঙ্গ করে লখাইকে বলেন—'আমরা হলাম নিধিরামের জাত, যার ঢাল-তলোয়ার নেই।' লখাই প্রতিবাদ করতে চায়, সংগ্রামের কথা বলতে চায়, ভয়ে পারে না। বস্তুত এই অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞান হারানোর কাহিনি 'উত্তরঙ্গ'।

বিদ্রোহী সিপাহীর মহনীয় অভিজ্ঞান লখাইয়ের নঞর্থক অভিজ্ঞানে হারিয়ে যায়। সত্তার এই বিভাজনেই লখাই হয়ে ওঠে আধুনিক চরিত্র। সিপাহী হীরালাল শোনে তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসি হয়েছে। এ সংবাদে "আচমকা লখাইয়ের বুকে যেন তীক্ষ্ণ তলোয়ার আমূল বিদ্ধ করে কেটে ফেলল হৃদপিন্ড।" লখাইয়ের বেদনা সেজবাবুর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে লখাই প্রায় ঐতিহাসিক ট্র্যাজিডির নায়ক। সে বোঝে যে তার পূর্বজীবনের কথা, লড়াইয়ের কথা, পরাজয়ের কথা কাউকে বলা যাবে না। সেই পরাজয় ব্যাপকভাবে নিয়ে এসেছে গোটা সমাজ-অর্থনীতির ভাঙন। সিপাহী হীরালাল প্রত্যক্ষ করে এক রাজনৈতিক পরাজয় আর লখাই বাগদী সাক্ষী হয়ে থাকে এক অর্থনৈতিক সর্বনাশের। একই ব্যক্তির এই দুই অভিজ্ঞতার তথা তার ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু সামগ্রিক ভাঙনের সম্পূর্ণতাকে ধরেন। বুঝিয়ে দেন যে দুটি বিষয় পরস্পর সংলগ্ন—যেমন হীরালাল ও লখাই। চটকলে বৃটিশদের রপ্তানি-বাণিজ্যের, মুনাফা লোটার যে সাঁড়াশি বসে, তাতে ভারতীয় মূলধন খাটে না-তা আসলে প্রথম রাজনৈতিক পরাজয়ের পরিণতি।

সমরেশ বসু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জগদ্দল-সেনপাড়ার নতুন ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে ধরেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টির তাৎপর্য ধরা পড়বে— ১. 'তিপান্ন সালে যেদিন প্রথম রেললাইন পাতা হল কলকাতা হুগলী পর্যন্ত, সেদিন থেকেই আকালের শুরু বলা যেতে পারে।' ২. 'তারপরেই আর এক ধাক্কা এল পঞ্চান্ন সালে, রিষড়েতে এক কারখানা খুলে।' ইংরেজের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস স্থান পেয়েছে 'উত্তরঙ্গে'। এই সর্বনাশের

পাশাপাশি চটকলের জীবনচিত্র আঁকতে ভোলেন নি জীবনশিল্পী সমরেশ বসু। পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক বৃটিশশক্তি যে প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরিয়ে কায়েমী স্বার্থের স্রোতে অর্থনৈতিক তরণীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে-এই ঐতিহাসিক বোধ ও সমাজচেতনা সমরেশ বসুর ছিল। এই বিশিষ্ট বোধ আর বাস্তব অভিজ্ঞতা মিলেই রচিত হয়েছে 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস। জীবনচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে পবন চাড়াল চরিত্রটির গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি দেন সমরেশ। নারান কাতু মদনের বৌকে নিয়ে চটকলে চলে এসেছিল। সেখানে জীবনের রূপ ভিন্ন।

"কি বিচিত্র আবহাওয়া এখানকার। এখানে সমাজ-সংসার সব থেকেও যেন তার কোন বালাই নেই। মানুষ রাত পোহালে মাঠে যায়, সেখানেও তাদের সুখ-দুঃখের কথা হয়, নানান চর্চা হয়। এখানকার কারখানাতেও তা হয়। কিন্তু তার রূপ যেন ভিন্ন। কথা-হাসি-গান সবই যেন পাট পিষ্ট করার বিরাট লৌহ চাকাটার মত কঠিন, পেঁজা পাটের মত শ্বাসরোধী নরম, স্টিম এঞ্জিনটার বিচিত্র বহু অংশ ও গায়ের বিদঘুটে তেলের গন্ধের মত। ওই এঞ্জিনটার জন্যই মানুষটার বেঁচে থাকার দরকার।"[৭]

এই যন্ত্ররাজ্যে পবন তার বৌ তারাকে নিয়ে আসে। পবন এসে দেখল, এক শোষণের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আর এক শোষণের মধ্যে সে এসে পড়েছে। ইতিহাস সচেতন, সমাজ সচেতন কথাকার সমরেশ বসু অসাধারণ শব্দবিন্যাসে বিষয়টি তুলে ধরেছেন:

"কিন্তু না, যন্ত্র ততখানি শিকড় এখনও গাঢ়তে পারেনি এদেশের মাটিতে। হাড্ডিসার প্রেতিনী তখন সবেমাত্র কাঁচা পয়সার ওড়না ঢেকে মিছে ভাবনাহীন জীবনের ডাক দিয়েছে। তবু একবার বক্ষলগ্ন হয়ে মুক্তি নেই।"[৮]

উপন্যাসের আরেক চরিত্র শ্রীনাথ তার দুই বউকে নিয়ে চটকলে এসেছে পেটের টানে। সে সন্তানহীন। উৎপাদন ক্ষমতা তার নেই—রাহুগ্রাসকবলিত তৎকালীন ভারতবর্ষের মত। চটকলের গোরা সাহেবের ধর্ষণে শ্রীনাথের দুই স্ত্রীই গর্ভবতী হয়। বিষয়টি প্রতীকীও বটে। ভারতবর্ষের গর্ভেও জন্ম নেয় এক জারজ ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা। তারাও শেষ পর্যন্ত একজন সাহেবের শিকার হয়। পবন কুরুসেনকে গলাটিপে মারতে যায়, কিন্তু তারা "মরে যাবে যে" এই বাক্য উচ্চারণে পবনের হাত শিথিল হয়ে যায়। অবশেষে তারা এবং পবন আত্মহত্যা করে। না করে উপায় নেই। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় আত্মসমর্পণ তথা আত্মবিক্রয় না করলে এভাবেই মরতে হবে, এই ইঙ্গিত উপন্যাসের বাস্তবতাকে আরও তীব্র করে তোলে।

পবনের সর্বনাশ লখাইয়েরও সর্বনাশ আনে। তার কথাতেই যেন পবন আত্মহত্যা করে—এমন একটা বিশ্বাস লখায়ের মনে চেপে বসে। বেপরোয়া, অবাধ্য, অপরিণামদর্শী পবন জমিদারের সঙ্গে বিরোধ করে সবকিছু খুইয়ে প্রথম কেঁদেছিল গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকে। বলেছিল—"ভগবান, এ হাত-পা বাঁধা ছোটোলোকদের তবে কেন তুমি জন্মো দেও, কেন দেও।" তারপর তারাকে নিয়ে চটকলে। লখাই বারণ করেছিল, মানেনি পবন, মানার

কোনো কারণও ছিল না। কিন্তু তারাকে হারিয়ে লখায়ের কাছে ফিরে এল পবন। লখাই তার হাতে কাটারি তুলে দিয়ে বলেছিল, "সে শোরের বাচ্চা ফিরিঙ্গিকে এক কোপে শেষ করে দে আয়।" আরও বলেছিল '.....মাগের মান রাখতে পারিসনি, গলায় দড়ি দিগে যা।' জীবনটা কেমন যেন অর্থহীন হয়ে উঠতে থাকে লখাইয়ের। সারদার কাছে গিয়েও সে তৃপ্তি পায় না। তার মনে হয় জীবনটা নিরর্থক। শেষ পর্যন্ত কাঞ্চন মারা যায়। পাল্টে যেতে থাকে দ্রুত চারপাশের সবকিছু। এক মহা সর্বনাশ যেন ধেয়ে আসে। এরই মধ্যে লখাই—"যেন গুহাভ্যন্তরে এক পাথরের মানব রাত্রি আসার অভিশাপে স্তব্ধ ও শঙ্কিত।"

"উত্তরঙ্গ' আসলে আমাদেরই পরাভবের আখ্যান", বলেছিলেন জ্যোৎস্নাময় ঘোষ। যে ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে হীরালাল পরাজিত হয়েছিল, তারই হাতে পরাজয় ঘটল লখাইয়ের। এটা ঔপন্যাসিকের ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচায়ক। তাই এক ঐতিহাসিক ধ্বংসের মধ্যে লখাই তার পুত্রের নাম হীরালাল রেখেছিল। হীরালাল এই উপমাহাদেশের ভবিষ্যৎ। তাই উপন্যাসের শেষে শিশু হীরালাল একটি পেরেক মাটিতে পুঁততে গিয়ে বাপের পায়ের বাধায় বিরক্ত হয়ে বলে, 'সল, সল ছিলিন্দারতা খালা কলে দিই।' সমরেশ বসু মানবজীবন ও তার সঙ্গে অন্বিত সমাজ-রাজনীতিকে তুলে ধরেন লখাইয়ের আত্মসমর্পণের যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়ার ঐতিহাসিক মানবচিত্রের মধ্য দিয়ে 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে।

এমনভাবে ইতিহাস এবং বর্তমানের বাস্তবতা, সমাজ-অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে এক নতুন প্রত্যয়লিপি। এই কারণে স্বতন্ত্র ঘরানায়, একেবারে অকৃত্রিম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পেল সমরেশ বসুর জীবনপথের নতুন যাত্রা।

**তথ্যসূত্র :**


১) Deth of the hero– The novel and the people– 133.
২) প্রসঙ্গ: সমরেশ বসু, অতনু চট্টোপাধ্যায় ও অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ১৯৭৮, পৃ- ৬৯-৭০।
৩) নিজেকে জানার জন্য, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২।
৪) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪, পৃ- ৭৩৩।
৫) উত্তরঙ্গ, সমরেশ বসু রচনাবলী, ১৯৯৭।
৬) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৪, পৃ-৭৩৩।
৭) উত্তরঙ্গ, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, ১৯৯৭।
৮) উত্তরঙ্গ, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, ১৯৯৭।

# বন্দি 'প্রজাপতি',র মুক্তির আখ্যান

সুচরিতা চক্রবর্তী

সাহিত্যিক সমরেশ বসু, জন্ম ১৯২৪। লেখক হওয়ার জন্য তিনি যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তা ছিল নিঃসঙ্গ কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কারখানার চাকরিতে ফিরে না গিয়ে তিনি লেখালেখিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। একটি সাক্ষাৎকারে, সহ-লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, "লেখার ক্ষেত্রে সমরেশ-দা কঠোর রুটিন বজায় রেখেছিলেন। তিনি তার সারা জীবন সাহিত্য রচনা করার জন্য নিজের মনকে তৈরি করেছিলেন। প্রতিদিন সকালে লিখতে বসতেন; বিকেলের দমবন্ধ গরমের মধ্যেও তিনি লিখতেন।"

সমরেশ বসু সর্বদা দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে তিনি সাহিত্য নয়, জীবনের জন্য লিখেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কোনও গল্প - এমনকি একটি থ্রিলার - তখনই সাহিত্যে পরিণত হয় যখন এটি পাঠকদের সামাজিকভাবে সচেতন করে তোলে। তার বেশিরভাগ উপন্যাস রাজনৈতিক সক্রিয়তা, শ্রমজীবী-শ্রেণীর জীবন এবং যৌনতার মতো সমসাময়িক থিমগুলিকে ঘিরে রচিত হয়েছিল।

বাংলা কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু একজনই এবং তার তুলনা তিনি নিজেই। প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যেও লেখালেখিই ছিল তাঁর একমাত্র পেশা, কমিউনিস্ট পার্টি করার কারণে ১৯৪৯-৫০ সাল জেলে কাটাতে হয়।

কোন সৃষ্টিকে কতটা অন্ত:করণ করলে কতটা গভীরে গেলে তাতে ডুব দেওয়া যায়! তাঁর সাহিত্য কর্মকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কীভাবে লেখককে স্পর্শ করা যায়! কীভাবে বুঁদ হয়ে থাকা যায় গল্প কবিতা উপন্যাসে! কালের যে সময় বয়ে যায়, তাকে বুঝে সমাজ সংসার থেকে চরিত্রগুলো খুঁজে খুঁজে মিলিয়ে নিয়ে লিখে লিখে প্রকাশ করা কি এতটা সহজ? যা লেখকের কাজ যা কেবল পাঠকের অনুভব। যুগে যুগে কত সহস্র সাহিত্য সময়ের দলিলকে শক্ত সুতোয় বেঁধে রেখেছে। তার কোনো মহিমা এতোটুকু খন্ডন হয়নি। খন্ডন হতে দেয় নি পাঠককূল। আমাদের জীবনের সূক্ষ্ম অনুভব থেকে মহৎ কর্ম-প্রেম - প্রীতি - ভালোবাসা - স্নেহ - দুঃখ - যন্ত্রণা সব কিছুই নথিভুক্ত হয়ে আছে সাহিত্যের পাতায়।

উপন্যাসে চরিত্রের গভীরে অন্তর্নিহিত সত্যকে স্থাপন করেন লেখক। কোনো কোনো লেখকের কাছে উপন্যাসের নির্দিষ্ট মডেল থাকে আবার কেউ কেউ এতে বিশ্বাসী নন। উপন্যাসের গোলকধাঁধায় লেখক সচেতনভাবে চলাফেরা করেন। অনেক অনেক চরিত্র এসে তাকে ঘিরে ফেলে। লেখক যে তাদের দেখতে পান এমনও নয়। কিছুটা চেনা বাকি ছায়া ছায়া। শুনতে পান চরিত্রের ফিসফিস। কেউ এসে লেখককে জড়িয়ে ধরে কেউ ক্রমশ আড়াল হয়ে যায়।

মানুষের চিন্তা, ভাব, আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা- এ সবই সাহিত্যের উপজীব্য। এগুলোকে

সামনে রেখে মানুষ এগিয়ে যায় প্রগতির পথে। সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজের সর্বত্র প্রতিনিয়ত রদবদল হচ্ছে। সাহিত্য সত্য, সুন্দর, আনন্দময় অনুভূতিতে পাঠক হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে। হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিও পেতে পারে মহৎ জীবনের আভাস। পাষাণবৎ মানুষও নতুন করে খুঁজে পায় মনুষ্যত্ব। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহিত্যপাঠ হতে পারে একটি কৌশল।

জীবনকে সৃজনশীল ও ক্রিয়াশীল রাখতে সাহিত্যের সান্নিধ্য আবশ্যক। সাহিত্য মানবমনের চিরকালের মুক্তির সরোবর। সাহিত্য পাঠের চেয়ে মহৎ আনন্দ আর নেই।

একনিষ্ঠ পাঠকের পক্ষেই কেবল এ আনন্দ লাভ করা সম্ভব। সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে আমরা লাভ করি জগৎ ও জীবনের উপলব্ধি। সেই সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করি নিজেকে। আমাদের অন্তরের 'আমি' কে—তা জানার প্রশ্ন আসে মন থেকে। সাহিত্যপাঠের মতো নির্মল ও পবিত্র আনন্দ আর নেই।

আজ আলোচ্য উপন্যাসটি হলো কালজয়ী লেখক সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি'।

১৩৭৪ সালে শারদীয় 'দেশ' - এ প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। তাকে অশ্লীল বলে নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়ে ১৯৬৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মামলা করেন তরুণ এডভোকেট অমল মিত্র। সরকারী পক্ষও এলেন অমল মিত্রের সমর্থনে উপন্যাসটিকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করতে।

অভিযোগকারী অমল মিত্র আসেন কাঠগড়ায়। তিনি বলেন, "আমি কলকাতা হাইকোর্টের একজন তরুণ এডভোকেট। আমার বয়স ৩২। ১৯৬২ সালে আমি ওকালতি পাশ করি। নিবাস টালিগঞ্জের ২২ কুকার লেন। আমি 'প্রজাপতি' উপন্যাসটির লেখক সমরেশ বসু ও সাপ্তাহিক 'দেশ'র মুদ্রাকর ও প্রকাশক সিতাংশু কুমার দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি। 'দেশ' সাপ্তাহিক প্রতি বছর পুজোর সময় শারদীয় সংখ্যা বের করে। শারদীয় দেশের ১৭৫ পৃষ্ঠা থেকে ২২৬ পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লিখিত 'প্রজাপতি' উপন্যাসটি বেরিয়েছে। আমি এই উপন্যাস পড়েছি। এই উপন্যাসের কোনো সাহিত্যিক মূল্য নেই। এটি নিছক অশ্লীল রচনা। আমি বাংলা সাহিত্যের একজন পাঠক। বাংলা সাহিত্যের পবিত্রতা ও শুচিতা রক্ষা করাকে আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

আমার অভিযোগ প্রজাপতি অশ্লীল। এটি পাঠকদের দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলবে। ছেলে বুড়ো যুবক কিশোর যেই এই উপন্যাস পড়বে তার নৈতিক অধঃপতন ঘটতে বাধ্য। মহামান্য আদালতের সুবিধার জন্য আমি অতি অশ্লীল অংশ লাল কালিতে দাগিয়ে এনেছি।"

অভিযুক্ত লেখক সমরেশ বসু উঠলেন কাঠগড়ায়। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী তাঁকে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি শুনিয়ে দেওয়া হলো।

ফরিয়াদি পক্ষ থেকে লেখকের বক্তব্য শুনতে চাওয়া হলে সমরেশ বসু বলেন, "তিনি মনে করেন না 'প্রজাপতি' অশ্লীল। আজকের মধ্যবিত্ত সমাজ যে প্রচন্ড যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে

তার পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান সমাজ সম্পর্কে লিখতে আমি আগ্রহী হয়েছিলাম। আজকের দিনের একজন ঔপন্যাসিকের কর্তব্যই আমি পালন করেছি। আমাদের সমাজে সুখেন এক বিরাট সমস্যা। সমাজে তাদের উপস্থিতি উপেক্ষা করা যায় না। তাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। শহর, আধা শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলোতে তারা আগাছার মতো বেড়ে উঠছে। এটা মনে রাখতে হবে যে সুখেনের মতো ছেলেরা আমাদের পরিবার এবং আমাদের সমাজ থেকেই উঠে আসছে। আমি কেবলমাত্র তার বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্যান্য বক্তব্যে আসার আগে আমি আরও কয়েকটি বিষয় পরিস্কার করে নিতে চাই। যদিও উপন্যাসটির ঘটনাবলী চব্বিশ ঘন্টার কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে সুখেনের গোটা জীবনই পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। কারণ তার জীবনের অতীতের অন্যান্য ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছে। মন বর্তমান থেকে অতীতে অবাধে বিচরণ করতে পারে। যে কোনো একটি ঘটনা দেখতে দেখতে পুরানো বহু বিষয় মনে আসে। কিন্তু এসব ঘটনা একেবারে যুক্তিহীন নয়, অনর্থক নয়।"

'দেশ' পত্রিকার সেদিনের সম্পাদক অশোক কুমার সরকার নিজের ঘাড়ে দোষ নিতে চাইলে নির্ভয় হয়েছিলেন সমরেশ বাবু।

সমরেশবাবুর পক্ষে প্রধান সাক্ষী হলেন বুদ্ধদেব বসু। বিচারকের আপত্তি থাকা সত্বেও বুদ্ধদেব বসুর অকাট্য যুক্তিতে সেদিন কক্ষে উপস্থিত তরুণ তরুণী বুদ্ধিজীবীদের হাততালিতে ফেটে যাচ্ছিলো আদালত।

একের পর এক পৃষ্ঠা নম্বর বার করে লাল কালিতে দাগানো অংশ পড়ে অশ্লীলতা নিশ্চিত করতে বলেছিলেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের চিফ ম্যাজিস্ট্রেট কুমারজ্যোতি সেনগুপ্ত, কালো স্যুটেড বুটেড সাগরময় ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ।

সেদিন উপস্থিত ছিলেন দ্বিতীয় অভিযুক্ত 'দেশ' পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক সিতাংশু কুমার দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, তার স্ত্রী প্রতিভা বসু। সমরেশ বসুর দ্বিতীয় সাক্ষী ছিলেন নরেশ গুহ।

ড. নরেশ গুহ বলেন, "সাহিত্যিক হিসেবে সমরেশ বসু তাঁর পরিচিত। তাঁর অনেক বই তিনি পড়েছেন। তিনি একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক। ছোটগল্প তো বটেই উপন্যাসেও লেখকের বুদ্ধিমত্তার ছাপ। তিনি প্রজাপতি পড়েছেন। প্রজাপতিকে তিনি অশ্লীল মনে করেন না। এই উপন্যাসের কোনো অংশই অশ্লীল নয়, সমগ্র উপন্যাসটি তো নয়ই। প্রজাপতি উপন্যাসটি সমাজের সমালোচনা এবং সেদিক থেকে একটি নৈতিক মূল্য তার আছে।"

বিভিন্ন বয়সের পাঠকের এই বই পাঠ বিবেচ্য কি না এই প্রশ্নে ড. নরেশ গুহ বলেন, "আমার একটি ১১ বছরের মেয়ে আছে। সে বই পড়তে খুব ভালোবাসে। আমি প্রজাপতি উপন্যাসটি টেবিলের ওপর খোলাখুলিই রেখে দিয়েছিলাম। মনে রাখবেন ------ আমি এখানে শারদীয়া দেশের কথা বলছি না। প্রজাপতি তখন বই হয়ে বেরিয়েছে। সেই বইটি

রাখা ছিলো আমার টেবিলে। আমার ১১ বছরের মেয়ে সেটা ছুঁয়েও দেখলো না। এতেই বোঝা যায় একেবারে ছোটরা বড়দের উপন্যাস পড়ে না। শুধুমাত্র একটি উদাহরণ থেকে এই কথা বলছি না। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞতা থেকে, বই পড়ে,, বুদ্ধি থেকে বা অনেক কিছু দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে প্রজাপতি উপন্যাসটি সমাজের সব বয়সের মানুষ পড়বে না।"

বুদ্ধদেব বসু বার বারই বলেছিলেন "১৯৬৮ সালে দাঁড়িয়ে এই লাল কালিতে দাগানো প্যাসেজগুলিকে কি করে অশ্লীল বলা যেতে পারে!"

"প্রজাপতি" উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সিদ্ধি এবং সীমাবদ্ধতা তৈরি হল একটি বিশেষ বিষয়ে। সেই বিষয়টি মূলত উপন্যাসের ভাষা। লেখক নিজেই বলেছিলেন -- "স্বীকারোক্তি যে ভাষায় লিখেছিলাম ওই ভাষাতে আমি যদি 'প্রজাপতি' লিখতাম তাহলে কিন্তু 'প্রজাপতি' নিয়ে কোন বাদ বিসম্বাদ হতো না। যেহেতু 'প্রজাপতি'র মূল চরিত্র একটি মাস্তান, মাস্তানদের ভাষায় লিখতে গেলাম। তাছাড়া এটাতে আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট এর ব্যাপার ছিল।"

উপন্যাসের শুরু হয় শিখা বলে একটি মেয়ের ঘরে প্রজাপতি মারা দিয়ে। শিখা বিছানায় শুয়ে হাতে আহত প্রজাপতি ধরে তার বিচ্ছিন্ন ডানা লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আর সুখেন দেখছে শিখার পরনে শুধুই একটি ঢিলেঢালা ব্লাউজ। তার নিচে কিছুই নেই। এবং তার শরীরের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। এখানে সুখেনের জবানীতে শিখার দেহের বর্ণনা আছে।

আহত প্রজাপতিকে দেখে সুখেনের মনে পড়েছে ১৪ বছর বয়সী জিনার কথা। তার থেকে বয়সে অনেক বড় কাকু সম্পর্কের লোকেরা পিকনিক পার্টিতে যে জিনার শরীর নিয়ে যৌনতাবশত নাড়াচাড়া করছিলো। সেই সব লোকেদের হাত থেকে উদ্ধার করে সুখেন জিনাকে টেনে নিয়ে যায় নির্জন আখক্ষেতে। সেখানে তাদের মধ্যে যা ঘটেছিলো তার বর্ণনা অশ্লীল বলে সমালোচনা শুরু হয়।

সুখেনের শিখাকে চুম্বন, বন্ধুর বোন মঞ্জুরিকে নিয়ে শুতে যাওয়া, সুখেনের মেঝদার সাথে ঝিয়ের মেয়ের সম্পর্কের বিশ্লেষণ অত্যন্ত অশ্লীল। আবেদনকারীরা এই অভিযোগ এনেছে।

অবশ্য সাহিত্যে শ্লীল অশ্লীল বিষয়টি ব্যক্তি বিশেষে নির্ভর করে। 'প্রজাপতি' প'ড়ে যে সমাজের ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে তা অত্যন্ত বাস্তব।

লেখক সুখেনকে আমাদের এই সমাজ থেকেই জীবন্ত তুলে এনেছেন। আগাছার মতো এই সমস্ত চরিত্রগুলি স্বার্থান্বেষী মানুষের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠে। ২৪ ঘন্টার ঘটনাবলীর ভেতর সুখেনের পুরো জীবন প্রতিফলিত। জীবনের অতীতচারণ সবদিক থেকেই অর্থবহ। উপন্যাসের প্রতীক প্রজাপতি। সুখেনও ছিল প্রজাপতির মতোই সুন্দর ও সরল। কিন্তু সমাজ

তাকে সুন্দর থাকতে দেয়নি। — "মেয়েগুলোর মধ্যে কে যে চোদ্দ, আর কে যে চব্বিশ, কারুর বাপের বলার ক্ষমতা ছিল না, সাজগোজ আর পোশাকের বাহার কি। যেমন ওদের খাইখাই ভাব, তেমনি যারা দেখবে, তাদেরও খাইখাই ভাব। তার সঙ্গে মায়েদের রেস তো ছিলই। .....উহরে বাবা, মিত্তিরের মেয়েটাকে নিয়ে ফ্যাক্টরি ওভারসিয়ার আইবুড়ো চ্যাটার্জি কি কান্ডটাই না করছিল। ওদিকে তো সালোয়ার কামিজের বুক পাছা ফেটে যাবার যোগাড়, কিন্তু খুকিটির কাকু কাকু বলে আদর কাড়বার কি ঘটা! .... আর কাকুটিও তেমনি, যা তুলে নেবার তা তুলে নিচ্ছে। কখনো গাল টিপে দেয়, ঠোঁটে একটু টোকা মেরে দেয়, ঘাড়ে হাত দিয়ে ঝাকানি দেয়। .... কিন্তু বলতে যাও, তাহলে সুখেন নোংরা ইতর।" জিনার সঙ্গে সুখেন চ্যাটার্জী কাকুর মতো ব্যবহার করেছিল। জিনার মুখটা যন্ত্রণায় বেঁকে গিয়েছিল। তখন আবার সুখেনের মনটা টনটন করে উঠেছিল। এই জিনাও সমাজের একটা অংশ। তাই বলে তার সঙ্গে বিবাহ এবং ঘর বাঁধার স্বপ্ন, সুখেনের লাঞ্ছিত হওয়া, আর যাই হোক সমরেশ বসুর চরিত্রের কোন অবয়ব সেখানে পাওয়া যায় নি।

এছাড়া উপন্যাসে সুখেনের দুই দাদা যারা দুই রাজনৈতিক দলের প্রতিভু।

সমরেশ সাহিত্যকে পর্বে ভাগ করে বিচার করলে দেখা যায় প্রথম পর্বে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ছিল গ্রাম জীবন ও গ্রাম সমাজ। তারপর সেখান থেকে শ্রমিক সমাজের চিত্র। তারপর নগরজীবন ও পেটি বুর্জোয়া সমাজের চিত্র। আবার সেখান থেকে রাজনীতিকে বিষয় করে লেখা অর্থাৎ রাজনৈতিক পর্ব।

মেকি নগরসভ্যতার একঘেয়ে ক্লান্তিতে যুবসমাজের পতনজনিত হতাশা সৃষ্টি করে যে বিচ্ছিন্নতা তা থেকেই আসে অন্ধকার। এই অন্ধকার লেখকসৃষ্ট নয়, অন্ধকার থেকে উত্তরণের আশাতেই সমরেশ বসুর কলমে প্রথম রচিত হর ১৯৬৫ সালে 'বিবর' উপন্যাস।

বাংলার পাঠকমহলে আলোড়ন পড়ে গেল একটা উপন্যাস নিয়ে। 'বিবর'। লেখক — সমরেশ বসু। একদল ছিছিক্কার উগরে দিলেন উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে। অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হল সেটি। অপর দল, আড়াল না-রেখে প্রকৃত মনস্তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলার সাহস দেখানোর জন্য কুর্নিশ জানালেন লেখককে। লেখক জানালেন গতানুগতিক ধারার সাহিত্যর চলন থেকে বেরিয়ে তার এই প্রয়াস বাংলা সাহিত্যের পাঠকের স্বাদ বদলাবে। পাঠকও সেটাই চায়।

ষাট দশকের আর্থ সামাজিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বিরাট পালাবদল ঘটেছিল। সমরেশ সাহিত্যে 'বিবর' একটি বাঁক। সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় বিশ্বের সর্বত্র কোনও না কোনও বাঁকে হঠাৎ সৃষ্টি হয়েছে নতুন ভঙ্গি, নতুন রীতি এবং নতুন বিষয়ের অবতারণা। এই নতুনত্বের পেছনে থেকে যায় তৎকালীন সমাজের প্রতি শিল্পী সাহিত্যিকের তথা সমগ্র মানুষের চাপা ক্ষোভ বা আত্মগোপন করে থাকা কোনও বাসনা। যে আধুনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে বিবর উপন্যাসের হাত ধরে তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস এবং কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্ট ব্যাঙ্কশাল কোর্টের রায়ই বজায় রাখলেন। উপরন্তু 'প্রজাপতি' উপন্যাসটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যে প্রজাপতি বই হিসেবে বেরিয়েছে। হাইকোর্ট তার সব কপি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিলেন। বিচারপতি অমরেশ রায় তাঁর রায়ে মন্তব্য করলেন তিনি মনে করেন অপরাধের তুলনায় সাজা খুবই কম দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা বলেন, অশ্লীলতার বিচারের সময় আদালত বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে দেখবে। দেখতে হবে যাদের মন দুর্নীতির বশ হতে পারে এবং যাদের হাতে প্রকাশনাটি সহজেই যেতে পারে --- লেখার অশ্লীল অংশ তাদের বিপথে নিয়ে যাবে কিনা? মূল বিচার্য হল বইটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা লঙ্ঘন করেছে কিনা।

১৯৮৫ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর ঘটে গেলো ঐতিহাসিক ঘটনা, এই দিনটি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের এক স্মরণীয় দিন। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ওইদিন নির্ধারিত হলো সাহিত্যে শ্লীলতা -অশ্লীলতার স্পষ্ট সীমারেখা। কালজয়ী লেখক সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' পেলো সসম্মান মুক্তি। সমস্ত রায়কে অগ্রাহ্য করে সুপ্রিম কোর্টের দুই মহামান্য বিচারপতি, শ্রীআর এস পাঠক ও শ্রী অমরেন্দ্র নাথ সেন সাহিত্যে অশ্লীলতার ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটালেন। 'প্রজাপতি' উপন্যাসকে অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্তি দিলেন। আদেশ দিলেন অভিযুক্তরা যদি ইতিমধ্যেই জরিমানার ২০১ টাকা দিয়ে থাকেন তবে তা ফেরৎ দেওয়া হোক। অভিযুক্তদেরও অশ্লীলতার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। সাহিত্যের বিচার সভা শেষ হয়ে মুক্তি পেলেন 'দেশ' পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর সিতাংশু কুমার দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক সমরেশ বসু। 'প্রজাপতি' মুক্তি পেলো ১৭ বছর পর।

# সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' : অবক্ষয়িত সমাজের প্রতিচ্ছবি

পুতুল বৈদ্য

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) বাস্তব জীবনের রূপকার। সাহিত্য-সমাজ-জীবনকে তিনি একাত্ম করার প্রয়াস চালিয়েছেন আমৃত্যু। সাহিত্যের উদ্ভাবনা-চিন্তাধারা প্রতিফলিত কিংবা প্রতিবিম্বিত হয় সমাজজীবন থেকে। সমরেশ বসু তাঁর কথাসাহিত্যে সেই বাস্তব জীবনকে অকৃত্রিমভাবে অঙ্কন করেছেন। জীবনের উত্থান পতন, ভিন্ন পরিবেশের বৈচিত্র্যময় জীবনধারায় বেড়ে ওঠা কিশোর যুবক নিরন্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। যেগুলি বিভিন্ন গল্প-টল্প নামে তিনি প্রস্ফুটিত করেছেন। বেকারত্ব, বন্দীদশা এবং দারিদ্র্যের প্রতি প্রহরে তিনি নিজের জীবনে প্রকৃত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন। জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত থেকে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সমাজের চতুর্দিকে যেসব সমস্যা অন্যজনের চোখ এড়িয়ে যায় ; সমরেশ বসুর দৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়ে যায়। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজের অন্যায় অপকর্মগুলিকে তুলে ধরেছেন গল্প-উপন্যাসে। 'প্রজাপতি' (১৯৬৭) উপন্যাসটি বহুল চর্চিত, আলোচিত এবং বিতর্কিত। নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালতে প্রায় আঠারো বছর কেস চলার পর মুক্ত হয়েছে। মূলত উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র সুখেনকে নিয়ে যত সমস্যা। এ বিষয়ে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য :

'প্রজাপতি' উপন্যাস লেখার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, 'প্রজাপতি'-এর অতীত ও এ যুগের নতুন পাঠকবর্গ বিশ্বাস করবেন। উপন্যাসের নায়ক সুখেন বা অন্যান্য নারী পুরুষ চরিত্রগুলো সমাজে ভুঁইফোড়ের মতো গজিয়ে ওঠেনি। সমস্ত চরিত্রই আমাদের সমাজের সৃষ্ট। এতে যদি আমার কোন অংশ থেকে থাকে, আমি কী করেই বা একজন লেখক হিসাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকবো ? আমার মন পীড়িত হয়, তখন আমি লেখা ছাড়া নিরুপায় বোধ করি।[১]

'প্রজাপতি' উপন্যাসটি সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। নষ্ট হয়ে যাওয়া অবক্ষয়িত সমাজে সুখেনের মতো চরিত্র বর্তমানে খুবই সহজলভ্য। শিখা, জিনা, মঞ্জরী, কৃষ্ণা, ন'কড়ি হালদার, মৃণ্ময় গুপ্ত, বেলা, শুলাদা, শুটকা এবং সুখেনের পিতা মাতা ও দুই দাদা কেশব ও পূর্ণেন্দু — উপন্যাসের সব চরিত্রই বাস্তব। শিখা, জিনা, মঞ্জরি, বেলা—নারী চরিত্রগুলি প্রায় একই ধরনের। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তারা বৈচিত্র্যময় রূপ ধারণ করেছে। শুধুমাত্র শিখা শেষপর্যন্ত সুখেনকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে। সুখেনের দাদারা এবং শিখার দাদারা ধান্দাবাজ। সুখেনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত। শহর-শহরাঞ্চল- গ্রামগঞ্জের অলিতে গলিতে সুখেনরা আজ বড় সমস্যার বিষয়। মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত, পিতার দুর্নীতি, দাদাদের দলীয় রাজনীতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করা — এসব কিছু সুখেনের মনকে তিক্ত করে তোলে। সে হয়ে যায় বখাটে, অবাধ্য ও রকবাজ। জীবন সম্পর্কে সে বীতশ্রদ্ধ।

রকবাজ সুখেনের জীবনের শেষ চব্বিশ ঘণ্টার কাহিনি উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। জীবনের শেষ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সুখেনের মনে উদ্ভাসিত হয়েছে বিভিন্ন টুকরো টুকরো স্মৃতি। যেগুলি সুখেনকে কুরে কুরে খায়। বখাটে মাস্তান সুখেনের হৃদয়েও বিবেকবোধ জাগ্রত করে সে সমস্ত টুকরো স্মৃতিগুলি। উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে সুখেনের একটি প্রজাপতি ধরার চেষ্টা দিয়ে। প্রজাপতি সৌন্দর্যের প্রতীক। সুখেন প্রজাপতিকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে মেরে ফেলে। প্রজাপতির মৃত্যুর এই প্রতীক ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক গূঢ় ব্যঞ্জনাময় অর্থ প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসের নায়ক সুখেন শিখাকে বিয়ে করে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো সুখের সংসার করতে চেয়েছে। সে একজন সৎ শিক্ষক হতে চেয়েছে কিংবা একজন সাধারণ সৎ মানুষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। উপন্যাসের শেষে সুখেন দু'টি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির মাঝে পড়ে বোমার আঘাতে মারা পড়ে। সুখেনের হৃদয়-গহীনে সুপ্ত প্রজাপতির মতো বাসনারও মৃত্যু ঘটে।

সুখেনের অন্তরের মাঝেও প্রজাপতির মতোই সুন্দর, নিরীহ মন রয়েছে। সে সৎ কর্মশীল জীবনযাপন করতে আগ্রহী। চাকরির জন্য কারখানার ম্যানেজারের কাছে অনুরোধ জানায়। কিন্তু ম্যানেজারের মতো মানুষ চায়না সুখেন গুণ্ডা থেকে ভালো মানুষ হয়ে যাক। মালিক-ম্যানেজার-রাজনৈতিক নেতাদের গুণ্ডা সুখেনকে বড়োই প্রয়োজন। অন্যান্য ঝুট ঝামেলা থেকে তাদেরকে নিরাপদে রাখার জন্য সুখেনকে তাদের ভীষণ প্রয়োজন। সুখেনকে সেজন্য ফ্যাক্টরি ওভারসিয়ার আইবুড়ো চ্যাট্যার্জী কিংবা মিত্তির বাড়ির পারিবারিক চড়ুইভাতিতে যেতে হয়। যেখানে সে মধ্যবয়স্ক নারী-পুরুষের কামার্ত বাসনার ছবি স্বচক্ষে অনুধাবন করে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে জিনার সঙ্গে সুখেনের সম্পর্কের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। জিনার প্রসঙ্গটি ঘিরে উপন্যাসের যত বিতর্ক। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু সুখেন ও জিনার চরিত্র দু'টিকে কল্পনার রঙে রঙিন করেননি। তিনি বাস্তবতার চিত্রই তুলে ধরেছেন — যে চিত্র বর্তমান সমাজ-বাস্তবতায় ভীষণভাবে সত্যি।

সুখেন পারিবারিক সুখ-স্নেহ থেকে বঞ্চিত। সে না পেয়েছে বাবা-মায়ের আদর-যত্ন আর না পেয়েছে বড় দুই দাদার স্নেহের পরশ। তাই সে পিতা-মাতা এবং ভাইদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। নিজ জীবনকে নিয়ে সে সন্দিহান। সে দিশেহারা। তার জীবনে কী করণীয় — তা সে জানেনা। উদভ্রান্ত ও বিভ্রান্তের মতো সুখেন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তার নিজের মায়ের চরিত্র নিয়ে সে সন্দিহান :

"মাকে আমার এমনিতে খারাপ লাগতো না, একমাত্র বাবার বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ভাবভঙ্গি ছাড়া। মা যে দেখতে বেশ, আর বাবার বন্ধুরা যে বাবার কেলে হুমদো মুখখানি দেখতে আসতো না, মায়ের কাছে মদ্দা পায়রাগুলোর মত পেখম চড়িয়ে ঘুরঘুর করতো, তা আমি ছেলেবেলাতেই বুঝতে পারতাম। লোকগুলোর চোখের দিকে তাকালে স্রেফ শুয়োরের বাচ্চা বলে মনে হত। মায়ের আদুরি আদুরি ঢঙঢাঙ দেখেও এমন রাগ হত, মাকে একেবারে কামড়ে খমচে ছরকুটে দিই, মাইরি ! আর রাগ হত, যখন দেখতাম, বাবা

মা রোজ একটা আলাদা ঘরে শুতে যেত। ছ'বছর বয়স থেকেই তো আমাকে দাদাদের সঙ্গে আলাদা ঘরে শুতে যেত হত। বাবার মত লোককেই স্ত্রৈণ বলে কি না জানি না, তবে সেই যে একটা কথা আছে না, মাগের আঁচল ধরে থাকা, বাবার ঠিক তাই ছিল। বাবাকে মনে হত, মা-খোর। তার ওপরে, ভদ্রলোকের মেজাজটা এমন রাগী ছিল, বড় চাকরির অহঙ্কার ছিল, যেন আমরাও কেরানী চাকর বেয়ারা। আদর-টাদর করতো, কিন্তু চোয়াড়ে ভাবভঙ্গি দেখলে কাছে যেতে ইচ্ছা করতো না। বড় চাকরি, প্রচুর ঘুষ, মেলাই তেল দেবার লোক, সব মিলিয়ে লোকটাকে সসাহদারুণ ক্রুয়েল মনে হত। যেন একটা বাঘের মত। মার কম খেয়েছি নাকি ! রেগে গেলে, এমন মারতো, মারাত্মক — ওই হাতের এক একখানি থাপ্পড় খেলে আর কাউকে দেখতে হত না। আর রেগে গেলে চোখগুলো এমন জ্বলজ্বল করতো, শরীর হিম হয়ে যেত। আর সেই লোককেই এখন দেখ গিয়ে-"।[২]

সমাজের নারী-পুরুষের মুখোশ পরিহিত চরিত্র দেখে দেখে সুখেন ক্লান্ত। জিনা, মিত্তির বাড়ির বধূ, বেলাদি কিংবা শিখা এরা কেউই বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত নয়। অথচ তারা সব করতে পারে নিজেদের কাজ হাসিল করার জন্য। শিখার বাবা ও দাদারা এবং সুখেনের দাদারা কেশব ও পূর্ণেন্দু চরিত্রগুলি সমাজের জন্য ক্যান্সারের মতো। সুখেনের বড়দা রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে চোরাই ব্যবসা করে এবং রাজনীতির নাম নিয়ে গরীব মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে। তার মেজদা গরীবদের নেতা। কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতির নোংরা খেলায় মেতে ওঠে সে। সুখেন মানুষের মুখোশ দেখতে পারে না। সে ভাবে তার বাবা-দাদারাও দাদাল হয়ে উঠেছে সমাজের বুকে। সে ঘৃণিত মানসিকতা নিয়ে তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চায় :

তা যা খুশি তাই করুক গে, আমার দেখবার দরকার নেই, তবে ওই গরীব কথাটা ওদের মুখে শুনলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। গরীব তো শিখার দাদার মত লোকেরা, যারা আসলে বুলি আর তেল দেওয়া, নচ্ছারিপনা ভাল জানে, জানি গরীবের থেকে ওরা সেটাই বেশী পারে, আর এদের দিয়েই বড়দা মেজদার দল চলছে, আর আসলি আদমিরা সব জাহান্নামে চলে গেছে। তা হলে বাবাও তো একরকমের নেতাই ছিল, একজন — কী বলে এদের খবরের কাগজে — আমলা, হ্যাঁ আমলা, মস্ত বড় সরকারী আমলারা যেমন ঘুঘুদের দিয়ে কাজ চালায় সেইরকম। একবার জেঁকে বসতে পারলেই হল একটা উঁচু জায়গায়, তখন তাকে সরাও দেখি, সে তখন নেতা, বাবার মতন একটা বড় আমলা। সবাই তখন তাদের মানে, ভয় পায়, কারণ তখন তারা বেশ জমিয়ে বসেছে, যেমন কেশব আর পূর্ণেন্দু। তা যা খুশি করুক গে, আমি দেখতে চাই না, তবে আমার পিছনে লাগতে এলে, আমি ছাড়ব না। তোমরা সব ভাল, আর আমি খারাপ, সসাহখচ্চর। তাই দেখেছি, দু'দলই এখন আমার পিছনে লাগছে, যেন ওরা হল, কী বলে, সুপ্রীম — সুপ্রীম, ওদের কবজায় থাকতে হবে, যা-ই করি না কেন।"[৩]

শিখার বাবাও ঠকবাজ চরিত্রের। সে ছেলে-মেয়েদেরকে ব্যবহার করে নিজ সম্পত্তি

হাসিল করেছে। শিখার বড়বোন বেলার কাছে ডাক্তার, ব্যবসাদার, ইস্তক ভুঁড়োদাস প্রিয়চরণ মোক্তারের মতো মানুষজনের যাতায়াত। বিবাহিত পুরুষের অবৈধ সম্পর্কের কারণে সমাজ কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক সমরেশ বসু। সুখেন মুর্খ নয়। কলেজে পড়া যুবক সে। কলেজে পড়াকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, এমনকি অনশনও করেছে। অনশনের সময় শিখার সঙ্গে তার পরিচয়। সে শিখাকে ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু শিখার পরিবার শিখাকে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে চায়। ফলে সুখেন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে :

তার মনে পড়ে যায় শিখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা। সে শিখাকে ভালবাসে। কিন্তু শিখার বাবা ও বড় ভাই শিখাকে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে চায়। এতে সুখেন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। অতৃপ্তি ও অসাফল্যে সে উত্তেজিত হয়, বেদনাবোধ করে। কারণ প্রেমের ব্যাপারে সে অসহায়। যখনই ভালবাসার কথা মনে আসে তখনই শিখার কথা তার মনে হয়। আর কাউকে সে চায় না। অথচ শিখাকেও সে পায় না। এই বেদনাবোধ, এই হতাশার জন্যই সমস্ত বিষয়ে তার রাগ ফেটে পড়ে।"[৪]

শিখার হৃদয়ের সঙ্গে সুখেন নিজের হৃদয়ের সাদৃশ্য অনুভব করে। সুখেন শিখাকে নিয়ে মনে মনে স্বপ্ন বুনতে শুরু করে। ভালোবাসাহীন জীবনে সুখেন শিখার হৃদয়ের মাঝে প্রশান্তির সন্ধান করে। শিখাকে বুঝতে চেষ্টা করে সে। সুখেনের জীবনে শিখাই যেন একমাত্র নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল। সুখেন ভাবে :

আসলে এরকম অবস্থায়, শিখার যেরকম হওয়া উচিত ছিল রপুটে মেয়ে — শহরে আরো যে রকম আছে, সে তুলনায় শিখা কেমন যেন অদ্ভুত সহজ। এমন সহজ যে, ওর যেন তা হওয়াই চলে না। গলার স্বর বদলে, ভুরু তুলে, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, পাছা নাচিয়ে নাচিয়ে চলা এক ধরনের ছুঁড়ি আছে না, রাস্তায় কলেজে সবখানে যাদের দেখতে পাওয়া যায়, বুলির ধরন-ধারণ সবই একটু অন্য রকম, সেরকম একেবারেই না। কে জানে, সেসব আবার ছেলেমানুষি কি না, নাকি সেটাই ছেনালি, জানি না। কিন্তু ওসব মেকীপনার থেকে ওর সোজাসুজি ভাবের টানটা যেন বেশী। আরো কী মনে হয়, ও যেন একটা পাখী, ওর নিজের মনেই আছে। লাফাচ্ছে, পাখা ঝাপটা দিচ্ছে, উড়ছে, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, মরদা এসে ঠুকছে, ঘাড়ে উঠছে, আবার ভয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কোন বাচ্চা ছেলের গুলতির গুলিটা যেন ঠাস করে গায়ের কাছে পড়তেই সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে, আর যে-ই না বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তখন কেমন একটা মন-মরা, যেন সেটাও এক ধরনের ভয় পাওয়া, কী যেন বিপদ চারদিকে উরে সসাহ লে লে সুখেন, অনেক ভেবেছিস। যা বোঝা যায় না, তা নিয়ে এত ভাবার কোন মানে হয় না। মোটের ওপর, যা-ই থাক, ওর মধ্যে কী রকম একটা মায়া মমতার ভাব আছে। মায়া মমতা, সেটা যে ঠিক কী রকম, তাও ঠিক বলতে পারি না, ওই কথাটাই মনে এল, এর মায়া মমতা থাকলেই, কেমন যেন মনে হয় না, তার একটা কি দুঃখও বুঝি আছে।"[৫]

সমরেশ বসু সৃষ্ট সুখেনের মতো চরিত্র বর্তমান সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বহুল পরিচিত এক চরিত্র। সাধারণ মানুষ ভয়ের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চায় না। কেননা সুখেন গুণ্ডারা যে কোন সময়ে যে কোন কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে। কেউ কিন্তু সুখেনদের সৃষ্টির উৎস খুঁজতে চায় না। সমরেশ বসু সুখেন গুণ্ডার সেই উৎসের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন 'প্রজাপতি' উপন্যাসে। সুখেনদের মনের মধ্যেও যে ব্যর্থতার গ্লানি, ব্যথা বেদনা লুকিয়ে থাকতে পারে সে বিষয়ে কেউ ভাবে না। সুখেনদের মতো রকবাজ বখাটে ছেলেদের জীবন নিয়ে কারুর কোন মাথা ব্যথা নেই। সবাই সুখেনের মতো ছেলেদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে চায়। অথচ এই সুখেনরা রাজনীতির চক্রব্যুহে নিজেদের জীবনকে আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে ফেলে। যখনই অনুধাবন করে তখন তাদের আর ফেরার পথ থাকে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের সুখেন অনুধাবন করে তার কী করা উচিত এবং কী কী করা অনুচিত :

"এ কথটাও এক ধরনের ইয়ারকির মত লাগছে, কিন্তু এ কথা আমার তখন মনে হয়েছিল। তখন যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করতো, বা এখনো করে, তাহলেও আমি এই কথাই বলব, আমার একদম আসবার ইচ্ছা ছিল না। এই যে আমি সুখেন-সুখেন্দু, - বাবা, কি বিচ্ছিরি নাম, যেন শুনলেই গা গুলিয়ে ওঠে, আমি কিনা সুখেন্দু, আমি কী জন্যে পৃথিবীতে এসেছি, আমার কী-ই বা করবার আছে, আমি বুঝতে পারছি না নিজেকে নিয়ে কী করব। বাবা হবার ইচ্ছা নেই, কেশব বা পূর্ণেন্দু হতে চাই না, আর ওই যে সব কী বলে, ব ওর বড় মানুষদের — ওই আর কি, জ্ঞানী গুণী মনীষী, তা হবার কথা বিশ্বাস করতে পারতাম না, ওটা অনেকটা যেন 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'-এর মতন, পড়াই সার, কাজে না, - 'হ্যাঁ রে সুখেন, তুই বড় হয়ে কী হবি ?' 'স্যার, বিদ্যাসাগরের মতন হব।' 'ভাল, কু-ব ভাল।' ছেলেবেলায় ইস্কুলে এরকম সব কথার খেলা হত — এখন মনে হলে যেমন মনে হয়, সসাহ যেমন স্যার তেমনি ছাত্তর। আর সে সময়টা, অনশনের পরের সেই দিনগুলোতে, তখন আমি সুখেন গুণ্ডা হইনি, তখন যা ছিলাম, সেটাও আমার ইচ্ছা ছিল না, তার চেয়ে মজার কথা, এখন যা হয়েছি, তাও আমি ইচ্ছে করে হইনি, কী রকম বলতে বলতে হতে হতে হয়ে গেলাম। কলেজে দলাদলি করতে গিয়ে, সাতটা মাথা ফাটাবার পরেই সবাই বলতে আরম্ভ করেছিল, গুণ্ডা গুণ্ডা, যে কারণে শহরের মাস্তানরাও আমাকে খাতির-টাতির দেখাচ্ছিল, তারপর একদিন দেখলাম, আমি গুণ্ডাই হয়েছি। কিন্তু আমি ইচ্ছা করে হতে চাইনি, আমি যে কী হতে চেয়েছিলাম, তা জানতাম না, আর অনশনের পরে, সেই দিনগুলিতে, ক'দিন আর, মাস দুয়েকের মত হবে, আমার সেই সব কথা মনে হয়েছিল, 'কী হবে আমার, আমাকে নিয়ে কী করব', আর এরকম মনে হতেই, হঠাৎই মনে হয়েছিল, 'আমি কেন এই পৃথিবীতে ! আমি ইচ্ছা করে আসিনি।"[৬]

সমাজের যত ধরণের খারাপ কাজ থাকতে পারে প্রায় সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত সুখেন।

কিন্তু উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনার শেষান্তে সুখেন বাঁচতে চেয়েছে। একজন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ হিসাবে সে বাঁচতে চায়। উপন্যাসের সূচনাতে প্রজাপতির ডানা ছেঁড়ার সঙ্গে উপন্যাসের শেষে বোমার আঘাতে সুখেনের একটি হাত উড়ে যাওয়ার দৃশ্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ডানা ছেঁড়া প্রজাপতি যেমন বাঁচতে চেয়েছিল তেমনি সুখেনও বাঁচার তীব্র প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। উপন্যাসের শেষে মৃত্যু পথযাত্রী সুখেনের আকুল আর্তি পাঠক মন বেদনাশ্রুতে ভরে ওঠে :

"আমি ঠিক আমার মতই, বাঁচব, খাবার খুঁজে খাব — মানে, প্রজাপতির যেমন দু'বার জন্ম হয়, আমারও সেইরকমই হবে — আমি — অন্য মানুষ হব — এই ছেলেটা আর না, শিখা যেমন চেয়েছিল, সেইরকম।"[৭]

জীবনের কাছে এটাই তার সবচেয়ে বড় চাওয়া। সুখেন শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে অন্ধকারের জগৎ থেকে আলোর পথে ফেরা তার জন্য প্রায় অসম্ভব। তাই সে শিখাকে আশ্রয় করে পরিশ্রমী সাংসারিক পুরুষ হতে চেয়েছে। কিন্তু রাজনীতির ঘুর্নিপাক তাকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলেছে। সুখেনদের এর থেকে পালিয়ে যাবার রাস্তা নেই। হয় অন্ধকার জগতের মধ্যে বাঘের মতো বেঁচে থাক নতুবা মৃত্যুকে বরণ করতে হয়। 'প্রজাপতি' উপন্যাস সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

বাবার দুর্নীতি, দাদাদের দলীয় রাজনীতি, রাজনীতিকে ব্যাক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করা — সব কিছু সুখেনের মনকে তিক্ত করে তোলে। সে বেখাপ্পা হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে অবাধ্য। জীবন সম্পর্কে বিতস্পৃহ। এই উপন্যাস তার জীবনের শেষ চব্বিশ ঘণ্টার কাহিনী। এখন তার চলন-বলন কথাবার্তা পোশাক-আশাক সব কিছুতেই সে পুরোদস্তুর এক মস্তান। সবকিছু মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এ এক সামগ্রিক চিত্র। একটির থেকে আর একটিকে আলাদা করা যায় না। কোনও সুস্থ স্বভাবিক মানুষ এধরনের চরিত্রদ্বারা প্রভাবিত হন না। বরঞ্চ এরকম জীবনযাত্রার প্রতি মানুষের একটা বিতৃষ্ণাই জাগে। সুখেনের জীবনে শান্তি নেই। এত অবিশ্বাস এত ঘৃণা এত রাগ সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সুখেনকে এক অজানা ভয় যেন পেয়ে বসে। এ আর কিছুই নয়। তার মনের ভিতরে যে একটি সাধারণ সৎ ব্যক্তি আছে এটা তারি প্রমাণ।

এই অন্ধকারের জীবন কেউ চায় না। সাধারণ মানুষ এই অসুখী, অতৃপ্ত জীবন দ্বারা কিছুতেই প্রভাবিত হবেন না। একটি কথা উল্লেখ করলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বা কোনও যুব সভা অথবা আলোচনা চক্রে যখনই আমি প্রশ্ন করেছি — আপনারা কেউ কি সুখেন হতে চান? কেউ রাজি হননি। সুতরাং আমি বলছি প্রজাপতি উপন্যাস অশ্লীল নয়। এই উপন্যাসে কোনও স্বাভাবিক মানুষের ক্ষতি করবে না। বরঞ্চ যাদের বিপথে যাবার সম্ভাবনা আছে তারা সাবধান হবে।

প্রজাপতি সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধকে আঘাত করে না। বিপরীতে মানুষকে সচেতন করে তোলে। চারদিকে যে সমাজ রয়েছে তাকে বুঝতে তাকে সাহায্য করে।"[৭]

রাজনৈতিক নেতা ও বুর্জোয়া শ্রেণির নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুখেনদেরকে সমাজের বুকে লালন পালন আদর যত্ন করে। সুখেনরা তাদের দালালি করতে সহায়তা করে। এই দালালদের দালালি করতে করতে আপন সত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়ে গুণ্ডামির সত্ত্বাকে ধারণ করে সাময়িক সুখের জন্য। কিন্তু যখন কোন একজন সুখেন উপলব্ধি করে জীবনের প্রকৃত অর্থ কী — তখন তার আর ফেরার কোন জায়গা থাকে না। অবক্ষয়িত নষ্ট সমাজের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে তারা শেষ হয়ে যায়। সর্বোপরি এই উপন্যাসে ভাষা ব্যবহার উপন্যাসকে অন্যমাত্রা দান করেছে। সুখেনের মুখের ভাষা কোন ভদ্রশ্রেণির ভাষা নয়। রকবাজ চরিত্রের ভাষা ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক সুখেন চরিত্রকে প্রাণবন্ত-জীবন্ত এবং বাস্তব করে তুলেছেন। বর্তমান সময়ের প্রাসঙ্গিকতায় অবক্ষয়িত যুব সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র 'প্রজাপতি' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন সমরেশ বসু — যা তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে আগামী ভবিষ্যতেও।

**তথ্যসূত্র :**

১। সমরেশ বসু। 'প্রজাপতি'। আমার কথা। একাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪। আনন্দ, কলকাতা।
২। সমরেশ বসু। 'প্রজাপতি,। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮। একাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪। আনন্দ, কলকাতা।
৩। সমরেশ বসু। 'প্রজাপতি'। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৬। একাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪। আনন্দ, কলকাতা।
৪। সমরেশ বসু। 'প্রজাপতি'। সমরেশ বসুর বিবৃতি। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৩-১৬৪। একাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪। আনন্দ, কলকাতা।
৫। সমরেশ বসু। 'প্রজাপতি'। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫। একাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪। আনন্দ, কলকাতা।
৬। সমরেশ বসু। 'প্রজাপতি'। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৯-৮০। একাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪। আনন্দ, কলকাতা।
৭। সমরেশ বসু। 'প্রজাপতি'। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩৭। একাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪। আনন্দ, কলকাতা।
৮। সমরেশ বসু। 'প্রজাপতি'। সমরেশ বসুর বিবৃতি। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৪। একাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪। আনন্দ, কলকাতা।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :**

১। সমরেশ বসু। 'প্রজাপতি'। একাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৪। আনন্দ, কলকাতা।
২। শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে'। দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

# অমৃত কুম্ভের খোঁজে 'কালকূট'—সমরেশ বসু

অর্পণ দাস

**প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্তসার :**

বাংলা সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে সমরেশ বসুর উপস্থিতি অনিবার্যভাবে ঐতিহাসিক। বিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলিতে সোচ্চার ছিল তাঁর কলম। দাঙ্গা, দেশভাগ, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন, নকশালপন্থী রাজনীতির কর্মকাণ্ড—প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বকীয় চেতনা নিয়ে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি বাটালের হৃদয়ে। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে এসেছে একের পর এক সংকট। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে ঘরে এসে বাসা বেঁধেছে সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে সামাজিক চর্চা। রয়েছে অসংখ্য বিতর্ক। যা যে কোনো মানুষের জীবনকে হলাহলের সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিতে পারে। সেই মন্থন থেকেই উত্থান ঘটেছিল সমরেশ বসুর সাহিত্যজীবনের আরেক সত্তা 'কালকূট'। যিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সংস্পর্শে অমৃতের সন্ধান করেন। যার প্রথম উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত রয়েছে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। প্রয়াগের কুম্ভমেলার ভিড়ে কালকূট ধর্মীয় অনুষঙ্গের বদলে খুঁজে বেড়ান মানবপ্রেমের উষ্ণতা। 'ট্রাভেলগ' ও উপন্যাসের মিশ্র ভঙ্গিতে সমগ্র ভারতবর্ষকে এক নজরে দেখার চেষ্টা। ব্যক্তিজীবনের বিষ থেকে মুক্তি পেতে কালকূটের অমৃতের সন্ধান নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তীতেও একাধিক লেখায় তাঁর এই সন্ধান অব্যাহত থেকেছে। সমরেশ বসুর লেখনী বা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যার বিস্তর তফাৎ। এই প্রবন্ধে মূলত কালকূটের 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' রচনার মাধ্যমে তাঁর একাধিক সত্তার মুক্তিপথের দিকে যাত্রার অনুসন্ধান করা হয়েছে।

**মূল সূচক শব্দ :**

সমরেশ বসু, কালকূট, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে, উপন্যাস, ভারতবর্ষ

সমুদ্রমন্থনের শেষ পর্বে উঠে এসেছিল তীব্র বিষ। যার নাম 'কালকূট'। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল মৃত্যুর মুখে পড়েছিল এই বিষের জ্বালা-যন্ত্রণায়। হিন্দু পুরাণ কাহিনির বিষ যেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে পৃথিবীর বুকে। আধুনিক সময়ে কোনো 'নীলকণ্ঠ' মহাদেব আসেন না ধরিত্রীকে রক্ষা করতে। রক্তের মধ্যে অবিরত একটা দহন নিয়ে পথচলা। শুধুই দেখতে থাকা 'অমৃতস্য পুত্রা' মানুষ ও তার অন্তহীন যাত্রা। তাই কি সমরেশ বসু নিজের ছদ্মনাম রেখেছিলেন 'কালকূট'? নিজের জীবনে বারবার অশান্তির বিষ ঢুকেছিল বলেই কি মানুষের টানে পাড়ি জমাতেন 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'?

"কিন্তু এমন নামটি কেন? তাহলে যে প্রাণটি খুলে দেখাতে হয়। দেখলেই বোঝা যাবে, বুক ভরে আছে গরলে, আপনাকে খুঁজে ফেরা, আসলে তো হা-অমৃত, হা-অমৃত!... কালকূট ছাড়া আমার আর কী নাম হতে পারে?"[১]

এ তাঁর নিজের কথা। এই 'আপনাকে খুঁজে ফেরা' তো নেহাত পেশার তাগিদে নয়। বরং সেই ছোটোবেলা থেকেই শুরু হয়েছিল পথচলা। সে-অর্থে ডানপিটে হয়তো ছিলেন না; বরং উদাসী হাওয়ার পথে পথে চিনে নিতে শেখা ভবিষ্যতের সত্তাকে। তাই হয়তো কৈশোরের প্রাক্‌লগ্নে দিনের পর দিন কাটত পূর্ববঙ্গের কোনো এক শ্মশানের নিস্তব্ধতায়; যেন স্বয়ম্ভূ মহাদেব। সমাজ-রাজনীতির অন্তঃস্থ গহ্বরে থাকা বিষ থেকে পালিয়ে বাঁচার প্রাক্‌প্রস্তুতি চলছে তখন থেকেই। নতুবা স্থানীয় বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল পালিয়ে চলত দূর-দূরান্তে বেরিয়ে পড়া। সব মিলিয়ে প্রথামুক্ত, গণ্ডিহীন এক মানুষ। যিনি এর পরেও বহুদূরে পাড়ি দেবেন মানুষের অন্তরাত্মার খোঁজে। কিন্তু আপাতত এই বোহেমিয়ানার জন্য স্কুলের পড়াশোনা বেশি দূর এগোনোর পথ খুঁজে পেল না।

পারিবারিক সূত্রে আঁকা-গান গাওয়ার প্রতি একটা ঝোঁক ছিল ছোটো থেকেই। নিজে বলছেন 'কাব্যিক টান'। আর সেই টানের কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের প্রায় অনুকরণে একটি গল্পও লিখে ফেলেন। কিন্তু ত্যাগ করতে হল বুড়িগঙ্গার মায়া। এবারে ঠাঁই মিলল ভাগীরথীর পাশে নৈহাটিতে। দাদা মহেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে শুরু হল নতুন জীবন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন সমরেশ বসুকে ফের পড়াশোনার জগতে নিয়ে আসার। কিন্তু এরকম উদ্দাম কিশোরের খামখেয়ালিপনার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মুশকিল। প্রায়ই উধাও হয়ে যেতেন বাড়ি থেকে। গান গেয়ে বেড়াতেন বিভিন্ন জায়গায়। ফলে আবার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন, সেখানেও একই আচরণের পুনরাবৃত্তি। অবশেষে ১৬ বছর বয়সে প্রায় পাকাপাকিভাবে শুরু হল এপার গঙ্গার জীবন।

এখানে থিতু না হলে হয়তো ভবিষ্যতের 'কালকূট'-কে কোনোভাবেই পাওয়া যেত না। স্কুলের শিক্ষার বদলে গঙ্গাপাড়ের চটকলের বস্তি অধ্যুষিত জীবনযাত্রার মধ্যে পেলেন আরো মহৎ এক শিক্ষা। খুব কাছ থেকে দেখলেন মানুষের রোজকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তখনও সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্ট ভাবধারার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হননি। কিন্তু যারা প্রতিদিন মার খেতে খেতে সমাজের চোখে অপাংক্তেয় হয়ে যায়, তাদের ভিতরের বেঁচে থাকার আনন্দটুকুই ধারণ করলেন তিনি। শত যন্ত্রণার মধ্যে লড়াইয়ের এই প্রেরণাটুকু হয়ে রইল জীবনের একমাত্র রসদ।

১৯৪২ সালে বয়োজ্যেষ্ঠ গৌরী দেবীর সঙ্গে প্রেম এবং সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে দুজনের বিবাহ। প্রকৃত অর্থে বিষগ্রহণের পালা শুরু এই সময় থেকেই। একদিকে নববধূকে নিয়ে বস্তির পরিবেশে দারিদ্র্যময় জীবন, আবার সেই সময়েই সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সূত্র ধরে বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান। তখন তিনি 'বাণী' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন। সেই পত্রিকাতে শুরু হল গল্প লেখার পালা। অনুকরণ-অনুসরণ থেকে ক্রমশ নিজের ভাষা খুঁজে পেলেন সমরেশ বসু। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হল

তাঁর বিখ্যাত গল্প 'আদাব'। যেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের আচ্ছাদিত কুয়াশার মধ্যে ধর্মপরিচয়ে 'হিন্দু' সুতা-মজুর শেষরাত্রির বিপদে আপন ঈশ্বরের কাছে এক 'মুসলমান' মাঝির জন্য প্রার্থনা জানায়।

দাঙ্গা শেষ হল, তারপরই দেশভাগের সঙ্গে এল স্বাধীনতা। রাজনৈতিক কর্মী ও সাহিত্যিক উভয়ক্ষেত্রেই তখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সমরেশ বসুর সামনে। কিন্তু সেই খ্যাতির সম্ভাবনার মুখেই নিষিদ্ধ হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। জেলবন্দি হলেন তিনি, বহিষ্কার করা হল চাকরি থেকে। কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল, পার্টির সদস্যপদও কেড়ে নেওয়া হতে পারে তাঁর থেকে। জেলের বাইরে চার সন্তান নিয়ে গৌরী দেবীর তখন চূড়ান্ত দুরবস্থা। সমাজ, রাজনীতি, পরিচিত মানুষ অনেকের প্রতিই জন্মাতে লাগল তীব্র ক্ষোভ। জেলে বসেই তিনি রচনা করলেন 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস ও 'লেবার অফিসার' নাটক।

১৯৫১ সালে ছাড়া পেলেন ঠিকই, তবে জীবন আরো অনিশ্চিত। চাকরি নেই, পার্টি দূরত্ব বজায় রাখছে। এখন বাঁচবেন কীভাবে? সেদিন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন চটকলের শ্রমিকরাই। নারায়ণ মিস্ত্রি নামের একজন রোজ দুধ-মুড়ির জোগান দিতেন। হরিসূদন প্রসাদ দিয়ে গেলেন একটি পুরনো সেলাই মেশিন। আপাতত বাঁচার উপায় হল তাঁদের। বিষ গলাধঃকরণ করতে করতেও মানুষের ভালোবাসার অমৃত তাঁকে জীবনের প্রতি আশা দিয়ে গেল আরেকবার। পরের বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস 'বি টি রোডের ধারে'।

সদ্য তখন ভোটপর্ব সমাপ্ত হয়েছে। রাজনৈতিক হিংসার শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে। সেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন ছিল ছদ্মনামের। 'কালকূট' আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয় 'ভোটদর্পণ' নামের একটি লেখা। এই রচনা সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,

"এক প্রাক্‌নির্বাচনী সংকীর্ণ বিপন্নতার মাঝে মানুষের যে মূর্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা মানুষের অমৃতময় মূর্তি নয়। তাঁর লজ্জা সমস্ত মানুষের হয়েই। তাই বিনয়ের সঙ্গে তিনি স্বনাম নির্বাচন করেছেন কালকূট। বিষামৃতমধুর তিক্তের সন্ধানে তাঁর যাত্রা। যে বিষ বদলে গিয়ে হবে সুধা, সেই বিষকেই নামবাচক বিশেষ্যে রূপান্তরিত করেছেন এই লেখক।"[২]

অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতির তিক্ততা থেকে জন্ম নিয়েছে এই লেখা; একই সঙ্গে তাঁর ছদ্মনাম। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের উত্তাল আবহ থেকে উঠে আসা বিষকেই ধারণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে শুধুই হিংসা, দলাদলি, ভাইয়ে-ভাইয়ে সংঘর্ষ। মুক্তির পথ কোথায়? সমরেশ বসু নিজেও বিভ্রান্ত! রাজনৈতিক সংকীর্ণতা থেকে দেখেছেন বিষের উদ্‌গীরণ। তাই নিজের নাম রেখেছেন 'কালকূট'। অথচ কিছু বছর পরেই ক্লেদাক্ত বিশৃঙ্খলার বদলে নিজেকে তুলে নিয়ে যাবেন বন্ধন মুক্তির উচ্চতায়। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ

করে মানবপ্রেমের সুশীতল শামিয়ানার মধ্যে আশ্রয় খুঁজবেন। 'বিষ'-এর বর্ণনার বদলে তাঁর কলমে আসবে অমৃতের সন্ধান। তখনই তাঁর 'কালকূট' নাম সার্থক হবে।

সেই সুযোগ এল ১৯৫৩-৫৪ সালে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে সাগরময় ঘোষ প্রস্তাব দিলেন এলাহাবাদে গিয়ে কুম্ভমেলার বিবরণী পাঠাতে হবে। কিন্তু স্বনামে নয়, অমৃতের সন্ধানেই যখন চলেছেন, তখন তার ছদ্মনাম তো আগেই নির্বাচিত করে রেখেছেন তিনি। 'কালকূট' নামে লেখার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলেন, "যদি আমার বিষবাহী প্রাণের অমৃত সন্ধানের কথা দেশ পত্রিকাতে একটু বিস্তৃত করে লেখবার অনুমতি দেন।"[৩] পেলেন অনুমতি। ঘটনার বিবরণী নয়, আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে 'ট্রাভেলগ' জাতীয় ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হতে লাগল 'দেশ'-এ। তিনি তখন আর জীবনসমস্যায় জর্জরিত, বাস্তববাদী সমরেশ বসু নন। বরং এক অতীন্দ্রীয় অভিযাত্রী। যিনি বৈশ্বিক মাদকতার অন্তরে প্রবেশ করে তুলে আনতে চাইছেন অমৃতভাণ্ড। তরঙ্গ থেকে তরঙ্গে যাত্রা করে পৌঁছে যাচ্ছেন দার্শনিক সহাবস্থানের চূড়ান্ত নিদর্শনে। তিনি লিখছেন, "শুরু হল যাত্রা, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। কালকূট তাঁর নামের সংজ্ঞার্থ খুঁজে পাচ্ছে।"[৪]

মানুষ আর মানুষ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার-হাজার লোক জড়ো হয়েছে এখানে। বহুধা বিচিত্র সম্পদের মধ্যে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রকৃত মহিমা। দৈনন্দিন সংসারের অসংখ্য জটিলতা অতিক্রম করে তীর্থের আশ্রয়ে মানুষ নিজেকে মেলে দিতে এসেছে। কেন এই উন্মাদনা? শুধুই কি ধর্মান্ধতার উদযাপন? অনেক বন্ধু কালকূটকেও ব্যঙ্গ করেন 'ধর্ম করতে যাচ্ছে' বলে। কাকে বলে ধর্ম? বাহ্যিক জীবনযাপনের মধ্যে থাকা ধর্মের সংজ্ঞায় তিনি বিশ্বাসী নন। আবার চিরাচরিত বিশ্বাসে যাকে 'বিধর্মী' বলে, নিজেকে সেই দলেও ফেলতে চান না। তাই কালকূটের উত্তর, "লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি ধর্মান্ধ হয়, তবে খুঁজেই দেখি না কেন, লক্ষ মনের কোন চোখে পরানো আছে সেই ঠুলি?"[৫] সেই বিচিত্র মানুষ দেখে জীবনের সাধ মিটিয়ে নেন তিনি।

ছোটোবেলা থেকে যেন এই মহামিলনের অপেক্ষাতেই ছিলেন। পুরনো ঢাকায় সহপাঠী মনসুরের টিনের বাড়ির চাল থেকে কুল আর আতা পেড়ে খেতেন। জোবেদা মাসির কাছে নিজের সন্তানের থেকে আলাদা ছিলেন না সমরেশ। আবার বয়সে বড়ো বন্ধু ইসমাইলের সঙ্গে চলে যেতেন দূরান্তের সন্ধানে। সেই সমরেশ বসুই জগদ্দল-নৈহাটির শ্রমিকদের সান্নিধ্যে দেখতে পেলেন মানবসত্তার পরিপূর্ণ অবয়ব। যন্ত্রণা পেয়েছেন, প্রিয় মানুষ কিংবা দলের থেকে দূরত্ব বেড়েছে অকারণেই। জীবন থেকে পাওয়া ছোটো ছোটো অভিজ্ঞতাগুলিকে পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্যই তাঁর প্রয়াগযাত্রা। কিন্তু পূর্বেই সচেতন ছিলেন, সাধারণ পাঠক তো বটেই, ঘনিষ্ঠমহলও সমরেশের এই জার্নিকে হয়তো সহজভাবে নেবে না। 'ধর্ম করতে' যাওয়ার ব্যঙ্গ সে-কথাই প্রমাণ করে। তাই কালকূটের চরিত্রকে নতুন করে গড়ে তোলেন

তিনি। সমরেশ বসু চূড়ান্ত পেশাদার, শহর-মফস্বলের চক্রাকার জীবনযাত্রার নিরাবরণ শিল্পী। ক্ষুদ্রাকার চেতনার সূক্ষ্ম মোচড় তাঁর নজর এড়িয়ে যায় না। সাহিত্যচর্চার সঙ্গে রুটি-রুজির প্রশ্ন জড়িয়ে থাকায় জনমনোরঞ্জনের প্রবণতাও দেখা যায়।

অথচ কালকূট যেন বিবাগী সন্ন্যাসী, জাগতিক পাকচক্র থেকে সামান্য দূরবর্তী। জীবনজিজ্ঞাসা আছে, তত্ত্বসন্ধানী দৃষ্টি আছে, তবুও শুধু যেন পর্যটক। লক্ষ মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়েও বৈরাগ্যচেতনায় আলাদা করে নেওয়া যায় তাঁকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিখুঁত বিচার-বিশ্লেষণে তিনি প্রবেশ করেন না। দর্শকের মতো বৃহত্তর ভারতবর্ষের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের জীবন্ত রূপ তুলে ধরেন অপরূপ নিরাসক্তিতে। ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন ঠিকই, তবে স্থির থাকেন না। সঙ্গে করে এগিয়ে নিয়ে চলেন কাহিনির চরিত্রদের। মনে পড়তে পারে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' শ্যামার ধারাবাহিক পরিবর্তনের বিন্যাসক্রম। কিংবা যেভাবে লক্ষ্মীদাসীর জীবনের শক্তি আর কালকূটের প্রবাহমানতার মধ্যে ধীরে ধীরে মিশে যায় বলরাম। উদাহরণ হিসেবে এরকম আরো অসংখ্য চরিত্রের উপস্থাপনা করা যেতে পারে। ভূতানন্দ, সর্বনাশী, প্রহ্লাদ, খানপিসি প্রত্যেকেই আপন মহিমায় উজ্জ্বল। প্রেমের স্নিগ্ধ পরশের সঙ্গে কঠিন-কঠোর বাস্তবের অযাচিত মেলবন্ধন কাহিনির মধ্যে অদ্ভুত দ্যোতনা নিয়ে আসে। যা কিছুটা তিক, কিছুটা অতিনাটকীয়। সম্ভবত চলার পথের অভিজ্ঞতার অর্জনকে প্রচলিত কাহিনির বন্ধনে আবদ্ধ করতে গিয়ে এটুকু সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়ে যায়।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাস, নাকি ট্রাভেলগ? এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তবু মনে হয়, এই কাহিনিকে কোনো নির্দিষ্ট ছকে ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়। ভ্রমণকাহিনির মতো দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার মসৃণ গতি সব জায়গায় নজরে পড়বে না। আবার উপন্যাসের মতো ঠাসবুনোট প্লটের আবর্তনও এখানে নেই। ব্যক্তি আর নৈর্ব্যক্তিকের মধ্যে তুল্যমূল্য গতায়ত সুনিপুণ পদ্ধতিতে ঋদ্ধ করে কাহিনি বিন্যাসকে। কালকূটের নিজের ভাষায়,

"আমি কারোকে নিয়ে যেতে পারবো না পর্বতের সেই আশর্চ মহিমাময় লীলাখচিত প্রাঙ্গণে। পারবো না অজানা দেশের দেবদেউলের সন্ধান দিতে। আর ডাইরি বা গাইড, ভ্রমণ-বিলাসীদের হাতে তেমন মনমনোহর কিছু তুলে দিলেও পারবো না। কারণ, ভূগোল-ইতিহাস-পুরাতত্ত্বের জ্ঞান দেবার দম আমার নেই।"[৬]

নিজের সম্বন্ধে একটু বেশিই বিনয় প্রকাশ করেন তিনি। কারণ, পাঠক মাত্রেই জানেন, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'-র মধ্যে ভারতদর্শনের পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে অপরিগণিত মানুষের মিলনস্থলে স্থির-একক মূল্যবোধের সন্ধান। যে কাহিনির শুরুতে থাকে এক যক্ষ্মারোগীর মৃত্যু, তা শেষ হয়

জীবন-মৃত্যুর পুণ্যস্পর্শে অমরত্বের স্বীকৃতি দিয়ে। 'শেষ হয়' কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হল না, বলা যেতে পারে জগৎ সম্পর্কে এক দার্শনিক উপলব্ধি-চক্রের সূত্রপাত হওয়া।

এই প্রসঙ্গে ঝাঁকিদর্শন সেরে নেওয়া উচিত 'কোথায় পাবো তারে' (১৯৬৮) ও 'শাম্ব'-এর (১৯৭৭) পাতায়। প্রথমটির কাহিনি ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে। বক্রেশ্বর, কেঁদুলি, নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরে তিনি পৌঁছে যান শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় বাউলদের গানের আখড়ায়। যেখানে তিনি প্রশ্ন তুলছেন,

"এই সাধনের লক্ষ্য কী? কোন ঈশ্বরের আরাধনা?

সেই এক লক্ষ্য, অচঞ্চল মিথুনানন্দের মধ্যে 'মনের মানুষ'-এর অনুভব। 'সহজ মানুষ'কে অনুভূতিগম্য করে তোলা। ইনিই ঈশ্বর। বাউলের আর কোনো ঈশ্বর নেই। এই 'অনুভবই' ঈশ্বর। সে জন্যই গান, 'টলিলে জীব, অটল ঈশ্বর, এর মাঝে ক্রীড়া করে রসিক শেখর!'... ইনিই সেই ঈশ্বর। রূপের মধ্যে অরূপ। আকারের মধ্যে নিরাকার।"[৭]

কে বলবে একই সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি 'বিবর' বা 'প্রজাপতি'-র মতো উপন্যাস লিখছেন? এই জন্যই সমরেশ বসু ও কালকূট এক হয়েও আলাদা। আবার 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র প্রায় সমসাময়িকেই লিখছেন 'শাম্ব'। সাতের দশকের বিক্ষুব্ধ সময়ে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন সমরেশ বসুর মনে এসেছে, তারই উত্তর যেন 'শাম্ব'। দুই ক্ষেত্রেই কুষ্ঠ রোগ এসেছে প্রতীক হিসেবে। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-য় উদ্‌ভ্রান্ত সময়ের ক্ষতচিহ্ন হিসেবে আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব রোগমুক্তির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। লেখকসত্তার যে বিচ্ছিন্নতার কথা পূর্বে বলা হয়েছিল, তা যেন এখানে একাকার হয়ে যায়। বলা যেতে পারে, দুটি চরিত্র একে-অপরের অন্তঃস্থলকে নিংড়ে নিয়ে তৈরি করল অপূর্ব এক সৃষ্টি।

কালকূট চরিত্রের সাহায্যে সমরেশ বসু আরো অনেক লেখায় তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার নিদর্শন রেখেছেন। ভাষাভঙ্গিতে, প্রকৃতির রূপচিত্রণে, মানবচরিত্র বর্ণনায় প্রতিটি রচনা ভিন্ন, কিন্তু মর্মের বাণী এক রয়ে গেছে প্রথম থেকেই। তা হল, 'আমরা বেরিয়ে পড়েছি যে যার ছকে বাঁধা ভদ্রাসনটি ছেড়ে বিশাল ভারতবর্ষের বুকে'। যেমন, 'নির্জন সৈকত'-এ রয়েছে পুরীর সমদ্রের বিস্তারের সঙ্গে ঈশ্বরচেতনার গূঢ় আভাস। 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে'-এ উত্তরবঙ্গের নাগরিক মনোবৃত্তির সমান্তরালে চলতে থাকে কিশোরবেলার কাহিনি। 'বাণীবনে বেণুধ্বনি'-তে বাঁশির সুরে পাগল কালকূট ঘুরে বেড়ান জনকপুর, দ্বারভাঙ্গা হয়ে রাজগীর পর্যন্ত। এছাড়াও 'কোথায় সে জন আছে', 'পুণ্যভূমে পুণ্যস্নান', 'মুক্ত বেণীর উজানে', 'চলো মন রূপনগরে' ইত্যাদি রচনায় আছে তাঁর মানবসন্ধানের দীর্ঘ ইতিবৃত্ত।

এই তালিকা আরো বাড়িয়ে তোলা যায়। তাতে সারবস্তুর পরিবর্তন হয় না। বরং চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক 'কালকূট' হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত অপূর্ণতার দিকে। পূর্ববঙ্গের মাঠে-ঘাটে

শুনেছিলেন লালনের গান, 'বাড়ির কাছে আরশীনগর'। লালন যখন বলেন, 'আমার ঘরের কাছে আরশীনগরে এক পড়শী বসত করে', কিন্তু একদিনও দেখা হয় না তার সঙ্গে। তখন এই আফসোস যেন সমরেশ বসুরও। আরশীনগর তাঁর দেহ, পড়শী সাধক সত্তা। তিনিও চেয়েছিলেন মানুষের কথা বলতে, মানুষের সঙ্গে মিশতে। কিন্তু তিনি তো সাধক নন। বিষ গ্রহণের শক্তি তিনি পাননি। তাই মানুষের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন বারবার। কখনও রাজনীতিতে, কখনও ধর্মীয় স্থানে। খুঁজে ফেরেন অমৃত কুম্ভ।

**তথ্যসূত্র :**


১। কালকূট, গাহে অচিন পাখি, কালকূট রচনা সমগ্র, সম্পা: নিতাই বসু, প্রথম খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ: ৪০।

২। ভূমিকা, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ: খ।

৩। তদেব, পৃ: ৪৮।

৪। তদেব, পৃ: ৪৯।

৫। কালকূট, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কার্তিক ১৩৬১, পৃ: ৯।

৬। কালকূট, মনভাসির টানে, কালকূট রচনা সমগ্র, সম্পা: সাগরময় ঘোষ, ষষ্ঠ খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৩৫৩।

৭। কালকূট, কোথায় পাবো তারে, কালকূট রচনা সমগ্র, সম্পা: সাগরময় ঘোষ, তৃতীয় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৮৮।

## জাল, জলের জীবন ও মাঝিমাল্লা: সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস

বৈশালী মণ্ডল

'নোনা জলে ভাসাইলি রে তোর সোনার বজরাখানা/ এ তরী জীর্ণ হবে কে সামলাবে রে'—ফকিরদের এই গানের সুর বঙ্গদেশের গ্রাম বাংলায় প্রায় শোনা যায়। নদীর সঙ্গে এই বাংলার মানুষের বেঁচে থাকা মা এবং ছেলের মতো। আর নদীকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে একাধিক রচনা। নদীর গুরুত্ব যে এই বঙ্গভূমিতে কতটা তা আর ব্যাখ্যা করার অবকাশ রাখে না। এমনকি 'চর্যাপদ'-এও দেখা গেছে নদীর কথা- 'ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী'[১]। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও রয়েছে যমুনার তীরে রাধা এবং কৃষ্ণের প্রণয়ের কথা- 'সুণ সুণ রাধা চন্দ্রাবলী। এবেঁ মোর দৈব বড় বলী।।/ যে কারণে যমুনার জলে। সুদ্ধ কৈল তাক জাণহ সকলে।।'[২] কখনও নদী দুহাত ভরে মানুষকে দিয়েছে আবার কখনও নিঃস্ব করেছে। তবুও এই সভ্যতা ঋণী থেকেছে নদীরই কাছে। এছাড়াও পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখা 'তিতাস একটি নদীর নাম', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ইছামতী' ইত্যাদি বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন ভাবে মানুষের জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বয়ে গেছে এবং তাদের সঙ্গেই ওতোপ্রোতভাবে জুড়ে গেছে নদী।

নদীর প্রবাহের মতো প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের গতিপথ আলাদা, তাই সকলের লড়াইয়ের পদ্ধতিও ভিন্ন। মালো পাড়ার নিবারণ সাইদারের ছেলে বিলাসের সঙ্গে পার্থক্য আছে পাঁচুর, পরান, গণেশ, সয়ারামের কিন্তু জীবনের বৃত্ত তাদের যেমনই হোক কেন্দ্র তাদের প্রত্যেকের এক- 'জলের সঙ্গে লড়াই' কেননা তারা জাতিতে 'মাছমারা'। সমরেশ বসুর লেখা এই 'গঙ্গা' উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে ধীবর এবং মালোপাড়ার বিচিত্র কাহিনি, নদী থেকে সমুদ্রে যার বিস্তার—সেই আদিম শিকারী সমাজ যাদের জীবনের তিনভাগ কাটে জলে আর একভাগ কাটে স্থলে। অকূলে ভেসে বেড়িয়ে কূলের মানুষদের মুখে মাছভাত তুলে দেওয়াই তাদের জীবিকা। তাই বারবার কূল ভাঙ্গে, তারপরেও সামনের দিকে এগিয়ে চলে তাদের জীবন। একদিকে শমণ তাদের রূপালি চোখের স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন মীনদেবতা—'মা গঙ্গার কোলে এসেছি। যার পেছনে পেছনে এসেছি, সে শুধু জলের তলে নয়। সে আমার জীবনমরণ, সে মেঘে মেঘে বজ্রে বজ্রে, জলের ঢেউয়ে, দক্ষিণের বাতাসে।' অপরদিকে শমণ তাদের মহাজনেরা, আড়তদার, ফড়ে, পাইকেরা। নিষ্ঠুর নিয়তির সঙ্গে পুরুষানুক্রমিক দ্বন্দ্ব, খরা, ঝরা মরার লড়াই চলে তাদের। সময় এবং যুগকে ছাপিয়ে যাওয়া সমরেশ বসুর এই কালজয়ী উপন্যাস 'গঙ্গা' তুলে ধরছে এমন কিছু মানুষ এবং জীবনের কথা যারা সমাজের চোখে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও পরিত্যক্তও নয়। কেননা দেশের অন্যতম সম্পদ রুপোলি ফসল ইলিশ তারা তুলে আনে জল এবং প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে। গঙ্গার

উৎস কোথায় যেমন তারা জানেনা তেমনি জানেনা তাদের জীবনে সুখের ঠিকানা কোথায়। এটাই তাদের জাতিগত প্রথার মতোই চলে আসে। নদীর বাঁকের মতো সময়ের বাঁকও বদলায়। আর সেই বদলই হল বিলাস। মালো পাড়ার জীবনে মূর্তিমান বিপ্লবী সে। কৌতূহলী দৃষ্টি তার খোঁজে জীবনের মানে প্রকৃতির রহস্যময়তা। সেই কারণেই গঙ্গার শান্ত শীতলতা বিলাসকে শান্ত রাখতে পারে না। অশান্ত এবং উদ্দামতা বিলাসকে টেনে নিয়ে যেতে চায় সমুদ্রের বুকে। সমুদ্রের রহস্যময়তা এবং গভীরতার মধ্যে থেকে বিলাস খুঁজে পেতে চায় আদিম এবং আগামী পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য। এই উপন্যাসের গুরুত্ব পর্যালোচনা করার আগে লেখকের সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস, দায়বদ্ধতা এবং পরিশ্রমের কাছে পাঠককে মাথা নোয়াতেই হয় এবং সশ্রদ্ধ প্রণাম করতে হয় সাহিত্যিক সমরেশ বসুকে।

এই উপন্যাস লেখার আগে মাছমারাদের হালে এবং জালে হাত রেখে তাদের জীবনের গল্প শুনেছেন এবং চাক্ষুষ দেখে এসেছেন সাহিত্যিক। মুখোমুখি বসে একই বিড়ির আগুনে তিনি মাঝিমল্লারদের জীবন দেখেছেন তাদেরই সঙ্গে। তাইতো এই উপন্যাসের চাল-চিত্র এবং চরিত্র এতটা হৃদয়স্পর্শী এবং বাস্তবগ্রাহী হয়ে উঠতে পেরেছে। লেখক সমরেশ বসু নিজেই বলেন 'আতৎপুর এবং হালিশহরের মাঝিদের সহযোগিতা না পেলে গঙ্গা উপন্যাস লেখা সহজ হত না'। তাঁর এমন নিঃস্বার্থ প্রয়াস এবং আন্তরিকতার জন্যই পাঠক অতি সহজেই শুনতে পায় মাঝিদের দাঁড় টানার শব্দ এবং ভাটিয়ালি গানের মধ্যে দিয়ে তাদের বিষাদময় জীবনের নোনতা-মধুর সুর। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। প্রমথ সেনগুপ্ত এই উপন্যাস সম্পর্কে বলেছিলেন -'গঙ্গা সাম্প্রতিক উপন্যাসমালার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় রচনা'।

এই উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে 'গঙ্গা'নদীর কথা। গঙ্গা মালোপাড়ার মাঝিদের কাছে 'মা'। রাগ, দুঃখ, অভিমান, অভিযোগ সবকিছুই তাদের প্রকাশ করার জায়গা গঙ্গার কাছে। কারণ এই গঙ্গার উপরেই তাদের ভাত-কাপড় নির্ভর করে আছে। মারলে তাদের ভগবতীই মারবে রাখলে তিনিই রাখবে। মহাজনের কটাক্ষে দুঃখ যখন তাদের সীমা ছাড়ায় তখন তারা গঙ্গার কাছে গিয়ে বলে- 'গঙ্গা শুনে রাখো গো মা, তোর ছেলেকে কী শুনতে হয়'। গঙ্গার অতলবক্ষ থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে তারা। তাদের বেঁচে থাকা তার মর্জির উপরে রাগ দেখানো বা কথা বলার অধিকার নেই, বিধাতার সংসারে। এই কারণে অভাবও তাদের পিছু ছাড়ে না। সব মানুষের রাগ দেখানোর জায়গা থাকে, মালোদের সেটুকুও নেই- 'মাছমারাদের মানুষের পরে রাগ করতে নেই যার পরে করে তাকে দেখা যায় না এই সোমসারে'। জেলে জীবনের এই বীভৎস সত্যিকে পাল্টাতে চেয়েছিল বিলাস মালো।

এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। গঙ্গার শান্ত শীতলতা বিলাসকে শান্ত রাখতে পারে না। মালোদের মধ্যে বিলাসই গঙ্গা পেরিয়ে যাওয়ার সাহস রাখে। বিলাস ছাড়াও এই

উপন্যাসে রয়েছে পাঁচু, রসিক, ঠান্ডারাম, সয়ারাম, অমর্ত্যের বউ, পাঁচী, দামিনী, আতরবালা, হিমি ইত্যাদি চরিত্ররা। আরও একজন চরিত্র এই উপন্যাসে প্রবলভাবে রয়েছে তবে সে জীবিত নয় এই আখ্যানে। সে মৃত নিবারণ সাইদার। পাঁচুর দাদা এবং বিলাসের বাবা। জীবিত না হলেও নিবারণ সাইদারকে উপেক্ষা করে এই উপন্যাস পড়া কখনোই সম্ভব নয়। বিলাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এই আখ্যানে রয়েছে নিবারণ সাইদার। এক এক সময় পাঁচু বিভ্রান্তিতে পড়েছে, আবার কখনো খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেছে বিলাসের মধ্যে থেকে তার দাদা নিবারণকে। সাইদার বলতে বোঝায় সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য অনেকগুলি নৌকার নের্তৃত্ব দেন যিনি। নিবারণ প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশটা নৌকা নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিত। জীবনচেতনা থেকে মৃত্যুচেতনা এই উপন্যাসের মধ্যে সর্বত্রই থাবা বসিয়েছে। নিবারণের মৃত্যু হয় জোয়ারের জলে নৌকাডুবিতে। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বংশের মৃত্যু যেখানে হয় সেইখানে যাওয়া মালোদের ছিল নিষিদ্ধ। সেই কারণে বিলাসকে কখনো সমুদ্রে যেতে দেওয়া হত না। কিন্তু আগুনকে কখনো ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায় না। বিলাস মালোপাড়ার সেই ছাইচাপা আগুন। এই কারণেই এই উপন্যাস এতটা আলাদা। কেননা এই উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে প্রজন্মের উত্তরণের কথা। নিবারণের বাবা কখনও গঙ্গাবক্ষে মাঝধরার জন্য সরকারি নিয়মের মধ্যে দিয়ে টিকিট কেটে লগগেট পেরিয়ে গঙ্গা নদীতে যায়নি। খালের মধ্যে দিয়ে তিনি গঙ্গা নদীতে গিয়ে পড়তেন। সময় যেমন বদলায় দেশের আইনও তেমন বদলায়। নিবারণের ভাই পাঁচুর আমলে টিকিট কেটে তবেই গঙ্গায় মাছধরার অনুমতি পাওয়া যায়। তেমনি সবকিছুই যেমন পরিবর্তনশীল, তেমনি যা জেলেপাড়ার সংস্কার অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বলতে গেলে কুসংস্কার তারও পরিবর্তন যে হবে তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন থাকে না। বিলাসের মধ্যে দিয়ে সেই পরিবর্তন এসে কড়া নাড়ে আখ্যানের মধ্যে। বাবার মৃত্যুর জন্য ভবিষ্যত কখনো থমকে যেতে পারে না। বিলাস যুক্তি দিয়ে তা সবসময় তার খুড়োকে বোঝানোর চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিলাস দক্ষিণের জানালা খুলে দিয়েছে এই উপন্যাসে। জেলেপাড়ার জীবন নির্ভর করে থাকে শুধু বর্ষাকালের উপরে। কারণ এইসময় গঙ্গাবক্ষ হয়ে, ওঠে ফলদায়িনী। জোয়ার এবং ভাটার খেলার মাঝে নৌকার হাল ধরে তারা সেই মাছ তুলে এনে ফড়েনীদের কাছে বেচে। কিন্তু বর্ষাকাল শেষ হলেই পেটে গামছা বেঁধে পড়ে থাকতে হয় তাদের কারণ তখন মাছ আর নদীতে তেমন পাওয়া যায় না। চৈত্র মাসে আকাল শুরু হয় বেশি। জেলেপাড়ার পুরুষরা সন্ন্যাসী সেজে গাজনের দলে নাম লিখিয়ে পিঠ বাঁচায়। ভিক্ষা করে তাদের সংসার চলে। কিন্তু পিছনে পড়ে থাকে তাদের ক্ষুধার্ত পরিবার—'সন্ন্যাসের হাঁকের আড়ালে মাছমারার খিদের কান্না কেউ শুনতে পায় না।' তাই তারা পালিয়ে গেলেও অভাব কিন্তু গাঁ ছাড়ে না। ধলতিতার বাইশ বছরের যুবক বিলাস উপলব্ধি করতে পারে এই সমস্ত সামাজিক সমস্যাগুলো। তাই সে বোঝে সমুদ্রের গর্ভ অফুরন্ত। জীবাশ্মের মতো সমাজের কুসংস্কারগুলোকে ত্যাগ না

করলে মাথা উঁচু করে জেলেদের খেয়ে পরে কখনোই বাঁচা সম্ভব নয়। খুড়োর সঙ্গে তাই সব সময় তার চলে নবীন এবং প্রবীণের দ্বন্দ্ব। কখনো সে প্রতিবাদ করে ওঠে 'পাঁজি' -এর বিরুদ্ধে। আবার কখনো গর্জে উঠে বলে —রাজার ব্যাটা যেন, এই করা বারণ, ওই করা বারণ'। বিলাস বোঝে মালো জীবনে যেখানে খাওয়া, পরা জোটানো অনিশ্চিত, সেখানে সবার আগে 'প্রয়োজন' বড়ো, কোনো কুসংস্কার নয়। এই আধুনিকমনস্কতা এই চরিত্রটিকে নব্যরূপ দান করেছে। 'পদ্মানদীর মাঝি'[৩] উপন্যাসে হোসেন মিঞা কেতুপুরের প্রতিস্পর্ধী আরেকটা জনবসতি গড়তে চেয়েছিল জেলে পাড়ার মানুষদের অভাব থেকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু তা ছিল একেবারেই অলীক একটা প্রচেষ্টা। 'গঙ্গা' উপন্যাসের মধ্যে এমন কোনো অলীক রূপকথার গল্প শোনাননি লেখক। বরং মুখ বুজে ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া নয় বরং পথের সন্ধান করা হয়েছে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে। তবে পথ কখনোই সুগম হয়নি। বিপর্যয় এসেছে সবসময় এবং নাড়িয়ে দিয়ে গেছে মাঝিদের নৌকা এবং জীবনের স্রোত। শুধু জলের সঙ্গেই লড়াই নয়; ডাঙার সঙ্গেও জেলেমাঝিদের চলে টিকে থাকার লড়াই। তাদের জীবন মরণের দড়ি ওইখানেই বাঁধা। মাছ ধরতে গেলে জঙ্গলে অপেক্ষা করে থাকে দক্ষিণরায়ের বাহন বাঘ, আবার জলে থেকে মাছ তোলার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসে মহাজন। মূল্য তাদেরকে এই পৃথিবীতে কেউই দেয়না। ফড়েনীরা তাদেরকে অল্প মূল্য দিয়ে ঠকিয়ে মাছ নিয়ে নেয়। মালোরা অসহায়ের মতো তা দিতে বাধ্য হয়। কেননা এতো পরিশ্রম তাদের সারারাত জেগে ধরা মাছ সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে নৌকার খোলে। মাছে পচন শুরু হবে। বাজারে গিয়ে বিক্রি করার উপায়ও তারা জানেনা। সেখানেও রয়েছে একাধিক ঝামেলা। বরফের কারখানার খবর, মাছ কিভাবে বাজারে বেচতে হয় এই সব নিয়মকানুন তাদের অজানা। আড়তদারদের কাছে থেকে পয়সা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীড় জমায় মহাজনেরা। পুরুষানুক্রমিক দেনা আর তার চক্রবৃদ্ধি হারের আকাশপ্রমাণ সুদের ফর্দ নিয়ে আদায় করে জেলেমাঝিদের সর্বস্ব। কিছু দিতে না পারলে মহাজনদের কোনো অসুবিধা নেই কেননা তাদের মতে- 'বাড়িতে তোর মেয়ে বউ আছে তো। বউয়ের গায়ে কাপড়চোপড় থাকে তো!'। বোঝায় যায় মহাজনের দৃষ্টি আসলে কোনদিকে। এই উপন্যাসের মধ্যে শুরু থেকেই পশ্চিমদিকের মাঝি রসিককে পাঠক দেখেছে একজন বদরাগী এবং ঈর্ষাপরায়ণ হিসেবে। বিলাসের সঙ্গে তার শুরু থেকেই চলে নানান দ্বন্দ্ব। উপন্যাসের শেষে গিয়ে দেখা যায় এই রসিকের ভিতরেও আসলে রয়েছে মহাজনের ছ্যাকা। মহাজন ব্রজেন ঠাকুরের সঙ্গে রসিকের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। ব্রজেন ঠাকুর রাতে যাওয়া আসা করে রসিকের ঘরে। নীরবে রসিককে এতবড়ো যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। আর তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার চারিপাশের মানুষগুলোর উপরে—অকারণ চিৎকার এবং ঝামেলা করে। মাছের তেলেই মাছ ভাজে  মহাজনেরা। জেলেদের নিজেদের হাতে গড়া জাল, নৌকা কেড়ে নিয়ে তাই উচ্চসুদে তাদেরকেই বন্ধক দেয়। খোরাকীর জন্য চাল যখন মাঝিরা কর্জ চাইতে যায় তখন

তাদেরকে ঠকিয়ে বারো টাকার চাল ষোলোটাকায় বিক্রি করে তারা। এই ঋণ শোধের পদ্ধতিও পরিহাসের। মহাজনের যখন মনে হবে তখন এমনিই মাছ নিতে পারে সে। যার কোনো লেখাজোকা থাকে না। হিসাবের খাতাও মহাজনেরই তত্ত্বাবধানে। মাছমারারা জানে না আসলে কত ঋণ তার হয়েছে। একটা সময়ে যখন আর জেলে মাঝিদের ক্ষমতা থাকেনা সেই সুদ পরিশোধ করার—তখন সয়ারামের দাদা ঠান্ডারামের মতো আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ঠান্ডারাম গঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শুধু এই জীবনে মহাজনের নয় বিধাতার কাছেও ঋণ শোধ করে যায় মালো জীবন পাওয়ার। দরিদ্র এই মালোরা তাই বলে—'বড়ো লাঞ্ছনা গো মা'। নীরব এই জেলেরা শেষপর্যন্ত বিপথে চালিত হয়। নিজেদের সর্বস্ব মহাজনের হাতে তুলে দিয়ে শেষে ক্ষুধার তাগিদে কারোর পুকুরে বা ভেড়িতে মাছ চুরি করতে বাধ্য হয় তারা। ধরা পড়লে জোটে জুতোর ঘা। একদিকে ক্ষুধার তাড়না অপরদিকে আদিম এই মানুষগুলো কামের তাড়নায় হাটের আদিবাসী রমণীদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে আসে। অবশেষে একদিন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় মাছমারাদের স্ত্রীদের। জলা জায়গা খালে সকলের সামনে শীর্ণ, রুগ্ন মাছমারাদের স্ত্রীরা মাছ ধরতে নামে। সারাদিন না খেয়ে রোদে জলে থাকার ফলে তারা মানসিক স্থিতি হারিয়ে ফেলে। সরল মাছমারারা ভাবে ভূতে ধরেছে। সেই ভূতে ধরার বর্ণনা শুনলে বোঝা যায় সেই ভূত আসলে বাড়ির কর্তার অক্ষমতারই ভূত—"যে মাছমারার নৌকা নেই তার ঘরনীর উপর পেতনীর নজর বেশীগতরে মাংস নেই, হাড়ে কালি পড়েছে। রুক্ষু শুকু শনখুড়িয় চুল, ছেঁড়াকানি পরনে"। ভূতে ধরার মধ্যে দিয়ে তাদের স্ত্রীরা চিৎকার করে সেই যন্ত্রণাময় বারোমাস্যার কথা বলে ওঠে। সকলের সামনে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে আসে তার বাড়ির পুরুষের। তারই অক্ষমতার জন্য তার স্ত্রী পরিবারকে এই অসহায়তার মধ্যে পড়তে হয়। গুণীন ভূত ছাড়াতে আসলে ভূতে ধরা মাছমারার স্ত্রীরা চায় কেবল পেট ভরে খাবার জন্য একথালা ভাত। গুণীন তাকে ভাত খাওয়ানোর আশ্বাস দিলেও তারা বোঝে আসলে এইসব কথা সোনার পাথরবাটী। মাছমারাদের সংসারে কোনোদিনও কেউ পেট ভরে খেতে পায় না। সমস্যা জানলেও সমাধান করার শক্তি বা ক্ষমতা কোনোটাই তাদের জোগায় না। রাতের অন্ধকারে নীরবে অসুস্থ স্ত্রীর বুকেপিঠে তেল মালিশ করে দেয় তারা। বাড়ির বউটিও তখন বোঝে তাই নীরবে চোখ ভেজে দুজনের। বিলাস অনুধাবন করতে পেরেছিল এই অবস্থার অপরপিঠটা। সে জানতো মহাজন ছাড়া যেমন মাছমারাদের খাবার জুটবে না, তেমনি জেলেদের ছাড়া মহাজনদেরও খাবার জুটবে না। তাই তারা যতই গালাগালি দিক আসলে এইগুলো হল ভয়দেখানো এবং দমিয়ে রাখার খেলা। তাই সে সরাসরি পাঁচু কে বলে—"আমাকে ঋণ দ্যে তো মহাজনে খায়। আমি যদি ঋণ না ন্যে না খেয়ে মরি, মহাজনে বাঁচে কেমনে"। এই সরল অথচ কঠোর বাস্তবকে বোঝার ক্ষমতা দরিদ্র মাছমারাদের ছিল না। তাই বিলাসের এই কথাতে সকলের মাথার মধ্যে গুলিয়ে ওঠে। এইভাবেই ঋতুচক্রের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের

চক্রও আবর্তিত হয়। তবে খোদাতালার দরবারে অবস্থা সকলের এক হলেও মানুষের প্রকৃতি সকলের এক নয়। সেখানে পাঁচটা আঙুল হয় পাঁচ রকম। ঠিক যেমন ছিল নিবারণ সাইদার। মাছধরা জীবিকা তার কাছে পেশার সঙ্গে ছিল নেশাও। জলের দিকে তাকিয়ে মাছের চক তাদের গতিপ্রকৃতি বলে দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল। কালো, লম্বা, এক মাথা কোঁকরানো চুল এই সাইদার সাহসের দিক থেকে ছিল সিংহের মতো। লোকে তাকে মান্যি করত এবং 'গুণ' জানে বলে বিশ্বাস করতো। নিবারণ সত্যিই গুণ জানতো। মাটি এবং জলের সঙ্গে লড়াই করতে করতে এই ধরিত্রীর হালহকিকত তার পরিচিত ছিল। জলের দিকে তাকিয়ে মাছের চক বলে দিতে পারতো সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কোন মেঘে বৃষ্টি হবে কোন মেঘে হবে না বলার ক্ষমতা রাখত নিবারণ। সাহসিকতা এবং সততা দিয়ে সে জলের ফসল তুলে এনে মহাজনদের থেকে নিজের পূর্বপুরুষের বাঁধা নৌকা ছাড়িয়েছে, জাল তৈরি করেছে। ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া নয় বরং উল্টে মার খাওয়াতেও সে জানতো। তবে জলের সঙ্গে লড়াই করলেও জলকে হারানোর ক্ষমতা তার ছিল না, কারণ সেটা কখনোই সম্ভব নয়। প্রকৃতি এবং মানুষের অসম লড়াইয়ে নিবারণ হার মানে। তবে সুঁতো সে ছেড়ে গিয়েছিল। আর সেই সুঁতোয় খোটা বেঁধে পাঁচু তৈরি করার চেষ্টা করে একজন আদর্শ মাছ শিকারের কারিগর। হ্যাঁ নিবারণের সেই সুঁতো তার সুযোগ্য পুত্র বিলাস। মালো জীবনের ম্যাজিক সে। কালো বর্ণের দীর্ঘাকৃতি এই ছেলের আর বাকিসব মাছমারাদের মতো বিদ্যালয়ে নয়, হাতেখড়ি হয় নদীতে। মালোপাড়ার ধারাপাত এবং সহজপাঠের বইয়ে রয়েছে শহরের দিকে না তাকানো, মহাজনের সামনে সব সময় নত হয়ে থাকা, জল ছেড়ে ডাঙ্গার দিকে তাকানো তাদের নিষিদ্ধ। মাছমারা জাতি ছাড়া অন্য কোনো জাতির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ। এইসমস্ত নিয়ম এবং আদিম সংস্কারের মধ্যে আসলে মিশিয়ে দেওয়া আছে পেশা পরিবর্তন না করার একটা অদৃশ্য শেকল এবং আজীবন মাথানত করে জীবন চালানোর অলিখিত সংবিধান। নন্দবংশকে ধ্বংস করতে চন্দ্রগুপ্তদের জন্মাতেই হয়। মালোপাড়ার চন্দ্রগুপ্ত অসম সাহসী বিলাস শিশুর মতোন চোখ দিয়ে শহরকে দেখে, জীবনকে দেখে এবং বুঝতে পারে নিজেদের সঙ্গে সময়ের পার্থক্য। পাঁচুর উপর মহাজনের অত্যাচার দেখে সহ্য করতে না পেরে তার হয়ে প্রতিবাদ করে। মহাজনের সভাতে বাবুদের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলে যা এর আগে কোনো মাছমারা করতে সাহস পায়নি। গঙ্গার নদীবক্ষে অন্যায়ভাবে টানাছাদি জাল ফেললে বিলাস লড়াই করে একাই সকলের সঙ্গে। আসলে বিলাসের মধ্যে কোনো জটিলতা ছিল না। সে গঙ্গার জলের মতোই ছিল স্বচ্ছ। নির্ভীক বিলাস ছিল সদা সত্যবাদী এবং যখনই অন্যায় দেখেছে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সকলের জন্য। তার খুড়ো তাকে বারবার থামানোর চেষ্টা করেছে স্নেহমিশ্রিত ধমকও দিয়েছিল কারণ পাঁচু জানতো জেলেদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো বাবুরা কখনো সহ্য করবে না। কারণ প্রাচীনকাল থেকেই এটা পিরামিডের নিচেরতলার মানুষদের পিষে

মারার খেলা। এই কঠিন খেলাটাই সহজভাবে বিলাস বুঝতো। কিন্তু পাঁচু পিতার স্নেহ দিয়ে ভাইপোকে বড়ো করেছে সমস্ত ঝড় তুফান থেকে আগলাবার চেষ্টা করেছে, ভাইপোর কোনো ক্ষতি হোক সে চায়নি। এইখানে পাঁচুর বাৎসল্য রসের মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাস জেলে জীবনের আরেকটি দিককে উন্মোচিত করে তোলে।

তাদের জীবনে অভাব আছে একথা সত্য তবে তার সঙ্গে আরও একটি দিক রয়েছে 'বেঁধে বেঁধে থাকার বোধ' এবং পরিবারচেতনা। ভাইয়ের পরিবার এখানে আরেক ভাইয়ের কাছে শত্রুর পরিবার নয়। নিবারণ সাইদার তার ভাই পাঁচুকে নিজের হাতে মাছ ধরা শিখিয়েছে, রাগ হলে মেরেছে আবার ভালোবেসে—চুলের মুটি ধরে ভাত খাইয়ে দিয়েছে, নিজে সঙ্গে করে নদীতে, সমুদ্রে নিয়ে গেছে মাছ ধরতে। আবার নিবারণের মৃত্যুর পর ভাইপোকে জেলেজীবনের হাতেখড়ি দিয়েছে পাঁচু নিজে। নিজের ছেলের জন্য নয়, পাঁচু সবার প্রথমে ভাবতো ভাইপোর জন্য। বিলাসের একটা সুখী গৃহস্থ জীবন এবং প্রতিদিন মাছে ভাতে থাকার জন্য জমি এবং নৌকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল পাঁচু। রেগে গেলে পাঁচু কোনোদিনও বাপ তুলে গালাগালি দেয়নি। কারণ তাহলে তার গুরু এবং দাদা নিবারণকে গালাগাল দেওয়া হয়। বিলাসেরও ছিল খুড়োঅন্ত প্রাণ। তার কাছে 'খুড়ো শব্দটি ছিল সবথেকে মধুর শব্দ। বিলাসের মনে হত- 'খুড়ো ডাকের মধ্যে রয়েছে দরদের সুর'। খুড়োর হাতে যত্ন করে গাবগাছের আঠা সে লাগিয়ে দিত পোকার হাতে থেকে বাঁচাতে। পাঁচুর মৃত্যুতে ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণায় শেষ হয়ে যায় সে। পাঁচুর কথা রাখতেই হিমিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় বিলাস।

হিমি বিলাসের জীবনের প্রথম প্রেম। এখানেও আছে প্রথা ভাঙার দুঃসাহস। হিমির প্রেমে পড়লেও বিলাস সমাজের বিপরীতে গিয়ে বিয়ে করার সাহস দেখাতে পারেনি প্রথমে। বিলাসদের গ্রামে অমর্ত্যের বউ নিজের যৌবনের সুযোগ নিয়ে বারবার বিলাসকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করেছে। শুধু বিলাসকেই নয় এমন আরও অনেক পুরুষকেই সে উন্মাদ করেছে। আদিম এই গোষ্ঠীর মধ্যে এটা নতুন কিছু নয়। মৈথুনকে ঢেকে রাখার চেষ্টা এরা কখনোই করে না। জীবিকা তাদের সকলেরই কিছু না কিছু রয়েছে তার সঙ্গে রয়েছে শরীর বৃত্তিও। চিত্তের এই উদ্দামতা এই সমাজে পুরানো। কিন্তু বিলাসের সংযম কখনোই ভাঙেনি। চিত্তের দৃঢ়তা তাকে এক উচ্চাসন দিয়েছে এখানে। তাবলে তার মন যে উথালপাথাল করেনি যৌবনের স্রোতে সেকথা ঠিক নয়। গামলী পাঁচীকে দেখলে সে ভাবুক হয়ে উঠতো। পৃথিবীতে কর্মের বাইরেও যে কোনো একটা রহস্য আছে সে অনুমান করতে পারতো। তবে ভালোবাসার প্রকৃত মানে সে খুঁজে পেয়েছিল হিমির মধ্যে দিয়ে। এখানেই রচিত হয় ভালোবাসার ভিন্ন গল্প। হিমি মালো পাড়ার মেয়ে নয়। সে মাছ ফড়েনীদের মেয়ে এছাড়া আরও একটি বংশগত পরিচয় হিমির রয়েছে। হিমির মা, দিদিমা ছিল রাঁড়। কোনো একজনের অধীনে স্থায়ী সংসার তারা করেনি। নিজেদের স্বাধীনতা তারা কারোর হাতে

সমর্পণ করেনি। অবশ্য তার জন্য তাদের ভাত-কাপড়ের অভাব তাদের হয়নি। নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নিতে পারে। এই ফড়েনীদের সঙ্গে জেলে মাঝিদের প্রেম ছিল নিষিদ্ধ। কেননা জেলেদের অর্থনৈতিক অবস্থার থেকে তাদের অবস্থা অনেকগুণ ভালো। তাই দুরবস্থায় পড়লে এদের কাছে থেকেই জেলেদের ধার নিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় মহাজনের সঙ্গে নিশ্চয় প্রেম হতে পারেনা দরিদ্র মাঝিদের। কিন্তু তারপরেও নিয়ম ভাঙে, কারণ মানুষের জীবনে ভালোবাসা নামে যে জিনিস রয়েছে যাকে কার্যকারণ সূত্র দিয়ে সবসময় ব্যাখ্যা করা যায় না। বিলাস আর হিমির প্রেম এইকারণেই হয়ে ওঠে 'দুঃসাহসিকতা'। এইভাবেই মিঠে জলের সঙ্গে মেশে জীবনের লবণ। এই উপন্যাসের সর্বত্রই বর্তমানের সমান্তরালে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অতীত। হিমির দিদিমা দামিনী দিদিও একদিন প্রেমে পড়েছিল বিলাসের বাবা নিবারণের। কিন্তু ডাঙার ফড়েনী কখনো সমুদ্রের ফড়েনী হয়ে উঠতে পারেনি অর্থাৎ নিবারণ আর দামিনী কখনোই সাতপাকে বাঁধা পড়েনি। আগেই বলেছি এই উপন্যাসের মধ্যে সর্বত্রই প্রজন্মের উত্তরণ রয়েছে। যে সাহস নিবারণ এবং দামিনী দেখাতে পারেনি সেই সাহস দেখায় বিলাস এবং হিমি। তবে এখানেও ঘটে ট্র্যাজেডি। প্রত্যেকটা পেশার একটা নিজস্ব যাপনচিত্র রয়েছে। মাছমারাদের মতো তার স্ত্রীদেরও জাগতে হয় রাত। কেননা ঘরের মানুষ অকূল দরিয়ায় নাও ভাসিয়েছ। তাই অনিদ্রায় কাটে বাড়ির স্ত্রী-পুত্রদের। মাছমারাদের দেবতা খোকাঠাকুরের স্মরণ নেয় অকূলে ভাসতে থাকা তাদের পুরুষের জন্য কল্যাণ কামনা করে। আবার বর্ষাকাল ফুরালে আকালের দিন মাসগুলো ও ক্ষুধার জ্বালায় অনিদ্রায় কাটায় তারা। নিদ্রা মাছমারাদের বাড়ির লোকেদের থাকে না- 'তুমি মাছমারার বউ, তুমি জাগো বারোমাস'। এইভাবেই তাদের জীবনটা আনন্দে-দুঃখে, হেসে- কেঁদে চলে ধুঁকে ধুঁকে। ফড়েনীদের জীবন তেমন নয়। বহুগামিতা তাদের মধ্যে মালোদের থেকে অনেক বেশি। সেই কারণে ভাতের কষ্ট তাদের সইতে হয় না। চলতি সমাজ জীবনের বন্ধন এদের সমাজে নেই, যৌবন থাকতে এখানে বৈধব্য নেই তাদের। রঙ চাপতে যাওয়ার সূক্ষ্ম মুন্সিয়ানা অনায়ত্ত এদের। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সবটাই বড়ো দুরন্ত, ভয়াবহ, উচ্ছৃঙ্খল ও আদিম। সেই কারণে মাছমারাদের অকূলের সংসার তাদের কাছে ভয়ের। বিলাসের নৌকোয় হিমি উঠে ধলতিতার দিকে যাত্রা করলেও গঙ্গা পেরোনোর সাহস শেষ পর্যন্ত সে দেখাতে পারেনি। সংসার গড়ার স্বপ্ন তাদের বাস্তব রূপ পায়নি। উথালপাথাল বুক নিয়ে বিলাস পাড়ি দেয় সমুদ্র হিমি ফিরে যায় ডাঙায়। নৌকার টলোমলো সংসার গড়ে তোলার মতো সাহস হিমিও রাখতে পারেনা। এখানে ভাগ্য আর বিধাতা তারা গুলিয়ে ওঠে। বিলাস আর হিমির গল্প এই উপন্যাসে হয়ে থাকল ছোটগল্পের মতো— শেষ হয়েও হইল না শেষ। তবে হিমি এবং বিলাস সাহস জুগিয়ে যায় আগামীদের। হিমির অপেক্ষা গঙ্গা নদীর মতোই অনন্ত হয়ে থেকে যায়।

সমরেশ বসু এই উপন্যাসের মধ্যে আরও একটি কান্ড ঘটিয়েছেন। সেই কান্ডটি হল তিনি

মাঝিদের নিজস্ব ভাষায় তাদের বেঁচে থাকার কথা তুলে ধরেছেন। তবে তা বোঝার জন্য কখনোই পাঠককে বেগ পেতে হয় না, কারণ প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষার সংলাপের পরে তিনি সহজভাবে তার অর্থ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। যার ফলে একদিকে যেমন পাঠক জানতে পারবে সেই মাঝিদের ভাষা সম্বন্ধে তেমন তার অর্থ বুঝতেও পারবে। যেমন মালোদের ভাষায় সাংলোজাল, খুঁটলি, গড়ান, বাঁধাছাদি জাল ইত্যাদি হল মাছধরার সুবিধার্থে বিভিন্ন রকম জালের প্রকারভেদ। নদীর জলের গতিধারার উপরেও বিভিন্ন রকমের শব্দ প্রয়োগ করে তারা। যেমন- চলন্তা জল, মুকড়া জল, জলেঙ্গাজল, ওকোড় মারা ইত্যাদি। ওকোড় মারা অর্থাৎ কাছির টান। সাংলো ফেলে পাথালি নৌকা দিয়ে মাছ ধরা অর্থাৎ গরান মারা। ইত্যাদি এমন বহুবিধ আঞ্চলিক শব্দ রয়েছে এই উপন্যাসে।

এই 'গঙ্গা' আক্ষরিক অর্থে যেমন নদী তেমন মহাজীবনও বটে, যেখানে জোয়ার ভাটার প্রকোপ সবাইকে পোহাতে হয় এবং তারই পাড় ভেঙে ভেঙে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। এই উপন্যাস নিঃসন্দেহে পাঠকের চেতনা এবং উপলব্ধির পাড় ভাঙবে। এইখানে প্রতিরোধ নেই যা কিছু আছে তা হল প্রতিকার। ইতিহাস এবং সময়চেতনাও ধরা দিয়েছে এই উপন্যাসে। রানি রাসমণির মাঝিদের গঙ্গাবক্ষে মাছ ধরার জন্য কোনোরকম কর্জ নিতেন না। এরফলে দরিদ্র মাঝিদের আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সুবিধা হয়। তবে খুব বেশি লাভ তাদের হয় না। ভগবতীর জলে মাছ ধরলেও খাজনা নেবে মানুষ। খাজনা নেওয়ার জন্য সরকার রয়েছে, মিলিটারি রয়েছে, পাইকরা রয়েছে, তাছাড়া বিষফোঁড়ার মতো তো মহাজনেরা রয়েছেই। তাদের খাদ্যবিলাসের জায়গায় চোখ রাখলেই তা টের পাওয়া যায়। বর্ষাকালে মাঝিদের নৌকোয় মাছ বেশি উঠলে তাদের নৌকোয় একটু ভালো মন্দ খাবার আসে। এই ভালোমন্দ খাবার হল ভাতের সঙ্গে একটু পেঁয়াজ, একটু লঙ্কা। আর খুব বেশি বরাত থাকলে গোল আলুও জোটে। ভালো সময়ে তাদের আহারের পরিচয় দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে খারাপ সময়ে আসলে তাদের কীরকম খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

নদী আর নিয়তি 'গঙ্গা' উপন্যাসে একাকার হয়ে গেছে। এইখানে রানি রাসমণির শাসনকালের পরিচয় ছাড়াও আরও একটি দিক রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা পরিবর্তনের কথা। এই উপন্যাস ছাড়াও একাধিক বইয়ে এর প্রমাণ রয়েছে। ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে মাঝিদের একটা বড়ো অংশ চাষবাসের কাজ এবং নানাবিধ কাজে চলে যায়।[৪] এই উপন্যাসেরও শুরুতেই দেখা যায় রাজবংশীরা দলে দলে এসে মাছধরার কাজে যোগ দিচ্ছে। আবার জেলেরা মাছ ধরার কাজ ছেড়ে কারখানার কাজ, গাড়ি চালানোর কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছে। টিটাগড়ের কারখানার আলো এসে পড়ে জেলেমাঝিদের নৌকায়। আসলে সেই আলো কেবল তাদের নৌকায় নয়—বোঝা যায় সেই আলো মাছমারাদের শরীর ভেদ করে তাদের মনে গিয়ে পড়ছে। তাছাড়াও শহরের রেলগাড়ির শব্দ আধুনিক এবং নব্য বিলাসী

জীবনের ডাক তারা যে আর বেশিদিন উপেক্ষা করে থাকতে পারবে না বোঝা যায়। কর্পোরেট দুনিয়া তাদেরকে ওখানে নিয়ে যাবেই। উপেক্ষা করার সামর্থ্য আর তাদের বেশি নেই। এখনও বঙ্গের একাধিক গ্রাম ঘুরলে দীর্ঘ এই যাত্রাপথের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন হুগলির বলাগড় অঞ্চল নৌকাশিল্প একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র, সেখানে মাঝি জীবনের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আজও বর্তমান। 'রাজবংশী' বলে নিজেদের এখনও পরিচয় দেয় এখানকার মাঝিরা।[৫] দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের ঢল যখন রাস্তায় নামে মাছমারাদের বুক তখন কেঁপে ওঠে। ঠান্ডারামের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল পেশা পরিবর্তনের সুর। মহাজনের দেনা শোধ করার ক্ষমতা তার ছিল না। কিন্তু বিধাতার নিয়মে পেট এবং মুখ তার পরিবারের লোকেদের রয়েছে। তাই অসহায়ের মতো ঠান্ডারামও বলেছিল যে সে মাছমারার কাজ ছেড়ে দিয়ে মুটে বওয়ার কাজে চলে যাবে। যদিও তা হয়নি। পাঁচুর মধ্যেও ছিল হতাশার ছাপ। জলের অনিশ্চিত জীবনকে সেও ভয় পেত। পাঁচুও চাইত স্থায়িত্ব। সে বুঝত জমিতে হাল ধরার মধ্যে কোথাও একটু মনোবল পাওয়া যায়। পাঁচু বারবার চেয়েছিল বিলাস এবং তার পরিবারের জন্য একটু জমির ব্যবস্থা করে দিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ বোঝা যায় জীবিকা পরিবর্তনের একটা ধারা এসে ধাক্কা দিচ্ছে প্রচলিত গতিপথে। পাঁচু এও জানতো যে জমিতেও রয়েছে মহাজনের ভয়। সেখানেও নৌকা না থাক আস্ত জমি তো রয়েছে বাধা দেওয়ার জন্য।

জেলেদের আচার, উৎসবকেও টেনে এনেছেন সমরেশ বসু এই উপন্যাসের মধ্যে। জেলেদের ঢ্যালাপ্যালার পুজো, খোকা ঠাকুরের পুজো ইত্যাদি উৎসব তথা বিনোদন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকেও বুঝতে সাহায্য করে।

এই পুরো উপন্যাস জুড়ে লেখক সমরেশ বসু যেন একটি আস্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও রচনা করেছেন। বিলাসের কালোরূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শ্যামের সঙ্গে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। কালোরূপের মধ্যে আলোর খোঁজে এনেছেন লেখক। বিলাসের রূপ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন—"গাব আঠা মাখানো কালো কাঁড়ারের উপরে যেন রং করা দারুমূর্তি। কী কালো যেন কেউটে বসে আছে ফণা তুলে।" অপরদিকে হিমি যেন রাধার প্রতিচ্ছবি—"রূপখানি তো আছে। তার উপরে কালিন্দী আর রাইমঙ্গলের মোহনার হ্যাঁকা লেগেছে শরীরে। টকটকে লাল শাড়ি পরেছে একখানি। তাজা ইলিশ -কাটা গাঢ় রক্তের মতো লাল। জামা গায়ে দেয়নি"।

অপ্রধান চরিত্রগুলোর রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো কার্পণ্য করেননি তিনি। দামিনীর যৌবনের রূপবর্ণনার মধ্যে দিয়েই তা বোঝা যায়—"দামিনী আশ্বিনের গঙ্গা। দেহের স্রোতে নাবালেরই ঢল। ওই টানে পড়লে, পুরুষের উঠে আসা বড়ো দুস্কর"। অমর্ত্যের বউয়ের বর্ণনা তিনি দেন—"রাইমঙ্গলে যেন জোয়ার এসেছে'। এছাড়াও পাঁচীর অপেক্ষা, তার দৃষ্টি সবকিছুই এক অন্যমাত্রা দিয়েছে। রূপবর্ণনা ছাড়াও ভৌগোলিক বর্ণনাও এই উপন্যাসের আরেকটি প্রাপ্তি। ২৪পরগনার নদীর অবস্থান ইছামতী, বিদ্যেধরী, পিয়ালী,

রায়মঙ্গল ইত্যাদি নদীর গতিপথের বর্ণনা, শ্যামরায়, ব্যারাকপুর পুলিশ মিলিটারী, নবাবগঞ্জ, শ্যামনগর, জগদ্দল, হালিশহর, চুঁচুড়া ইত্যাদি অঞ্চলের বর্ণনা ও চমৎকার।

একটা গোষ্ঠী একটা পুরো ইতিহাসকে টেনে আনে। এই উপন্যাস জেলেজীবনের টিকে থাকার ইতিহাস। এদের জীবনের সার কথা হল প্রাণ নিয়ে কারুর সঙ্গে টানাটানি করে লাভ নেই। তুমি মাছমারা। মাছ তোমাকে সাক্ষাৎ মারে না। কিন্তু মাছেরই ঝাঁকে, তারই চলাচলের পথে, গহিন আশ্রয়ে ওঁৎ পেতে থাকে তোমার মরণ। যতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবার, সে বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে। লীলা শেষ হলে সে আসবে অন্য মূর্তি ধরে।

এইভাবেই এদের দেবতা এবং যম দুজনেই আছেন মরাকোটালে এবং ভরাকোটালে। জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস মাঝি জীবনের মহাকাব্য। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং মৈথুন এই দৃষ্টিগুলোকে সরিয়ে রাখলেও এই উপন্যাসে রয়েছে একটি বিপ্লব এবং পরিবর্তনের সুরও। বিলাস এবং নিবারণ চরিত্র দুটি যুগপরিবর্তনের ছায়া। এই দুজন চরিত্রের মধ্যে আছে নিজেদের পেশার উপর দায়বদ্ধতা এবং অদ্ভুত একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা। জোয়ার এবং ভাটাঁর টান এই পৃথিবীতে সকলের জীবনেই রয়েছে, তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কোনো পাঁজি-পুথিই এখনো লিখে যেতে পারে নি। জল এই জালের জীবন পালন করা মাঝিমাল্লাদের জীবন দেয়, আবার সেই জলই তাদের জীবনও কাড়ে; তাও তারা ভক্তিভরে মাথানত করে—"গঙ্গা"- মায়ের কাছে। এইভাবেই জেলে মাঝিদের নৌকা ভেড়ে গন্তব্যের ঘাটে। এই অনন্ত জীবনের সুর যেন বহমান নদী এবং এই পরম্পরা লেখকের নিপুণ সৃষ্টি।

**তথ্যসূত্র :**


১. ড. নির্মল দাশ, চর্যাগীতি পরিক্রমা, ১ম (১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮), ১২৮

২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, ৭ম (১৩বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮), ৩৪৯

৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সমগ্র, ১ম (৭শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, সত্যম, ২০১৭)

৪. সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলায় স্মৃতির পেশা ও পেশাজীবীরা, ১ম (কলেজ স্কোয়ার, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ১২, সুপ্রকাশ, ২০২৪), ১৯৬

৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দলিতের পুরাণকথা, ১ম (২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ০৯, অনুষ্টুপ, ২০১৭), ৭১

# ‘বি. টি. রোডের ধারে’ : ব্রাত্য জীবন-সংগ্রামের আখ্যান

সৌভিক বিশ্বাস

আটের দশকের শুরুতে ১৯৮২ সালে আন্তোনিও গ্রামশির ‘প্রলেতারিয়েত’ সম্পর্কিত তত্ত্বচিন্তার থেকে ধারণা নিয়ে Subaltern studies তথা রণজিৎ গুহ-র উদ্যোগে সর্বপ্রথম ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’-এর প্রথম ভলিউম প্রকাশিত হওয়ার পর তা যেমন ইতিহাসচর্চার ধারায় ক্রমাগ্রসর হয়ে চলেছে, তেমনই বাংলা সাহিত্যের জগতেও নিম্নবর্গের প্রসঙ্গটি ক্রমধাবমান হয়েছে। অর্থাৎ, এই সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ-এর ঢেউ কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার ধারাতেই থেমে থাকেনি, “তার ঢেউ অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান এমনকি ভাষা-সাহিত্য, শিল্পচর্চার এলাকাতেও গিয়ে পৌঁছেছে।”[১] সেক্ষেত্রে সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কিছু রচনার দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় নিম্নবর্গের সেই সংগ্রামের কাহিনি। এই প্রবন্ধে তাঁর ‘বি.টি. রোডের ধারে’ উপন্যাসটিকে আশ্রয় করে নিম্নবর্গের তথা ব্রাত্য মানুষগুলির জীবন-সংগ্রাম, তা থেকে তাদের উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দিকগুলিকে পর্যালোচনা করা হল।

কল্লোল যুগের সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘কয়লাকুঠির দেশে’ গল্পে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনকে তুলে আনলেন। তিনি এখানে আনলেন খনি শ্রমিকদের কথা। সমরেশ বসুর ‘বি. টি. রোডের ধারে’ উপন্যাসটিতেও তেমন ধরা পড়েছে বি.টি. রোডের পাশে বসবাস করা বস্তিবাসীর জীবনের কথা, এদের বেশির ভাগই জল-কারখানার শ্রমিক। কাজের জন্য ও ভাতের জন্য এরা নিত্য সমস্যায় জর্জরিত। তারই মধ্যে লুকিয়ে থাকে এদের বহু মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষা। জুড়ে যায় এদের কামনা-বাসনার চিহ্ন। তাদের জীবন-যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের আখ্যান।

এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়, উক্ত উপন্যাসটিতে সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গ সম্পর্ক, প্রান্তিকতা এবং কে, কোন পরিস্থিতিতে কেন ব্রাত্য হয়ে পড়ছে, কীভাবে তাকে প্রান্তিক করা হচ্ছে, কীভাবে এই প্রান্তিকতার স্তর থেকে নিজস্ব সংগ্রাম দ্বারা তাদের উত্তরণ ঘটানো যেতে পারে এবং ইগো ও মানসিক টানাপোড়েন কীভাবে এই সম্পর্কে সম্পর্কিত হচ্ছে, তার সূত্র উদঘাটন। সে প্রসঙ্গে ‘বি. টি. রোডের ধারে’ উপন্যাসটির উপর নিম্নবর্গের ইতিহাসের ও তত্ত্বের আলোকে অনুসন্ধান করে সমাধানের চেষ্টায় অবতীর্ণ হব।

‘বি. টি. রোডের ধারে’ উপন্যাসে যে আখ্যানটি গঠন করা হয়েছে, তা একটি বস্তির জীবনকে কেন্দ্র করে। ঝাঁ-চকচকে বি.টি. রোডের পাশে যেমন নিত্য নতুন ছোটো-বড়ো দোকানপাট গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে কত-শত বিলাসবহুল ধনী মানুষদের অট্টালিকা, ঠিক তারই পাশে অথচ তারই বিপরীতে গড়ে উঠেছে এক অন্ধকার জীবনাচ্ছন্ন মানুষদের বস্তি। ধনী অট্টালিকার মানুষেরা কেবল জানলা দিয়ে এ বস্তির বিভিন্ন ঘটনার রগড়টুকুই দেখতো,

এদের সংস্পর্শে কখনোই আসতো না। বরং নির্দিষ্ট শৌচালয়ের অভাবে বস্তির বাচ্চারা বড় বাড়ির কাছের রাস্তায় মলত্যাগ করতে উদ্যত হলে তাদেরকেও যাচ্ছেতাই ভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। 'চর্যাপদ'-এর পদকর্তা কাহ্নপাদের একটি পদে পাওয়া যায়— "নগরবাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ। / ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মনাড়িআ।।"[২] অর্থাৎ, এখান থেকে স্পষ্ট হয়, সে যুগেও নিম্নবর্গের এ সমস্ত মানুষ অর্থাৎ ডোম-শবরদের মতো নিম্নশ্রেণির মানুষদের সাধারণত জনবসতি থেকে দূরেই বাস করতে হত। উচ্চবর্ণের মানুষেরা এইসব নিম্নবর্ণের মানুষদের ছোঁওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করতেন। এই বস্তির বেশিরভাগ নরনারীই হল দিন আনা, দিন খাওয়া পেপার মিলের কর্মচারী। কাহিনিতে উল্লেখ্য বস্তিটির মতো আরও অনেক বস্তিই আছে। সেই বস্তিগুলির থাকে এক জন বাড়িওয়ালা বকলমে মালিক। সেই মালিকরা হয় মূলত স্বার্থসন্ধানী, অত্যাচারী রাজার মতো। প্রজাদের তথা বস্তিবাসীদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবার বা দেখার সময় তাদের নেই। কিন্তু উপন্যাসে যে বস্তিকে ঘিরে কাহিনি এগিয়েছে, সে বস্তির বাড়িওয়ালা, অন্য বস্তির বাড়িওয়ালাদের থেকে একেবারে বিপরীত। সে আপন-ভোলা একজন লোক, তাই তার সুযোগও নেয় অনেকেই। এ বস্তির পরিবেশ রোগগ্রস্ত, ময়লার আস্তাকুঁড়। এখানকার মানুষ বড় বাড়ির জল সব সময় পায় না, আর রাস্তার কলও অনেক দূর হওয়ায়, তারা হাত-পা ধোয়ার কাজ মেটায় নর্দমার জলেই। এই বস্তির মানুষগুলির মধ্যে যেমন আছে পেটের জ্বালা ও সাংসারিক অভাব-অনটন, রোগ-বালাই, তেমনই এখানে দেখানো হয়েছে যৌবন জ্বালার পরিণামকেও। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল গোবিন্দচন্দ্র শর্মা, যে পেশায় মূলত ছুতোর হলেও ভাগ্যের পরিহাসে এ বস্তিতে এসে হয়ে উঠেছে সেখানকার রাঁধুনি। তার পূর্বকৃত কিছু কাজের বর্ণনায় সকলে তাকে মজার ছলে ফোর টুয়েন্টি নামেই ডাকে। সে যেমন বুদ্ধিমান, তেমন পরোপকারী। সে সকলের কথা ভাবে, সকলকে সব বিভেদ ভুলিয়ে এক সুরে বাঁধতে চায়। তাকে শুরুতে সকলে আপন করে নিয়ে ভালোবাসলেও, দিন শেষে পায় কেবল হতাশা, লাঞ্ছনা ও অপমান। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় নিজের মৃত্যু দিয়ে সে প্রমাণ করে সে আদতে 'ফোর টুয়েন্টি' নয়। সে একজন খাঁটি মানুষ। শেষে দেখা যায়, এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িওয়ালা ও বস্তিবাসীর বস্তি বাঁচানোর স্বপ্নটিরও যেন মৃত্যু ঘটছে এক লহমায়। এর পিছনে কাজ করেছে কিছু স্বার্থসন্ধানী উচ্চবিত্তদের লালসা। এর থেকে মুক্তির আলো-আভাস উপন্যাসে থাকলেও তার স্পষ্ট পথ তথা উত্তরণের পরিণতি অনুপস্থিত। কিন্তু তার কিছু সূত্র আছে।

আলোচ্য উপন্যাসে যে ভালোমানুষ বাড়িওয়ালাটিকে পাওয়া যায়, সে চায় নিজের এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে, তার বস্তিবাসী প্রজাগুলিকে নিয়ে। তার মুখেই জানা যায়, "...এটা আমি পাকা বাড়ি করব, ইটের গাঁথনি আর ছাদ দিয়ে। হাঁ তার আগেই জলকল আর পায়খানা আমি করে ফেলব, কী রকম হবে?"[৩] সে আরও বলে "এই এদেরি আমি রাখব,

যারা এখনও আছে। আমি তো আর ছিঁচকে চোর বাড়িওয়ালা নই, বিরিজমোহনও নই, ...।"৪ এটি আসলে মানুষের আত্মবিকাশের চাহিদা। তার উদ্দেশ্য কীভাবে এই নরকের ন্যায় বস্তিটিকে এক ভদ্রস্থ রূপ দেওয়া যেতে পারে। সে একটি ছাদ দেওয়া বড়ো পাকা বাড়ি করতে চায়, যেখানে নির্দিষ্ট পরিচ্ছন্ন শৌচালয় থাকবে, যেখানে তার প্রজারা ঘরের মতো ঘর পাবে। কিন্তু তার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। সে আপন-ভোলা একজন লোক। সে সকলের সর্দার সেজে থাকতে চায়, কিন্তু সকলের উপর সর্দারি করা তার আর হয়ে ওঠে না। এখানে পদ-মর্যাদার নিরিখে সে অন্যান্য বস্তিবাসীদের কাছে উচ্চবর্গ। কিন্তু জমিদার বা বড়ো বাড়ির মানুষদের কাছে সে নিম্নবর্গই। কারণ সেও একজন বস্তিবাসী। তাকে তার সমপদের আরেক বস্তির বাড়িওয়ালা বিরিজমোহনও ঠাট্টা করে, কারণ তার প্রজাদের প্রতি উদারতা আর কাঁচা বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে বিরিজমোহন নিজে ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তার সর্বস্ব আত্মস্মাৎ করতে চায়। আর সে এমনই নির্বোধ যে বস্তিবাসীর কাছে নিজের রাশ ধরে রাখার নাটক করলেও, আসল জায়গায় সে একেবারে পরাজিত, ক্ষমতাসীন, অর্থলোলুপ, ভয়ানক প্রতিপক্ষের কাছে। সে যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে আর নিজে সচেতন থেকে সময় মতো নিজের বস্তির পাকাপাকি মালিকানা নিজের নামে করে নিতে পারতো নতুন জমিদারের ফাঁদে পা না দিয়ে, তবে উপন্যাসের শেষে তার বস্তি হাতছাড়া হওয়ার যে করুণ পরিণতি তা ঘটতোই না। অর্থাৎ, নিম্নবর্গ তখনই তার উত্তরণ ঘটাতে পারবে, যদি সে তার প্রতি উচ্চবর্গের ছল-চাতুরীকে ধরে ফেলতে পারে, সময় মতো। তা না হলে সে চিরকাল বঞ্চিত আর অবহেলিতই হতে থাকবে উচ্চবর্গের কাছে। আর উক্ত উপন্যাসেও ঠিক তেমনই ঘটেছে ভালোমানুষ বাড়িওয়ালার সঙ্গে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোবিন্দচন্দ্র শর্মা গ্রাম থেকে শহরে আসে কাজের সন্ধানে। ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে সে এসে হাজির হয় নয়া সড়কের পাশের সেই বস্তিতে। প্রথমে বস্তির সকলে তাকে চোর সন্দেহ করলেও, পরে তার সঙ্গে কথোপকথনে সকলের তাকে পছন্দ হয় এবং বাড়িওয়ালাও তাকে থাকতে দেয় বস্তিতে ও তাকে বহাল করে বস্তিবাসীর রাঁধুনির কাজে। সে আরেক বস্তিবাসী কালোর ঘরে জায়গা পায়। গোবিন্দের পূর্ব কিছু কাজের বর্ণনায় সকলে মজার ছলে তাকে 'ফোর টুয়েন্টি' বলে সম্বোধন করে। তাতে সেও রাগ করে না। সে এই বস্তির নোংরা পরিবেশে প্রথমে অসুবিধা বোধ করলেও পরে এই মানুষগুলির উত্তরণের পথের সন্ধন করতে থাকে। আসলে এই ফোরটুয়েন্টি লোকটিই নিম্নবর্গের উত্তরণের সত্তা স্বরূপ ভূমিকে নিয়ে এই উপন্যাসে। এই বস্তির মালিক উত্তরণ তো চেয়েছিল নিজ অবস্থা থেকে, কিন্তু তার পথ সে জানতো না। অন্যদিকে বস্তির বেশিরভাগ মানুষগুলি ভুলেই গিয়েছিল যে তারা নিজ অবস্থা থেকে উত্তরিত হতে পারে, তাই তারা কেবল সমস্যার জটেই আবদ্ধ হতো, সেই জট খুলতে কেউ অগ্রসর হতো না। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র সেই জট খুলতে উদ্যত হয়। একে একে সে অনেক বস্তিবাসীর সমস্যা

সমাধানও করল। তাই তার প্রতি সকলের বিশ্বাসও বাড়তে লাগলো। আর বস্তি মালিকও বস্তির পাকাপাকি মালিকানা পেতে তার সাহায্য ও বুদ্ধি প্রার্থনা করল। সেও আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু সে ব্যর্থ হতে লাগল। তার এই চেষ্টাতে আর সকলের বহু কাজেও সে অন্যমনস্ক হতে লাগলো, চিন্তায় তার ব্যবহারেও এলো পরিবর্তন। তাই সে ধীরে ধীরে সকলের অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠল। সে অপমান তার কাছে শূলের মতো বিঁধতে লাগল আর শেষাবধি যখন ক্ষমতাসীন উচ্চবর্গের দল বস্তির দখল নিতে আসল, তাদের কাছে সে নিজের প্রাণ দিয়ে বস্তির সকলকে বোঝালো সে সত্যিই 'ফোর টুয়েন্টি' নয়। এবার এখান থেকে স্পষ্ট সূত্র পাওয়া যায়, উচ্চবর্গ ভয় পায় নিম্নবর্গের আত্ম-জাগরণকে। তাই তারা দমিয়ে রাখতে চায় নিম্নবর্গের নিজস্ব প্রতিবাদী সত্তাকে। যখন উচ্চবর্গের প্রতিনিধি বিরিজমোহন বুঝতে পারল এই গোবিন্দচন্দ্রই আসলে এ বস্তির মালিকের বুদ্ধি ও সত্তা জাগরণকারী, নিম্নবর্গের মধ্যে প্রতিবাদী সত্তার স্পন্দনকারী, তখন সেই কণ্ঠস্বরকে রুখে খুন করা হল তাকে। এভাবেই উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে ঠিক কোন জায়গায় ক্ষমতাসীন উচ্চবর্গ ভয় পায় নিম্নবর্গকে। ঠিক কখন ক্ষমতা হারানোর লোভ মানুষকে পরিণত করে ভয়ানক কোনো আসুরিক সত্তায়। আসলে উচ্চবর্গের অত্যাচার থেকে বাঁচতে গেলে প্রয়োজন নিম্নবর্গের আপন সত্তার জাগরণের, নিজের অধিকারের লড়াইয়ে নিজের প্রতিবাদের সত্তাকে জাগানোর দরকার নিম্নবর্গের।

উপন্যাসে লোটন বউ নামক একটি বিধবা নারী চরিত্র পাওয়া যায়। তার পতি-বিয়োগ ঘটার পর সে তার দুই দেওর নন্দ আর হরিশকে নিয়ে বস্তির মধ্যেই থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে এসে যায় অসামাজিক যৌনতার সম্পর্ক। সেই বউকে নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকতো, এর জন্য সকলে লোটন বউকেই দায়ী করেছে। সকলের সামনে লোটন বউও তাদের ঘর থেকে বের করে দিত, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তারা ঘরে প্রবেশাধিকার পেত। অবাধ যৌন সংসর্গের ফলস্বরূপ লোটন বউ হয়ে পড়ে গর্ভবতী। সে সন্তান কার সে নিয়েও ভাইয়ে ভাইয়ে হাতাহাতি হলে লোটন বউ বলে, সে সন্তান তাদের তিনজনের। কিন্তু এ পরিণতি সমাজ মেনে নেয়নি প্রথমে, বস্তিবাসী জীবনে অতি সহজেই একটি ভোজের মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধান করা হয়। এখন প্রশ্ন হল, এক্ষেত্রে কি সত্যি লোটন বউই পুরোপুরি শারীরিক ক্ষুধা মেটাতেই নন্দ-হরিশকে প্রশ্রয় দিয়েছিল? আসলে লোটন বউ ছিল নিঃসন্তান নারী। তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল দেওররাই। তাই তাদের শারীরিক ক্ষুধার শিকারও হয়তো অসহায়ভাবেই হতে হয়েছিল লোটন বউকে। সে বাইরে থেকে অত্যন্ত কঠোরও হয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে পরিস্থিতির কবলে সে আর্থিক নির্ভরতার দিক থেকে হরিশ-নন্দের নিম্নবর্গ। কিন্তু এতো কিছু পেরিয়েও তার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল মাতৃহৃদয়, সে যখন বুঝতে পারছিল তার গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হতে পারে হরিশ-নন্দের দ্বারা, তখন সে বস্তি ত্যাগ করে। আর সে ভাবে "লোটন বউ তো বাচ্চাখাগী বেড়াল নয়।"[৫]

কিন্তু যে মনের জোরে নিজের অবস্থার উত্তরণ সে সমাজ বহির্ভূত সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর করল, তা সে আগেও করতে পারতো। আর সেক্ষেত্রে তার চরিত্রেও কোনো দাগ আসতো না। অর্থাৎ, পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ নয়, পরিস্থিতির সঙ্গে শক্ত মনে মোকাবিলাই উত্তরণের উপায়।

আবার অন্য দিকে ফুলকি বলে একটি মেয়েও ছিল দেহ ব্যবসায়ী। তাকে বস্তিবাসী প্রেমযোগিনী নাম দিয়েছিল। তাকে কালো অত্যন্ত ভালোবাসতো। তার সঙ্গে বস্তির অনেকেই তার প্রতি মোহগ্রস্ত ছিল। কিন্তু নগেনকে সে অপদস্ত করে মিলের সাহেবের দ্বারা। সাহেবের স্ত্রী না থাকার সুযোগে সে প্রবেশ করে সাহেবের অন্দরমহলে নিজ ভাগ্য—নিম্নবর্গের গ্লানি ঘুচিয়ে উচ্চবর্গের গৌরব লাভ করতে। কিন্তু তার প্রতি নেশা মিটে যাওয়ায় ও সাহেবের স্ত্রী ফেরত এলে সাহেব তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কালোই কিন্তু শেষ অবধি তার পাশে ছিল। আসলে নিম্নবর্গের উত্তরণের পথ হওয়া উচিত সৎ উপায়ে নিজ অধিকার আদায় করে। অসৎ উপায়ে উচ্চবর্গের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে নিজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে গেলে তার অবস্থা হয় ফুলকিরই মতো।

মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতা হল কল্পনা। যা সে বাস্তবে লাভ করতে পারে না, তা সে ছুঁয়ে ফেলতে চায় নিজের কল্পনার জগতে। সেখানেই যেন তার অসীম সুখ লুকিয়ে আছে। তাই বাড়িওয়ালাও তার কল্পনার জগতে বস্তির বদলে এক উন্নত জনবসতি গড়ে তুলতে চেয়েছে। আবার, উপন্যাসে একটি জরাগ্রস্ত মৃত্যু পথযাত্রী শিশুকে পাওয়া যায়, যে অসহ্য একঘেয়েমি গান সহ্য করতে পারে না, যে তার মায়ের উপর বাবার অত্যাচার সহ্য করতে পারে না। এসবের জন্য সে হয়ে ওঠে একেবারে মত্ত ষাঁড়ের মতো পাগলপারা। তাকে তখন শান্ত করার জন্য তার মা একটিই উপায় অবলম্বন করে, তা হল তাকে তার কল্পনার ভাবজগতে প্রবেশ করানো। সে কল্পনায় ভাবতে থাকে সেও নাকি সাহেবের মতো মেমসাহেব বিয়ে করবে, বিদেশ গিয়ে কাজ শিখবে, ঘোঁচাবে তার মা, ভাই-বোনেদের দুঃখ। কিন্তু এসবই কল্পনা। এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। আসলে এটি হল নিম্নবর্গের উচ্চবর্গের অনুকরণের দ্বারা তাদের পর্যায়ে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা। আর এই আকাঙ্ক্ষাকেই যদি মনোবল, শারীরিক বল এবং সঠিক বুদ্ধির দ্বারা কাজে লাগানো যায়, তাহলে নিম্নবর্গের উত্তরণ ঘটা সম্ভব। কিন্তু বাড়িওয়ালা নিজের বস্তির আইনি কাগজপত্র সম্পর্কে যেরূপ নির্বুদ্ধিতা ও উদাসীনতা দেখিয়েছেন, তাতে তার যেমন উত্তরণ ঘটেনি, তেমনি জরাগ্রস্ত ছেলেটির উত্তরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তার শারীরিক ব্যধি। অর্থাৎ, নিম্নবর্গের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চাই সঠিক বুদ্ধি, মনোবল, পরিশ্রম, শারীরিক সক্ষমতা, নিজ অধিকার বোধ সম্পর্কে সচেতনতা প্রভৃতি।

আবার গণেশ নামক একটি চরিত্র, সে ছিল নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু তার স্ত্রীর অসুখে সে হয়ে পড়ে কর্মবিমুখ আর সে দিনরাত স্ত্রীর মোহতেই ডুবে থাকে। এতে

তাদের সাংসারিক অনটন যেমন বেড়েছিল, তেমনই ঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তার স্ত্রী হয়ে পড়ছিল আরও অসুস্থ। এসব থেকে মুক্তির পথ সে বের করতে পারছিল না। তখন গোবিন্দচন্দ্র তার দায়িত্ব-কর্তব্য ও আত্মবলের জাগরণ ঘটায়। এতে সেও হয়ে পড়ে কর্মমুখী ও তার স্ত্রী দুলারী বউও হয়ে ওঠে সুস্থ। কিন্তু কোনো কিছুই অতিরিক্ত পর্যায়ে ভালো নয়, তাই গণেশ উচ্চবর্গের সঙ্গে নিজ গোষ্ঠীর অধিকার লাভের সরাসরি সংঘাতে নামলে উচ্চবর্গ তাকে দমন করতেই চেয়েছে। এক্ষেত্রে গণেশের মনের প্রতিস্পর্ধা কাজ করলেও কাজে লাগাতে পারেনি তার বুদ্ধিকে, তাই তার হাজতবাস হয় আর তার স্ত্রী পড়ে বিপাকে। আসলে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের ক্ষমতা আদায়ের লড়াইয়ে যেমন দরকার সাহস ও আত্মবলের তেমনই দরকার পরিস্থিতি অনুসারে বুদ্ধিবলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। নইলে পরিণতি এমনই হয়।

বাস্তবিকপক্ষে উপন্যাসে জানা যায় যেমন স্বার্থসন্ধানী আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চবর্গের কথা, তেমনই তার পাশাপাশি পরিচয় মেলে সহৃদয় এক ব্যারিস্টারেরও। গোবিন্দচন্দ্র যখন বস্তি মালিকানার মকোদ্দমাটি নিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়ে, তখন সে তাদের পক্ষের উকিলের পরামর্শে পৌঁছোয় এক ব্যারিস্টারের নিকট। সেই ব্যারিস্টার বিনা পারিশ্রমিকেই গরিব মানুষের পাশে থাকেন। তিনি গোবিন্দদেরকেও যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। কিন্তু শেষরক্ষা করা যায়নি। কারণ বস্তি মালিক নিজে নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে পারেননি সময় মতো। গোবিন্দ যখন ব্যারিস্টারের কাছে পৌছোয়, তখন জল এমনিই অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছিল। কারা যেন সেই বস্তির চারপাশে হঠাৎই ময়লার স্তুপ এনে জড়ো করে এক রাতে। এ কাজ যে ক্ষমতালোভী উচ্চবর্গের, তা বুঝতে আর বাকি থাকে না। কারণ পরের দিন মিউনিসিপালিটি হেলথ অফিসার ও স্যানিটারি অফিসারের বস্তির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট বানাতে আসার কথা ছিল। সেই রিপোর্ট কোর্টে গেলে কোনোমতেই আর ভালোমানুষ বাড়িওয়ালাটি বস্তি-মালিকানার সেই মামলা জিততে পারতো না। আর হয়েও ছিল তাই। সমাজের স্বার্থপর উচ্চশ্রেণি কখনোই নিজে থেকে এই সমস্ত শ্রমজীবী নিম্নবর্গীয়দের মান-মর্যাদা সহজে দিতে চায় না। বরং, বারে বারে এরা সচেষ্ট হয়, এই নিম্নবর্গীয়দের প্রান্তিকতা ফুটিয়ে তুলতে, সমাজে এদের নিম্ন অবস্থান চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে। নিম্নবর্গীয়দের নিজেদের সমস্তরে এরা কখনোই ভাবতে পারে না। এর কারণ হল সমাজে প্রচলিত নিম্ববর্গ-উচ্চবর্গের সম্পর্কের ধারণা এবং নিজেদের ইগো। কিন্তু এই নিম্নবর্গীয়রা যদি নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে চায়, তবে সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তবে একজোট হয়ে এই উচ্চবর্গদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, নিজেদের অবস্থান, ভূমিকা নিজেদেরকেই বুঝিয়ে দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় সমাজের এ সমস্ত ব্রাত্য মানুষদের প্রান্তিকতা তখনই ঘোচানো

সম্ভব, যখন তারা নিজেরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে, বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে উচ্চবর্গের চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করতে পারবে। জাগরণ ঘটাতে হবে নিজের আত্মসম্মান বোধের। অনেক বুদ্ধিজীবীরা, সহৃদয় মানুষেরা হয়তো এদের পাশে থাকেন, কিন্তু এদের নিজেদের লড়াই নিজেদেরই লড়তে হবে, নিজেদের কথা নিজেদেরই বলতে হবে। উচ্চবর্গ সাধারণত নিম্নবর্গের উত্তরণ, সত্তার জাগরণ ভালোভাবে দেখতে পারে না, তাই তারা কৌশলে এদের সত্তার জাগরণ রোধে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। উচ্চবর্গ চায়, নিম্নবর্গের নিজস্ব সত্তা, অস্তিত্ব, ইতিহাস, অবদান মুছে দিয়ে তাদের চিরকাল প্রান্তিক করে রাখতে। কিন্তু, সেখানেই সচেতন হতে হবে নিম্নবর্গকে, নিজের অধিকার, নিজের মর্যাদা অর্জন করতে হবে।—এ হয়তো স্রষ্টার সৃজন-ধর্মের অন্তর্নিহিত জীবনদর্শন। প্রশ্ন থাকতেই পারে, লেখক কি সাবলটার্ন সম্পর্কে সচেতন থেকেই উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন, নাকি জীবন-অভিজ্ঞতা ও জীবন বোধের প্রতিফলন 'বি. টি. রোডের ধারে'? যাই হোক না কেন পাঠক তো এখান থেকে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের এই অবস্থানিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতেই পারে। এখানেই উপন্যাসের গুরুত্ব।

**তথ্যসূত্র:**


১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস, নিম্নবর্গের ইতিহাস, সম্পা. গৌতম ভদ্র, কলকাতা, বইপাড়া পাবলিকেশনস ১৯৯৮, পৃ: ১

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৩, পৃ: ৯

৩. সমরেশ বসু, বি. টি. রোডের ধারে, কলকাতা, অণিমা প্রকাশনী, ১৯৬৩, পৃ: ৪১

৪. তদেব, পৃ: ৪১

৫. তদেব, পৃ: ১৩৭

# শ্রমিকভাবনা : বি টি রোডের ধারে

**খাদিজা খাতুন**

**সূচক শব্দ :** চটকল, শ্রমিক, বস্তিজীবন, মন্বন্তর, লোলুপতা, জীবনসংগ্রাম, অন্ত্যজ।

**সারসংক্ষেপ :** 'বি টি রোডের ধারে' উপন্যাসটিতে শ্রমিকজীবনের কথা বলেছে। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে শ্রমিকদের কষ্টের জীবন, সেই সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের চিত্র পরিস্ফুটিত। উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দ। গোবিন্দ চরিত্রটি ঔপন্যাসিকের মানসপুত্র। বস্তুত নায়ক চরিত্র অবলম্বনেই কথাসাহিত্যিক তাঁর জীবন- জিজ্ঞাসাকে রূপায়িত। আলোচ্য উপন্যাসে গোবিন্দ এরকমই এক নায়ক চরিত্র, যার অতীত জটিলতম উৎকেন্দ্রিকতার পথে নিক্ষেপ করে তাকে। আবার অন্য এক জটিল জীবন পরিবেশ আশ্রয় দেয় তাকে। বস্তিজীবনের যে চিত্র সমরেশ বসু আঁকলেন, সেখানে নায়ক হিসেবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেতার চরিত্র অঙ্কন করেননি। তাঁর নায়ক মাটি থেকে তুলে আনা। যার সত্তা জুড়ে আছে জটিলতা। উপন্যাসের শেষে দুলারীর হাতে গোবিন্দর মৃত্যু হয়েছে। বস্তিবাসীর মানসিক উত্তরণ জীবনকে, তার সংগ্রামকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। 'বি টি রোডের ধারে' উপন্যাসে তাই জীবনের উপন্যাস, সংগ্রামের শিল্পিত রূপ। সংগ্রাম করা মানুষের ধর্ম, সংগ্রাম করেই জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে হয় এই কথাই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন।

**মূলবক্তব্য :**

বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী সমরেশ বসু ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাশিল্পী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১ ডিসেম্বর, ১৯২৪ সালে। জন্মসূত্রে নাম ছিল সুরথনাথ বসু। তিনি 'কালকূট' এবং 'ভ্রমর' ছদ্মনামে একাধিক সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্য রচনার প্রধান উপাদান হল সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবন যন্ত্রণা। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি 'বি টি রোডের ধারে' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোবিন্দ সম্পর্কে একথাগুলি বলেছিলেন। 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করেছি কীভাবে কৃষিজীবী মানুষ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে চটকল শ্রমিকে। 'বি টি রোডের ধারে' সেই চটকল শ্রমিকদের বাস্তব জীবনচিত্র। নয়নপুরের মাটির গ্রামজীবন থেকে 'উত্তরবঙ্গে'র কৃষকজীবন এবং তারপর 'বি টি রোডের ধারে' উপন্যাসে শ্রমিকজীবনের বাস্তব সত্যে প্রবেশ করেছেন সমরেশ বসু। বস্তি ও তার জীবনের দলিলরূপে চিহ্নিত হতে পারে এই উপন্যাসটি। উপন্যাসের শুরুতে বস্তির বর্ণনা লেখক দিয়েছেন এইভাবে—

"বস্তিটাকে ঘর বলে চিনতে না পারলে, মনে হতে পারে, ওটা রাবিশেরই স্তূপ..... খোলা ছাওয়া চালা প্রায় মাটি স্পর্শ করেছে। মাথা হাঁটুতে ঠেকিয়ে বেরুতে হয় এখান থেকে। যেন এপার থেকে সমস্ত বস্তিটা ঝপ করে মাটিতে পড়ে প্রায় গেড়ে বসেছে। অন্ধকারে মনে হয় কালো এবং শেওলা ধরা খোলা সাজানো একটা স্তূপবিশেষ।"[১]

এই বস্তিকেন্দ্রিত জীবন ও তার মানুষ, তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, ভালোবাসা, ঝগড়া, মারামারি, যৌন আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, মৃত্যু এসবের ইতিবৃত্ত হল 'বি টি রোডের ধারে' উপন্যাস। আর এই সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে আছে ফোর টুয়েন্টি ওরফে গোবিন্দ। বস্তুত নায়ক চরিত্র অবলম্বনেই যেকোনো কথাসাহিত্যিক তাঁর জীবন- জিজ্ঞাসাকে রূপায়িত করতে প্রয়াস পান। আলোচ্য উপন্যাসে গোবিন্দ এরকমই এক নায়ক চরিত্র, যার অতীত জটিলতম উৎকেন্দ্রিকতার পথে নিক্ষেপ করে তাকে। আবার অন্য এক জটিল জীবন পরিবেশ আশ্রয় দেয় তাকে। বস্তিজীবনের যে চিত্র লেখক আঁকলেন, সেখানে নায়ক হিসেবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার চরিত্র অঙ্কন করেননি। তাঁর নায়ক মাটি থেকে তুলে আনা। যার সত্তা জুড়ে আছে জটিলতা। নায়কত্ব দিয়েছেন বস্তিবাসীদের জীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়া এক পুরুষকে। বস্তিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে গোবিন্দ। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর জীবন-জীবিকার সংঘাতজনিত প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল হল 'বিটি রোডের ধারে' উপন্যাস। বস্তির মানুষগুলো এবং তাদের জীবন ও জীবিকা গভীর মানবিকতায় বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন যন্ত্রটা। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি জীবন্ত। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষগুলি তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্র জুড়ে আছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

"খেতে বসেছে সকলে। জায়গাটা অন্ধকার, একটি মাত্র রেশ এসে পড়েছে রান্নাঘরের লক্ষটার।... সকলেই প্রায় চুপচাপ খাচ্ছে। খাওয়ার, জিভ নাড়ার ও হাত চাটার হুসহাসের সঙ্গে কাঁচা মেঝেয় থালার ঠকঠক শব্দের এক বিচিত্র ঐকতান উঠেছে। মাঝে মাঝে কেউ কেশে উঠছে বা কথা বলে উঠছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এখানে বুঝি কোনও মানুষ নেই, শ্মশানের বটতলার ঝপসিতে একদল প্রেত নিঃশব্দে ফলারে বসেছে।"[২]

বাংলা সাহিত্যে সমরেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা, আন্তরিক সততা, সমাজের নীচুতলার মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনিঃশেষ ভালোবাসা তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে স্থায়িত্ব দান করেছে। সমাজসচেতন শিল্পী সমরেশ বসু তাই লেখেন:

"সত্যি, ছাঁটাই যেন শরৎকালের মেঘের মত। কখন আসবে, কখন যাবে, আর কি তার কারণ বুঝতে না পেরে যেমন হঠাৎ ফ্যাসাদে বিব্রত মানুষে- জানোয়ারে ছুটোছুটি আরম্ভ করে, ইটিাইয়ের আচমকা মারটাও আসে তেমনি।"[৩]

বহু চরিত্র, যার অধিকাংশই চরিত্রের স্কেচমাত্র এবং অজস্র ঘটনার সমাবেশ 'বি টি রোডের ধারে' উপন্যাস। একটি চটকল বস্তির অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলহীন জীবনযাপন, তাদের জীবনের গ্লানি, প্রেম, হতাশা, আলো, অন্ধকার, হিংসা, উদাসীনতা, কামনা-লোলুপতা ইত্যাদি মুখ্য স্থান পেয়েছে উপন্যাসে। সেই সঙ্গে বস্তির উচ্ছেদ এবং একটি মানবতাবাদী, সংগ্রামী মানুষের হত্যার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য: "ইহাদের জীবন একটু অসম, অস্বাভাবিক

ছন্দের দোলায় অস্থির ও অশান্ত। ইহাদের হাসি-কান্না, আমোদ- বাসন, ভালোবাসা বিরাগের মত্ত আতিশয্য ও মুহুর্মুহু পরিবর্তশীলতা, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া- বিবাদ-মিতালীর দ্রুত ওঠানামা, খেয়ালের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে অতর্কিত মোড় ফেরা এবং অপরিণতবুদ্ধি শিশুর ন্যায় এক বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের নিকট আত্মসমর্পণ প্রবণতা-এ সমস্তই গণজীবনের এক নূতন বিন্যাসরীতি, মানবিক বৃত্তিসমূহের এক অজ্ঞাতপূর্ব কক্ষাবর্তনের সূচনা করে।" এখানে জীবনের রুগ্ন, শীর্ণ, বঞ্চিত রূপটি বড় করুণভাবে আত্মপ্রকাশ করে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোবিন্দ শর্মা। একদিন সে ছিল আগুনের মত মিস্তিরি। মুখ বুজে মার সহ্য করার মত কাপুরুষ সে ছিল না। কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল না, ছিল হৃদয় আর সাহস। কারণ সে জানে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে গেলে সাহসিকতার পরিচয় না দিলে চলা মুশকিল। শিক্ষার চেয়ে বেশি ছিল আবেগ। উপন্যাসের শুরুতে বস্তির মানুষগুলোর অন্ধকার ঘেরা জীবনের মাঝখানে একান্ত সাধারণ একজন হিসেবেই তার আবির্ভাব। মাটির গন্ধ তার গায়ে লেগে আছে। গোবিন্দ সম্পর্কে সমরেশ বসু বলেন: 'বয়সে জোয়ান, একমাথা বড় বড় চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মুখের ছাদটি লম্বাটে, কোলবসা চোখ দুটোতে সরল আর হাসি-হাসি ভাব মাথা। গায়ে মাত্র একটা গলাবন্ধ হলুদে (গেঞ্জি), কাপড়টা হাটু থেকে একটু উপরে তোলা। একটা চটের থলি লাঠির ডগায় বাঁধা।'

গোবিন্দ তার জীবনে অনেক জায়গায় ঘুরেছে, অনেক মানুষ দেখেছে। ডায়মন্ডহারবার থেকে তিনসুকিয়া, নোয়াখালি থেকে পশ্চিমের কয়লাখনি, মহারুদ্র মন্থন্তর পার হতে হতে ইছামতীর পাড়, ইটিন্ডেঘাট পার হয়ে সে এসেছে বি টি রোডের ধারের এই বস্তিতে। সব হারিয়ে আজ সে এই অনামা বস্তির মানুষগুলোর সামনে আগন্তুক। বস্তির লোকেদের কাছে তার পরিচয় হয় 'ফোর টুয়েন্টি' নামে। বস্তিতেই তার কাজ জুটে যায়। বস্তির গোষ্ঠী রান্নাঘরের রাঁধুনির কাজ। প্রথমে গোবিন্দ নিরাসক্ত স্রষ্টা হয়ে দূর থেকে বস্তিবাসীদের দেখছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে নিজের অজান্তেই বস্তিবাসীদের একজন হয়ে উঠেছিল। বস্তির প্রতিটি মানুষের ভালো- মন্দ, হতাশা-আশ্বাস, দুঃখ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। বস্তির রান্নাঘরে কালোর সঙ্গে গোবিন্দর বন্ধুত্ব হয়। ক্রমশ গোবিন্দ একে একে চিনে নেয় লোটন বউকে, তার মৃত স্বামীর দুই ভাই হরিশ আর নন্দকে। খাবার সময় বস্তির মানুষগুলোকে তার মনে হয় প্রেতের মতো। ফুটে ওঠে মন্বন্তরের ছবি। এভাবেই উপন্যাসে ব্যক্তিক প্রসঙ্গে সামাজিক প্রসঙ্গের ছায়াপাত ঘটে। সদিবুড়ি, বাজিকর, ফুলকি এদের সঙ্গেও গোবিন্দর ঘনিষ্ঠতা হয়। সদিবুড়ির কথায় বাড়িওয়ালার অতীত জানা যায়। গোবিন্দ জানতে পারে কালো ফুলকিকে ভালোবাসে। তাই সবার অলক্ষ্যে রাতে অন্ধকারে সে ভাত নিয়ে ফুলকিকে খাওয়ায়। এছাড়া আছে এক মা ও তার স্বপ্নাচ্ছন্ন এক ছেলে। যে বিলেত গিয়ে মেমসাহেব বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে। গোবিন্দর সূত্রেই আমরা চিনতে পারি রুগ্ন দুলারী ও তার স্বামী গণেশকে। এরা জীবনকে উপেক্ষা করে অনিবার্য

মৃত্যুর দিকে নিজেদের ঠেলে দেয়। কিন্তু গোবিন্দ তাদের মনে আশার সঞ্চার ঘটায়, জীবনের মধ্যে নিয়ে আসে তাদের। সে দুলারীকে অন্ধকার ঘরের বাইরে নিয়ে আসে, গণেশকে কাজে পাঠায়।

কালোর প্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে গোবিন্দর মনে পড়ে যায় তার অতীত জীবনের কথা। ফুলকি ও কালোর প্রেমের সূত্রে ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু গোবিন্দর অতীতকে তুলে আনেন নিপুণ কৌশলে। এদিকে বস্তির মালিকানা নিয়ে উপস্থিত হয় বিবাদ। গোবিন্দ বাড়িওয়ালাকে উকিল ধরার পরামর্শ দেয়। বিরিজমোহন থানার বড়বাবু ও জমিদারের বন্ধু, বাড়িওয়ালাদের সর্দার-সে এই বস্তির দখল নিতে চায়। গোবিন্দ এই গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে। সে যোগাযোগ করে তার পুরোনো পরিচিতদের সঙ্গে। ইতিমধ্যে চটকলে ছাঁটাই-এর নোটিশ পড়ে। গোবিন্দ অস্থির হয়ে ওঠে। লোটন বউ পোয়তি হয় (জীবন থেমে থাকে না), ছাঁটাই বস্তিতে অস্থিরতা আনে। বস্তিতে মিটিং বসে, গোবিন্দ সেখানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এমন সময় নগেন এসে নালিশ জানায় যে, ফুলকির কথায় সেলসাহেব তাকে কোতল করার ভয় দেখিয়েছে। নগেন ফুলকি সম্পর্কে আরও অনেক অভিযোগ করে। এমন সময় সেখানে ফুলকির আগমন ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে নগেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফুলকিকে বাঁচাতে গোবিন্দ নগেনকে ঘুষি মেরে সরিয়ে আনে। রাতে আবার নগেনের আঘাতে প্রলেপও দেয় গোবিন্দই।

বস্তি থেকে লোটন বউ পালায়, দুলারী কলে হাজিরা দেয়। একদিন দুলারী অভিযোগ করে গোবিন্দই নাকি উসকানি দিয়ে গণেশকে জেলে পাঠিয়েছে। কারণ গোবিন্দ তার সঙ্গে প্রেম করতে চায়। রুগ্ন ছেলেটির মৃত্যুর জন্যও দায়ী করে গোবিন্দকে ছেলেটির মা। গোবিন্দ এই অবস্থায় বস্তি থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এদিকে বিরিজামোহন বস্তির চারপাশে ময়লা ফেলে হেলথঅফিসারকে খবর দেয়। গোবিন্দ শেষ চেষ্টা করে অন্ধ ব্যারিস্টারকে ধরে বস্তি উচ্ছেদ মামলা জিততে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বস্তির জমি খালি করে দেওয়ার ঘোষণা এবং ঘর ভাঙার আচমকা আক্রমণে গোবিন্দ দিশাহারা হয়ে পড়ে। চারদিকে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দুলারীর ছুরির আঘাতে গোবিন্দ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। দুলারী হাহাকার করে ওঠে। চারদিক নিস্তব্ধ। কালবৈশাখীর আভাসে আগামী দিনের সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি করে উপন্যাস শেষ হয়। সমরেশ বসু বি টি রোডের ধারে উপন্যাসের অন্ধকার ভগ্নস্তূপের মধ্যে মানুষের স্বপ্ন ও ভালোবাসার ছবিগুলি আঁকতে চেয়েছেন। অন্ধকারকেও অবজ্ঞা করেননি। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্য থেকেও যে আলোর ঝলকানি ফুটে বেরিয়েছে তাই এই উপন্যাসকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এ উপন্যাসে যে বাড়িওয়ালা এমন বাড়িওয়ালা সচরাচর চোখে পড়ে না। সে তার বস্তিতে রামরাজ্য কায়েম করতে চায়। সে স্বপ্ন দেখে এই বস্তির জানোয়ারসম মানুষগুলোকে মানুষ করে তোলবার। সে নিজেকে এদের অভিভাবক

ভাবে, তাই কখনো সে তাদের ধমকায়, আবার কখনো বন্ধুর মতো মেশে। সে স্বপ্ন দেখে বস্তির কাঁচা ঘরগুলোকে পাকা করার, ড্রেন করার, বিদ্যুৎ ও জল আনার। এ উপন্যাসে দুলারীও একদিন স্বপ্ন দেখেছিল গণেশকে নিয়ে। কিন্তু গণেশ জড়িয়ে পড়ে ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনে। গণেশ গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যায়। গণেশের কারণেই দুলারীর স্বপ্নভঙ্গ হয়। প্রতিক্রিয়ায় দুলারী গোবিন্দকে হত্যা করে। ফুলকিও একদিন ঘর বাঁধবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রেমিকের হাত ধরে পথে বেরিয়েছিল। তার স্বপ্ন ভেঙেছে। আবার কালোর সাহচর্যে সে নতুন করে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু জীবন তাকে আর সুযোগ দেয়না। আর গোবিন্দর স্বপ্ন অনেক। এতগুলো মানুষের স্বপ্নকে গোবিন্দ বাঁচাতে চায়, বস্তি উচ্ছেদ আটকাতে চায়। এভাবেই এই উপন্যাসে বহু স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী জেগে ওঠে।

গোবিন্দর মৃত্যু আপাতভাবে স্বপ্নের অপমৃত্যু। কিন্তু আসলে এই মৃত্যু নতুনভাবে জন্ম দিয়ে যায় আর এক স্বপ্নের। সে প্রাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, মানুষ যদি সংঘবদ্ধ না হয় তাহলে এভাবেই তাদের প'ড়ে প'ড়ে মার খেতে হবে। গোবিন্দর ছুরিকাহত হয়ে পড়ে যাবার পরই একটা অদ্ভুত গুলতানি ওঠে বস্তিবাসীর মধ্যে। এই অংশটি সমরেশ বসু অননুকরণীয় ভাষায় বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

"তারপর সব নিস্তব্ধ। আস্তে আস্তে একটা অদ্ভুত গুলতানি উঠতে লাগল ভিড়ের মধ্যে। উঠোনের বাইরে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে ভিড়। আকাশের কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা গুলতানি হু-হু করে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে দিগন্তে।"[৪]

মহাদিগন্তে আগামী দিনে লড়াই-এর স্বপ্ন দেখেন ঔপন্যাসিক; সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী লেখকের মতোই। ঔপন্যাসিকের ভেতরকার লড়াই সঞ্চারিত হয়ে যায় উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে। বাড়িওয়ালা তার জীবনের শেষ সম্বল তিনশ টাকার পুটুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'কার জন্য এসব! আমি বেইমান।' দুলারী তার ঘরে কেঁদে উঠে বলে, 'আমার কলিজার দুটো পাশ; একটা জেলবন্দী আর একটা আমি আপনাহাতে টিপে দিয়েছি, শেষ করেছি।' রুগ্ন ছেলেটির মা বলে, "আমি তোকে যম বলেছি, আমার সোনার বাছা। তোর যম যেন কোনদিন রেহাই না পায়।' বস্তিবাসীর এই মানসিক উত্তরণ জীবনকে, তার সংগ্রামকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। 'বি টি রোডের ধারে' উপন্যাসে তাই জীবনের উপন্যাস, সংগ্রামের শিল্পিত রূপ। সংগ্রাম করা মানুষের ধর্ম, সংগ্রাম করেই জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে হয় এই কথাই উপন্যাসের শিল্পসুষমা।

**তথ্যসূত্র :**

১) বি টি রোডের ধারে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, ১৯৯৭, পৃ. ২০৬
২) সমরেশ বসু রচনাবলী-১, আনন্দ, পৃ. ২১৮)
৩) বি টি রোডের ধারে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১. আনন্দ, ১৯৯৭
৪) বি টি রোডের ধারে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, ১৯৯৭

# সমরেশ বসুর 'বাথান' ও 'গঙ্গা' উপন্যাস : অন্য কোন সাধনার ফল

দীপ্তি রায়

**সারসংক্ষেপ :**

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর ভিন্নধর্মী উপন্যাস 'বাথান'। এ উপন্যাসে পরিবারকেন্দ্রিক কাহিনি বিন্যাস থাকলেও, গোপজাতির গোষ্ঠীগত জীবনাচরণের প্রতিচ্ছবি প্রতীকায়িত। বাথানকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ তথা গোপজাতির বিশ্বাস, সংস্কার, পেশাগত দায়বদ্ধতা, ডেরার সংহতি  সবকিছুই এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাহিত্যিকের জীবনদর্শনের ফলশ্রুতি হল উপন্যাসটি। এছাড়াও পশুপ্রেমিক গোপ জাতির জীবনযাপনের চালচিত্র নানা কিংবদন্তি, পুরাণের সারাৎসার 'বাথান'। অন্যদিকে, নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস হলেও 'গঙ্গা' উপন্যাসের নির্যাস ও উপস্থাপনা স্বতন্ত্র। মালো সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে 'মাছ মারা' নামেই তারা পরিচিত। মাছমারাদের জীবন জীবিকা, পেশাগত সংকট, পুরাণ, সংস্কার, কিংবদন্তি ইত্যাদি অনায়াসে তুলে ধরেন লেখক উপন্যাসের নানা অধ্যায়ে। এ উপন্যাসের পরিণতিও ঘটে অন্য ভাবে। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চিন্তা ও গোষ্ঠীর বন্ধনমুক্তি  এই দুইয়ের মিশেলে নির্মিত বিলাসের সমুদ্র যাত্রায় শেষ হয় উপন্যাসটি।

**সূচক শব্দ :** ক্ষেত্রসমীক্ষা, গোষ্ঠীচেতনা, লোকসংস্কার, লোকপুরাণ।

**মূলবক্তব্য :** সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) এমন একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক যাঁর সাহিত্যকৃতি অনেকক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতালব্ধ, জীবনসঞ্জাত। তিনি অভিজ্ঞতার অবয়বটিকে কোনো কৃত্রিম কাহিনির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চান না; বরং, এমন এক কথাস্বরের ভাষ্য তিনি দিয়ে যান যা তাঁর অভিজ্ঞতা ও কাহিনির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। বিশেষত 'বাথান' (১৯৮৫) উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই অজানিতপূর্ব জীবন-জীবিকার বিন্যাসের স্বরূপ সন্ধান অনুমিত। এই বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অভিমতটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ - '... এই যে গঙ্গা, বাথান বা টানাপোড়েন ... সমরেশের লেখকের সেই জাতীয় লেখা যেগুলিতে সমরেশ সামাজিক-রাজনৈতিক বা নৈতিক সমস্যার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন জীবনের মুক্তাঙ্গনে। সেখানে জীবনের অনন্যতাই অনুসন্ধেয় - বিষয়গত সেই অনন্যতাতেই উপন্যাসগুলির অসাধারণত্ব।'[১]

'বাথান' (১৯৮৫) উপন্যাস গোষ্ঠীগতভাবে গোপজাতি অর্থাৎ গোপালকদের জীবনালেখ্য। এই উপন্যাসটি রচনার পূর্বে দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে চলেছে প্রস্তুতিপর্ব। ১৯৭৯ সালে নদিয়া জেলার আঁটলে গ্রামে লেখক সমরেশ বাথানের বাগালদের সঙ্গে সময় কাটান। সেই অভিজ্ঞতা লেখকের হৃদয়সঞ্জাত অনুভবে সাহিত্যে রূপ নেয় ১৯৮৪ সালে। গ্রন্থাকারে যা পাঠকের হাতে পৌছায় ১৯৮৫ নাগাদ। এ বিষয়ে সমরেশ বসুর অনুসন্ধিৎসু লেখক মন

ও ক্ষেত্রসমীক্ষাজাত ফলাফল সম্পর্কে জানা যায় অশোকরঞ্জন সেনগুপ্তের বয়ানে।[২] সোমনাথ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে পাওয়া ম্যাপ ও অভিজ্ঞতারসে জারিত হয়ে 'বাথান' হয়ে ওঠে একান্তভাবেই সমরেশ বসুর স্বকীয় কথাভাষ্য। এইভাবেই 'তথ্যবাহুল্য অতিক্রম করে সমরেশ পৌঁছে গেলেন এক জীবন্ত জীবনের প্রত্যক্ষতায়।'[৩]

এই উপন্যাসে গোপগোষ্ঠীর জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। গোপজাতিরা বিশ্বাস করে তারা কৃষ্ণের জীব।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ থেকে গোপজাতির উৎপত্তি —

'কৃষ্ণস্য লোমকূপেভ্যঃ সদ্যো গোপগণোমুনে।
আবিবর্ভূব রূপেণ বেশেনৈব চ তৎসমঃ।।'[৪]

'বাথান' উপন্যাসের গোপরা মনে করে তাদের জীবনে গোধনই সব—

'আমরা হলাম গে যাদব, কথাটা মনে রাখবি। ... ঘর কইত্তে ঘর করি, মাথা গোঁজবার ঠাঁই আছে বটে। কিন্তুন আমাদের জেবনে গো-ধন অতন হল আসল। নিজেদের ঘর থেনে আমাদের গোয়াল ঘর আসল বাথান লিয়ে আমাদের জেবন।'[৫]

এই উপন্যাসে পারিবারিক জীবন, নানা ব্যক্তিগত ঘটনার প্রসঙ্গ আনলেও লেখকের বিষয় বক্তব্যের অভিমুখ ছিল গোপজাতির গোষ্ঠীভাবনা। অর্থাৎ গোপজাতি সামগ্রিক চরিত্র নিয়ে ধরা দেয় এই উপন্যাসে। বাথানের কথা, বাথানের জীবন-ই বারে বারে উপন্যাসে ঘুরে ফিরে আসে।

'গদাধর তার ঠাকুরদার সঙ্গে বাথানে গিয়েছে ছেলেবেলা থেকে। ঠাকুরদা, বাবা, সে নিজে, আর এই তার ছেলে শ্রীবাস, শ্রীবাসের ছেলে পঞ্চানন ... পাঁচ পুরুষ তার চোখের সামনে ভাসছে।... গদাধরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কী বিশাল সেই বাথান। সমুদ্র সে চোখে দেখেনি।... সেই বিশাল গোধন বাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। কালো মেঘের মতো মহিষের দল। তার সঙ্গে সাদা, শ্যামা, রাঙা গোরুর পাল। সেও যেন মেঘেরই মতো।'[৬]

গদাধর এমনই এক সুবিশাল বাথানের স্বপ্নে বিভোর থাকতে চায়। কিন্তু কালের নিয়মে গোষ্ঠীগত সেই বন্ধনে শৈথিল্য আসে। তার ছোট ছেলে গোপাল ময়রা হয়ে ভিন্ন সংসার পাতে।

বাথানকে কেন্দ্র করে গোপজাতি ডেরায় একসঙ্গে থাকা খাওয়া; গোরু-মোষ দোয়ানো, দুধ বিক্রি নিজেদের প্রাণীদের দেখে রাখা- বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কারে মিশে থাকে বাথানের দিনগুলি। গদাধর যেন সমগ্র গোপজাতির প্রতিভূ। তাই পঞ্চার বিকৃত কামনার শাস্তি বিধান করার পর এতটুকু অনুতপ্ত নয় সে। কারণ তার মনে হয়েছিল পঞ্চাকে 'ককনও কোন মা জন্ম দেয় নাই।'[৭] তাই ম্যাজিস্ট্রেট গদাধরকে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত কি না জানতে চাইলে সে অকপটে জানায় সে উপযুক্ত কাজই করেছে — 'আমার মনে ত পাপ ছিল না।

পঞ্চাকে খুন করে আমার মনে কোন দুঃখু কষ্ট হয় নাই, এখনও হয় না। কোন আক্ষেপ ছিল না।"[৮] একই জেদি, একগুঁয়েমি, অপাপবিদ্ধ মন দেখা যায় যদুর ক্ষেত্রেও। জটাহত্যায় যদুও একইভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে। এ যেন শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম সংস্থাপনার চেষ্টা — তার ভক্তদের মধ্যেও সঞ্চারিত।

গদাধর অন্তরে-বাহিরে গোপজাতিসত্তাকে বহন করে তাই গো-দ্বিতীয়ায় গদাধর মন্ত্র উচ্চারণকালে তার আবেগমথিত হৃদয় দ্রব হয় ও অশ্রুবারি ধারায় দু'চোখ ভেসে যায় —'... যিনি লোকপালবর্গের লক্ষ্মীস্বরূপিণী, যিনি ধেনুরূপে সংস্থিতা, যিনি যজ্ঞার্থে ঘৃত বহন করেন, তিনি শমনপাশ ছেদন করিয়া দিউন... আমি গোসমূহ মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকি।'[৯]

'বাথান' উপন্যাসে গোপ গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন— তাদের গোপালনরীতি, সাংস্কৃতিক সত্তা, নানা লোকাচার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে ধরা দেয়। তবে অবশ্যই তাদের গোপালন বৃত্তিই উপন্যাসের একমাত্র উপজীব্য নয়, গোপ জাতিসত্তা ও সংস্কৃতি এখানে প্রধান বিষয়বস্তু। গদাধর এখানে শুধুই গোপ বাথানের সদস্য নয় সে নিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এক চলমান পথিক যে জীবনকে দেখে গোধনের প্রেক্ষিতে, আর চলার পথ বিস্তৃত মাঠ এখানেই উপন্যাসের অনন্যতা।

মাছমারা মালো সম্প্রদায়কে নিয়ে সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) রসগ্রাহী উপন্যাস 'গঙ্গা' (১৯৫৭) উপন্যাসের কথাভাষ্য অনুযায়ী মনসামঙ্গলকাব্যের ঝল্লমল্লদের মধ্যে মল্লই হল মালো সম্প্রদায়। লেখক কখনোই সৌখিনতার আয়াসে তাঁর লেখকসত্তাকে সংকীর্ণ করেন না। তাই এই বিশেষ সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা উপন্যাসের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে তাকে বেছে নিতে হয় নিরন্তর পর্যবেক্ষণ। এবং হালিসহরের রামপ্রসাদ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিমাইচাঁদ অধিকারী ও তাঁর পিতার কাছ থেকে সংগৃহীত বহুবিধ তথ্যেরই অভিনিবেশ বিশ্লেষণেই গড়ে ওঠে 'গঙ্গার' মাছমারাদের জীবন।[১০]

বাংলাসাহিত্যে নদীকে কেন্দ্র করে, মাছমারা বা জেলে সম্প্রদায়কে নিয়ে বহু উপন্যাস লেখা হয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) লেখা 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), তবে 'গঙ্গা' এদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। 'তুমি মারো মাছ, তোমাকে মারেন আর একজন। সংসারের নিয়ম। কুড়ি গণ্ডাটা ব্যতিক্রম, তবে মাছমারাদের কাছে ব্যতিক্রম নয়। তার মরণের লিখন একটু অন্যরকম হয়। যার সঙ্গে তোমার বাস, যে তোমার শ্বাস, সেই মাছের সঙ্গে তোমার মরণের সুতো গাঁথা হয়।...'[১১] এই ভাবনা উপন্যাসে জেলেদের জীবনসূত্রে দেখিয়েছেন লেখক সমরেশ বসু। আর সেই সূত্রেই বিশিষ্ট সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —'নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ 'গঙ্গা'-র মূল চেতনা।'[১২]

উপন্যাসের প্রারম্ভেই সারিবদ্ধ জেলেনৌকার সমাহার। পুবের কেষ্টপুরের খাল গেট

পেরিয়ে নৌকা এগিয়ে আসে। এরপর দুটি নৌকা আসে পুরোখোঁরগাছি ও একটি আসে ধলতিতা থেকে।

'আরো আসছে পেছনে পেছনে। তেঁতুলিয়া, সারাপুল, পুরোখোঁড়গাছি, ফতুল্লোপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর, তাবৎ পুব-উত্তর আর পুব-দক্ষিণ ঠেঙিয়ে আসছে যাবৎ মৎস্যজীবীরা।'[১৩]

উপন্যাসের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে জেলেদের কথাই ছড়িয়ে আছে। তবে, 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) ও 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসের মূলগত কিছু পার্থক্য আছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে একটি অঞ্চলের নদীকে কেন্দ্র করে মালোগোষ্ঠীর জীবন দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে, 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে যে সম্প্রদায়ের পরিচয় রয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীবী, বৃত্তিজীবী মানুষের শ্রেণিচেতনা। সে কারণেই এই উপন্যাসে জেলে সম্প্রদায়ের জাতি-সত্তা-সংস্কৃতির কোনো পরিচয় পাই না। এখানে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের জটিলতা এবং হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপ প্রধান আলোচ্যবিন্দু হয়ে ওঠে। ময়নাদ্বীপের যে চেহারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁকেছেন তা আমাদের মনে আশা বা স্বপ্নকে লালন করে না। বস্তুত দারিদ্র্যে বিপন্ন মানুষগুলি সেখানে গিয়ে আরো রিক্ত থেকে রিক্ততর হয়ে যায়। সামাজিক নিয়ম এবং মূল্যবোধ সেখানে গুরুত্বহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তীর মনে হয়েছে ময়নাদ্বীপে কুবের রাসুদের 'হোসেন মিয়ার প্রজা হতে চলেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও আসলে তারা প্রজা নয় - হয়ে উঠছে শ্রমিক। মাঝি, জেলে, চাষির জীবন ছেড়ে গ্রাসাচ্ছাদন ও একটি ঘরের বিনিময়ে ময়না দ্বীপে জমি চাষ করে সে মজুরিটুকুই পাবে, পাবে না উৎপাদনের অংশ। আসলে সামন্ততন্ত্র ভেঙে বেরিয়ে আসা ধনতন্ত্রের নিয়মগুলিই হোসেন মিয়ার চরিত্রে প্রতিফলিত।'[১৪]

সেদিক থেকে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙে'র (১৯৯৭) সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 'গহিন গাঙে'র পটভূমি বেতনা নদী। জেলেদের জীবনের শোষণ বঞ্চনার প্রত্যক্ষ চিত্র ধরা পড়েছে বিশিষ্ট মালয়ালাম লেখক তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই এর লেখা 'চেম্মীন' উপন্যাসে যা 'চিংড়ি' নামে (১৯৬৫) বাংলা ভাষায় অনুদিত। 'চিংড়ি'র সঙ্গে 'গঙ্গা' উপন্যাসের কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত। 'চিংড়ি'র মতো 'গঙ্গা' উপন্যাসে জেলে জীবনের নানা সংস্কার, শোষণ পীড়ণের ছবি দেখা যায়।

উপন্যাসে পাঁচুর দৃষ্টি দিয়ে জেলেজীবনের নানা বিশ্বাস, সংস্কার, আখ্যান, ইতিবৃত্ত, পুরাকথা বলবার চেষ্টা করেছেন লেখক।

'যদি মাছমারা হও, তবে মাছের পিছে পিছে আসতে হবে। সে জলে, তুমি ডাঙায়। তার মরণ তোমার জীবন। এই নিয়ম। জীবন-মরণের পাশাপাশি বাস।'[১৫]

এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণেই যে পথচলা সেই জেলে জীবনের নানা মুহূর্ত অতুল্য ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন লেখক সমরেশ।

'জলের এমনি যাওয়া-আসা। জীবনের মতো। ... এখন যে লাল দেখছ, এ উত্তরের

গাঙের জল।... কেননা কালনার কাছাকাছি এতক্ষণে এসেছে পাহাড়ী ঠাণ্ডা জল। ঠেলে নিয়ে আসছে জলেঙ্গা জলকে।... যে মাছ আছে বারোমেসে ভাটার তল্লাটে, পাহাড়ী জল তাকেই নিয়ে আসছে তাড়িয়ে। তাই, জলেঙ্গা জল তোমাকে কিছু দেবেই।'[১৬]

এইভাবেই জেলে জীবনের নানা সংস্কারের সাথেও পাঠক পরিচিত হয়। পাঁচু মাছমারাদের সংস্কারকে আমৃত্যু ধরে রাখতে চায়। পঞ্জিকার বিচারের ওপর জেলেদের অগাধ বিশ্বাস। এক কুড়ি দুই বছর বয়সী বিলাস মানতে চায় না। কিন্তু পাঁচু বিশ্বাস করে —

'বাপ-খুড়োর কোন কথাতেই প্রত্যয় নেই। না ফলুক সব কথা, তারা এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে।...'[১৭]

গোষ্ঠীগত নানা সংস্কার ও বিধি নিষেধকে সে মান্যতা দেয়। বাপ-ঠাকুরদার মুখে শোনা মালোঝালোর বৃত্তান্তে সে অতীতকে খোঁজে। আবার, দাদা নিবারণ সাঁইদারকেই সে মনে করে মালো গুষ্টির 'পেখম পুরুষ'। রাম মালোর মুখে শোনা কিংবদন্তি তার অবচেতনে ক্রিয়াশীল হয় অবিরত।

'হ্যাঁ, সমুদ্দুরের ওপর দে', দিব্যি পা ফেলে ফেলে হেঁটে এয়েছেলেন। দিগম্বর কালো কুচকুচে এক পুরুষ, কোঁচকানো চুল ফণা ধরে আছে কপালের ওপর।... হাতে এক মস্ত ক্যাঁচা।'[১৮]

সেই নিবারণকে দক্ষিণে হারিয়ে ফেলে পাঁচু। সেই যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত হয়ে তার সত্তা জুড়ে বিরাজমান। এই যন্ত্রণা থেকেই বিলাসকে নিয়ে নিয়ত অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় বিক্ষুব্ধ থাকে তার মন। আসলে বিলাসের মধ্যে নিবারণের ছায়া দেখে সে।

যাবতীয় সংস্কারমুক্ত বিলাস শুধুই মনের কাছে বশ। তাই মাঝে মাঝেই বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর সংস্কারকে বিপন্ন করে তোলে সে।

বৃত্তিজীবী এই মালোগোষ্ঠী নানাবিধ সংস্কার, লোকাচারে বিশ্বাসী — যেমন যাত্রাকালে কাঁকড়া, কচ্ছপ, কলা - অলুক্ষণে চিহ্ন।

বাছাড়ি জাল, টানা জাল, পাটা জাল, বিন জান, সাংলো-ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন পাঠক জেনে নেয় উপন্যাসের অনুপঙ্খ পাঠে; তেমনি অম্বুবাচিতে জেলেদের ঢ্যালাপূজা, কর্মবিরতির নিষেধাজ্ঞার কথাও অজ্ঞাত থাকে না। গঙ্গা তো শুধুই বহতা জলধারা নয়, জেলেদের জীবনধারাও। তাই গঙ্গাপূজা, খোকাঠাকুর, দক্ষিণরায়ের ওপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে জেলেরা জলে জাল ফেলে।

এরাই চৈত্রটোটায় ঘরে গাজন উৎসবে সন্ন্যাস নিয়ে লোকায়ত ধর্মের প্রতি যেমন আস্থাশীল থাকে তেমনি লোকসংস্কারের বিষয়ে সচেতন হয়।

'-ওই যে, টিকটিকির বাধা পড়ল। ওসব মানতে হয়, বুইলি? ওঁয়াকে শুধু একখানি জীব ভাবলে হবে না।...'[১৯]

বিলাস দীপ্র ভঙ্গিতে এইসব বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে। বিলাসের মধ্যে এমন এক দীপ্ত বোধ আছে যা আর পাঁচটা জেলের মধ্যে নেই। মহাজনকে সে তোশামোদ করে না, বিধির বিধানকে সে মানতে চায় না। কিন্তু জীবনের সহজ, সরল সত্যগুলো বিলাস বোঝে। তাই সে স্বতন্ত্র। এখানেই বিলাসের স্বকীয়তা, স্বতন্ত্র হলেও সে গোষ্ঠীবিরোধী নয়। গোষ্ঠীর প্রতি তার কাতরতা, আকুতি তা হৃদয়ের অতি গভীরে প্রোথিত। অন্তরে সে সমুদ্রের গভীর গর্জন অনুভব করে। তাই অমর্ত্যর বউ এর সঙ্গে কৃত আচরণ তাকে পীড়িত করে। অপরাধবোধে দগ্ধ হয় সে। '... কাজটা আমার ভালো হয় নি সয়া।'[২০] কিন্তু হিমি তার প্রেমসত্তাকে পূর্ণতা দেয়। 'বুকে আমার আগুন জ্বলছেল খা খা করে। তোমাকে যেদিন দেখলুম, আমার মন শান্ত হল।...'[২১]

আর বিলাসের মনে লালিত স্বপ্ন সার্থকতা পেল। সমুদ্রের বিশালতা, সুদূরের ডাক বিলাসের স্বপ্ন-বিলাস হয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় দক্ষিণের দিকে —

'ও তোর কোনো ভাবনা পিছে নাই রে
তোরে ডাক দিয়েছে সাগরে।'[২২]

বিলাসের সুদূর পিয়াসী মন হিমির ভালোবাসায় ঋদ্ধ হয়েছে। আর এই ভালোবাসাই তো পারে প্রেমাস্পদকে কাছে না পেয়েও অনন্তপ্রেমকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে। তাই বিলাস বলে — 'এই তেঁতলে বিলাসকে তুমি যা দিয়েছ, তা আর কেউ কাড়তে পারবে না। সে যে মহারানীর দান গো,...'[২৩]

মহত্তর প্রেমই পারে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে। আর বিলাস পেয়েছে সেই বন্ধনমুক্তির আস্বাদ — এখানেই উপন্যাসের শিল্প সার্থকতা।

**তথ্যসূত্র :**


১. বসু, সমরেশ, সমরেশবসু রচনাবলী ৭, পথসন্ধিতে সমরেশ বসু, বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (সম্পাঃ), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬
২. তদেব
৩. তদেব
৪. ঘোষ, প্রদ্যোত, বাংলার জনজাতি দ্বিতীয় খণ্ড, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ: ১১৯
৫. বসু, সমরেশ, বাথান দ্রঃ, সমরেশ বসু রচনাবলী ৭, বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (সম্পাঃ), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ: ৫৫৮
৬. তদেব, পৃ: ৫৬৩
৭. তদেব, পৃ: ৫৫৭
৮. তদেব, পৃ: ৫৫৮
৯. তদেব, পৃ: ৬২৯

১০. বসু, সমরেশ, গঙ্গা, চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, গঙ্গা: একটি সমীক্ষণ, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা
১১. বসু, সমরেশ, গঙ্গা, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ (মৌসুমী) ১৯৭৪, নবম মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ: ১৮
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ: ৩২৯
১৩. বসু, সমরেশ, গঙ্গা, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ (মৌসুমী) ১৯৭৪, নবম মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ: ১
১৪. চক্রবর্তী, সুমিতা, উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ: ৯৫
১৫. বসু, সমরেশ, গঙ্গা, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ (মৌসুমী) ১৯৭৪, নবম মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ: ১৫
১৬. তদেব, পৃ: ৬৯
১৭. তদেব, পৃ: ৩৪
১৮. তদেব, পৃ: ১৪
১৯. তদেব, পৃ: ১০২
২০. তদেব, পৃ: ৪০
২১. তদেব, পৃ: ১৭৮
২২. তদেব, পৃ: ১৮৮
২৩. তদেব, পৃ: ১৯০

# সমরেশ বসু : বাংলা উপন্যাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

অর্পিতা দেবনাথ

**সূচক শব্দ:** নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, অর্থহীনতা, স্বার্থপরতা, একঘেঁয়েমি, ক্লান্তিকর।

**সংক্ষিপ্তসার :**

সমরেশ বসু (১৯২৬-১৯৮৬) ছিলেন একজন প্রখ্যান ভারতীয় বাঙালি লেখক। তাঁর আসল নাম সুরথনাথ বসু। সমরেশ বসু নামেই তিনি অধিক পরিচিত। ১৯৮০ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাঁর শৈশব কেটেছে বাংলাদেশের বিক্রমপুরে আর কৈশোর কেটেছে ভারতের নৈহাটিতে। এরপর তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিন তিনি চাকরিও করেছিলেন, পরে তা ছেড়ে দিয়ে লেখাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। নৈহাটির টিনের ঘরে বসে তিনি একের পর এক সৃষ্টি করেছেন নানা গল্প ও উপন্যাস। তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। তিনি কেবলমাত্র নাগরিক লেখক নন, গ্রামীণ জীবন তাঁকে যেমন টানে, নাগরিক জীবন তেমনি টানে, মধ্যবিত্তের জীবনের জটিলতা যেমন টানে, শ্রমিকের জীবনের সংগ্রাম তেমনি আকর্ষণ করে। সমরেশ বসু একই সঙ্গে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাস - উত্তরঙ্গ (১৯৫১), নয়নপুরের মাটি (১৯৫২), বি. টি. রোডের ধারে (১৯৫২), সওদাগর (১৯৫৫), দাঙ্গা (১৯৫৭), জগদ্দল (১৯৬৬), টানাপোড়েন (১৯৮০), শ্রীমতী কাফে (১৯৫৩), বাঘিনী (১৯৬০), বিবর (১৯৬৫), প্রজাপতি (১৯৬৭), পাতক (১৯৬৯) প্রভৃতি।

**মূলপ্রবন্ধ:**

সমরেশ বসু ১৯২৪ সালে ঢাকা মুন্সীগঞ্জের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে মাত্র বার বছর বয়সে তিনি নৈহাটিতে চলে আসেন। সেখানে তাঁর বড়দা কর্মসূত্রে রেল কোয়ার্টার্সে থাকতেন। তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন এখানেই কাটে। এইসময় কলকাতায় যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি লেগেই থাকত। 'শ্রীমতী কাফে' ও 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাসে এই সময়কার জীবনযাত্রার ছবি পাওয়া যায়। এইসময় তাঁকে ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। ইছাপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে তিনি ছয় বছর কাজও করেছিলেন। তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে, তাকে এক বছর প্রেসিডেন্সি জেলে থাকতে হয়েছিল। এক বছর বাদে তিনি যখন জেল থেকে ছাড়া পান, তখন সিদ্ধান্ত নেন তিনি আর চাকরি করবেন না। লেখাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবেন। ১৯৪৬ সালে শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা 'আদাব' গল্প মুদ্রিত হয়। প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস

'উত্তরঙ্গ'। এটি ১৯৫১ সালে আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি'। তিনি এটি তাঁর একুশ বছর বয়সে লিখেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তা মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি প্রায় ৮৭টি উপন্যাস লিখেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে আরো উপন্যাস লিখেছিলেন। এছাড়া কালকূট ছদ্মনামে লিখেছেন ভ্রমণ উপন্যাস। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাস :

উত্তরঙ্গ (১৯৫১), নয়নপুরের মাটি (১৯৫২), বি. টি. রোডের ধারে (১৯৫২), সওদাগর (১৯৫৫), দাঙ্গা (১৯৫৭), জগদ্দল (১৯৬৬), টানাপোড়েন (১৯৮০), শ্রীমতী কাফে (১৯৫৩), বাঘিনী (১৯৬০), বিবর (১৯৬৫), প্রজাপতি (১৯৬৭), পাতক (১৯৬৯), বিশ্বাস (১৯৭১), স্বীকারোক্তি (১৯৬৭), মানুষ (১৯৭০), শক্তির উৎস (১৯৭৪), মহাকালের রথের ঘোড়া (১৯৭৭), ত্রিধারা (১৯৫৭), পুতুলের খেলা (১৯৫৮), দুরন্ত চড়াই (১৯৫৮), ফেরাই (১৯৬৪), শালঘেরির সীমানায় (১৯৬৪), যাত্রিক (১৯৭০), অবচেতন (১৯৭০), পরম রতন (১৯৭৩), প্রাচীন (১৯৭৪), ওদের বলতে দাও (১৯৭২), ছায়াঢাকা মন (১৯৭২), পথিক (১৯৭৩), বিজড়িত (১৯৭৫), সংকট (১৯৭৬), গন্তব্য (১৯৭৮), বিজনবিভুঁই (১৯৮১), সুচাদের স্বদেশযাত্রা (১৯৬৯), শাম্ব (১৯৭৮), বিপর্যস্ত (১৯৮০), পুনর্যাত্রা (১৯৮২), যুগ যুগ জীয়ে (১৯৮১) প্রভৃতি।

দ্বিতীয় বিশ্বসমরোত্তর বাঙালি জীবনের বিবর্ণ, ক্ষয়াটে, পচাগলা অস্তিত্বকে দুইহাতে জড়িয়ে সমরেশ বসু আসলে মানবতারই আবেগময় ক্রন্দনকে ভাষারূপ দিয়েছেন। এবার তাঁর কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। সমরেশ বসুর 'মানুষ' (১৯৭০) উপন্যাসে দস্তয়ভস্কীর নায়কের স্বীকারোক্তি পদ্ধতির সার্থক অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। দস্তয়ভস্কীর 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসের নতুন কাহিনী যেন 'মানুষ' উপন্যাসটি। কাহিনী নয়, স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে পাপবোধ, অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের উপস্থাপন করা হয়েছে। পার্টি রাজনীতি যে হিংসা ও হত্যাকে প্রশ্রয় দেয়, তা মানুষকে কীভাবে কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা দেখানো হয়েছে এ উপন্যাসে। রাজনৈতিক দলের অন্তর্দন্দ্বের ফলে মানুষের জীবন নিয়ে যে ছেলেখেলা ঘটে, তা সুজিত ও তার বন্দী প্রাক্তন কমরেড ধীরেশের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে। ধীরেশ গাঙ্গুলী একদিন ধ্রুবকে হত্যা করেছিল। কিন্তু এইকথা সে প্রথমে অস্বীকার করলেও শেষমুহূর্তে কেষ্টদার উদ্যত প্রশ্নের মুখে ধীরেশকে ভেঙে পড়তে দেখা গেছে। স্বীকার করেছে ধ্রুবকে ঈর্ষাবশত খুন করেছে। পার্টিতে ধ্রুবর যেরকম প্রতিষ্ঠা, তার মর্যাদা সেইরকম নয় কেন- এই চিন্তাই তাকে ঈর্ষান্বিত করেছে। ধ্রুব সকলের ভালোবাসার নেতা ছিল, তা ধীরেশ সহ্য করতে পারেনি। তাই দলের মধ্যে থেকেও সে কোনোদিন সকলের মধ্যে ঢুকতে পারেনি। দলের সকলের মধ্যে সে শুধু ধ্রুবর মুখ দেখেছে। কিন্তু সে অপরাধ স্বীকার করলেও কেষ্টদা ও সুজিত তা মানতে নারাজ। সুজিত বলে, তারা যে

ধীরেশকে নিয়ে এসেছিল, এ সে নয়। অবশেষে ভগবতী দিদি তাদেরকে নিবৃত্ত করেন। ভগবতী দিদি বলেন, ধীরেশের মরা চলে না। যখন ধীরেশ এখানে এসেছিল, তখন সে তাকে মানুষ বলে মনে করতে পারেনি। কিন্তু এখন অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে সে একটা খাঁটি মানুষে পরিণত হয়েছে।

সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭) উপন্যাসের রুহিতন কুরমি নিরক্ষর রাজবংশী ভূমিহীন আধিয়ার। নকশালবাড়ি অঞ্চলের পটভূমিতে এই রুহিতন দার্জিলিং মিরিকের বনাঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ধৃত হয়। সাত বছরের জেলজীবনের শেষে কলকাতার জেল থেকে সে সহসা মুক্তি পায়। ফিরে গিয়ে দেখে তাদের সেই মুক্ত এলাকার অস্তিত্ব সত্যি আর নেই। তবে কি মিথ্যে হয়ে গেল তার গোটা জীবনটাই? এই নিয়েই সমগ্র উপন্যাসটি। মহাভারতের কাহিনী নিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'শাম্ব' উপন্যাসটি। এখানে শাম্বের পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া, শাপমোচন ও মুক্তির কাহিনী নতুনভাবে রূপায়িত হয়েছে। শাম্ব চরিত্রটিকে এখানে ব্যক্তি হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যিনি অতি দুঃখসময়েও বিশ্বাস হারাননি, যিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়েও নিরন্তর নিজেকে উত্তীর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। শাম্ব তাঁর কাছে এক 'সংগ্রামী' ব্যক্তি। কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে মূলত শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি এখানে দেখাতে চেয়েছেন। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব মহর্ষি নারদের অসন্তোষের কারণ হয়ে পিতার কাছে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। রূপবান শাম্বের অপরাধ, পিতারই রূপসী অতৃপ্তা সহচরীদের সঙ্গে নিষিদ্ধ প্রেম। নরনারীর মৌল সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা, তার রূপায়ণ, তার ব্যাখ্যান 'শাম্ব'কে আধুনিক উপন্যাসে উন্নীত করেছে। শাম্বের আরোগ্যতীর্থে যাত্রা যেন আধুনিক জীবনেরই পরম এক আশা-আকাঙ্ক্ষার তাৎপর্যবাহী। চন্দ্রভাগা নদীর অপর পারে এক বনের মধ্যে কুষ্ঠরোগগ্রস্তদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শাম্ব। প্রথম সাক্ষাতে ভগ্নকেশ, বিকলাঙ্গ, বিবর্ণ শিশু ও পুরুষদের দেখে শাম্ব শিহরিত হন। পরে বুঝতে পারেন, এদের পরিহাসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একটি অসহায় অবিশ্বাস ধ্বনিত হচ্ছে। তখন এদের দেখে শাম্ব সমবেদনা বোধ করলেন। কেবল নিজের মুক্তি নয়, এদেরও অটুট বিশ্বাসকে অনুভব করলেন। আর প্রতিজ্ঞা করলেন এই হতভাগ্যদের মুক্তি না হলে তাঁরও মুক্তি কাম্য নয়। শাম্বের সেই আশ্চর্য তপস্যা ও রোগমুক্তির কাহিনী নিয়ে 'শাম্ব' উপন্যাস। আধুনিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ এ উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম বিষয় হল দ্বৈত ব্যাক্তিত্বের সংকট। মানব মনের স্ববিরোধিতা এই দ্বৈত ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ। শূন্যতা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের অনুভূতি এই ধরনের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দস্তয়ভস্কি, আলব্যের ক্যামু, জাঁ-পল সার্তরের কিছু কিছু উপন্যাসে এই ধারা লক্ষ্য করা যায়। সমরেশ বসুর এই ধারার সৃষ্ট কিছু

উপন্যাস 'প্রজাপতি' (১৯৫৭), 'বিবর' (১৯৬৫), 'পাতক' (১৯৬৯) ইত্যাদি। 'বিবর' উপন্যাসে স্বাধীনতা বোধের যে তত্ত্বটি উপস্থাপিত হয়েছে তা আসলে অস্তিবাদী দর্শনের প্রেরণাজনিত ফল। তবে কেউ কেউ একে অ্যাবসার্ড উপন্যাস হিসেবেও মনে করেন। অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য' গ্রন্থে একজায়গায় বলা হয়েছে,

"সমরেশ বসু 'বিবর'-এ খানিকটা অ্যাবসার্ড উপন্যাসের আদল আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো বাঙালি লেখকই তাঁদের লেখায় অ্যাবসার্ডতত্ত্বকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি। না-পারার পিছনে আছে ভারতীয় ঐতিহ্য, অধ্যাত্মচেতনার অলক্ষ্য প্রভাব।"[১]

'বিবর' উপন্যাসে নায়ক সংসারের রীতিনীতি, পারিবারিক বন্ধন, বাবা মা-র প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে পরাধীনতা মনে করে। আসলে মধ্যবিত্ত সমাজ, জীর্ণ অস্তিত্বহীন নিয়মের কারাগারে আবদ্ধ। এখানে মানুষের কোনও মূল পাওয়া যায় না। বরং শুধু আনন্দহীন পরাধীনতা। পরিবারে বা চাকরির স্থানে, আপাত সততা আসলে একটা বড় মুখোশ। একারণেই এই নিয়মের বন্দিত্ব বা গারদকে সমরেশ বসু 'বিবর' বলে মনে করেন। আর এই বিবর থেকে মুক্তি পেতে সে নিজেই স্বাধীন হতে চেয়েছে। কেননা সে বুঝেছে যে, নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে অযথার্থকে গ্রহণ করার অর্থ হল নিজের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখা। সে আরও বুঝেছে যে, প্রথাগত বিধিনিষেধকে অন্ধের মতো গ্রহণ না করে নিজ দায়িত্বে নিজের পথ বেছে নিতে হবে। তাই সে নীতার যৌনতার প্রতি প্রাত্যহিক ক্ষুধা মেটানোর আগ্রহকে মনে করে পরাধীনতা। 'বিবর'-এর নায়ক এমন এক ব্যক্তি যাকে রাগী যুবসমাজের প্রতিনিধি বলা যায়। তার মধ্যে এসে মেশে বিরাট এক কালের প্রচুর বিবেক বোধসম্পন্ন মানুষ। সে এক আইডিয়া। তাই তার নাম ধামের প্রয়োজন হয় না। তার এই মানসিকতা সৃষ্টির কারণ হল সমাজের পচন। পচা সমাজের দালালরা বিশেষ করে উচ্চ, উচ্চমধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সকলেই ব্যস্ত সুবিধাবাদে। ব্যস্ত আত্মস্বার্থে। সব জায়গায় ঘুস— ঘুস নেওয়াই আদর্শ।

সমরেশের নায়ক স্বাধীন বলেই জেলখানায় যাবার কথা ভাবে। কিন্তু তার এই স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হয় নীতা খুন হবার পর। তার পূর্বে নীতার সংসর্গ তাকে বন্দি করে রাখতো। সে ছিল সুদখোর, পরাধীন। চাকরি, নীতা, অফিসের বড় সাহেবের আদেশ, ঘুষ ইত্যাদি নায়কের জীবনে সৃষ্টি করে গভীর গর্ত। এই গর্তে পড়ে নায়ক ছটফট করেছে। তাই তো সে বলে—

"সত্যি আমার কিছু ভাল লাগে না। এক এক সময় মনে হয় সুইসাইড করি।"[২]

আসলে এই 'সুইসাইড' করার বোধ থেকেই সূচনা হয় উপন্যাসে নায়কের 'অস্তিত্ব' রক্ষার সংগ্রাম। তাই তো সে স্বাধীনতার সন্ধান করে। এখানে ব্যক্তির এই বোধ আসলে

আমাদের ঔপনিবেশিক বিকৃত ভিক্টোরিয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নায়কের বিচ্ছিন্নতা শেষ পর্যন্ত যৌনতা থেকে, নীতা থেকে, শরীরের কামনা থেকে মুক্তির মধ্যে ঘটেছে। তাই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়েছে। সফল হয়েছে। তার মধবিত্ত জীবনের প্রথম গারদ ছিল নীতা। তাকে সে খুন করেছে। ফলে যৌনতা থেকেও সে স্বাধীন হয়েছে। দ্বিতীয় গারদ ছিল চাকরি। কারণ এতদিন বড় সাহেবের কথায় সে প্রচুর ঘুষ নিয়েছে। সেই চাকরি তার গেছে। আসলে অপরাধ গোপনের পরাধীনতা সে মানতে রাজি নয়। একারণেই প্রাত্যহিক সাধারণত্বের চাপে সে যুক্ত থাকেনি। প্রচলিত সব বিশ্বাস সে ত্যাগ করেছে। চায়নি ঠুনকো বাহবা বা প্রশংসা। সে স্বাধীন, একা। তার চেতনাও স্বাধীন। সে অস্তিবাদী নায়ক। উপন্যাসটি আসলে মানবিক সম্পর্কের বাইরে এক নির্বাসিত মানুষের গল্প। প্রেম তাকে মুক্তি দেয়নি। প্রেমিকাকে খুন করে সে মুক্তি পেয়েছে।

ষাটের দশকের বাংলা প্রস্তুত ছিল না 'বিবর' -এর নায়ককে বোঝার ক্ষেত্রে। কিন্তু সে যুগের যন্ত্রণা ছিল। তথাকথিত সমাজের কাছে অপরাধী হতে তার ঘৃণা নেই। তাই জেলখানাও তার পরিত্যজ্য মনে হয়নি। স্বেচ্ছায় সে পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছে। শিকারহীন জলজ উদ্ভিদের মত ঘুরে বেড়ানোর থেকে, স্বাধীন চেতনার অভিনয় করার থেকে, সত্য সত্যই প্রকৃত জেলখানা তার কাছে আশীর্বাদ। যে সমাজে শান্তি, স্বাধীনতা, বিবেকদংশন নেই সেই সমাজ কিভাবে শালীন হয়? সমরেশ বসুর নায়কের বিপন্নতা তো লেখকের নিজেরও। তিনি বুঝেছিলেন, সাম্যবাদই এই বিপন্নতা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। বিপ্লবই সব, বিবর নয়। একথা সত্য যে, মানব সভ্যতার সর্বাপেক্ষা জঘন্যতম অপরাধ নরহত্যা। কিন্তু সমরেশের নায়ক বারবার বিশ্বাসভঙ্গের সংকট নিয়ে হত্যা করে মানুষকে। এ ব্যাপারে অশ্রুকুমার শিকদার 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে বিশ্বাসের সংকট ও সমরেশ বসু প্রবন্ধে জানান-

"সমস্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে তার যে নৈরাজ্যময় আক্রোশ, তারই ফলে ঘটে গেছে নীতার নিষ্কারণ হত্যা। পরিবারের মানুষ সম্বন্ধে তার চিন্তার কোনো শালীনতা নেই। 'দেশপ্রেমিক লাঞ্ছিত' হরলাল ভট্টাচার্য আসলে চোর, নায়কের সহকর্মীরা চুরির অংশীদার। নোটোরিয়াস হাবুল দত্তের স্ত্রী খোদকর্তার উপপত্নী, জাঁহাবাজ রুবি দত্ত হরলালের বিরুদ্ধে নায়কের দেওয়া রিপোর্ট বদলাতে আসে। সাধারণ মানুষ তার কাছে উচ্চিংড়ে। কেউ অমায়িক সাব্লাইম খচ্চর, কেউ বা ডিভাইন খচ্চর।"[৩]

বিশ্বাসের সংকট সমরেশ বসুর 'পাতক' উপন্যাসেও দেখা যায়। এই উপন্যাসের নায়কও সময়ের জ্বরে বিধ্বস্ত এক মানব। অদ্ভুত আঁধারে সেও পথ হারানো অসহায় যুবক। সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর তার ধিক্কার, বিবমিষা, ক্ষোভ, অভিমান শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে প্রতিহিংসায়। রাজনৈতিক স্বার্থপরতা, পরিবারের চক্রান্ত, বন্ধুত্বের ছলনা 'পাতক'

উপন্যাসের নায়ককে বিক্ষুব্ধ করেছে। তাই তথাকথিত ভদ্রলোকদের সমাজ থেকে সে পালিয়ে বেড়াতে চায়। আর সেই কারণে সে আত্মগোপন ও আত্মশুদ্ধিকরণের মাধ্যম হিসেবে যৌনতাকে বেছে নেয়। এই যৌন তাড়নার মধ্যে সে খুঁজে পায় মুক্তি। তবে পবিত্র ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাও নায়কের ছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্বেও তা তার জীবনে আসেনি। ফলে 'পাতক'- এর নায়ক ধীরে ধীরে পাতক হওয়ার দিকে এগিয়েছে। সে পতনের মধ্যে পেয়েছে সত্য ও শান্তি। 'পাতক' উপন্যাসের নায়ক 'বিবর', 'প্রজাপতি' ইত্যাদি উপন্যাসের নায়কের মতই অস্থির সময়ের চরিত্র। সমকালের নাগরিকতা তাদের নিঃসঙ্গ করেছে। এই নিঃসঙ্গতা নিয়েই 'বিবর' উপন্যাসের নায়ক নীতার কাছে আর 'পাতক' উপন্যাসের নায়ক রত্নার কাছে যেত। পাতকের নায়ক শুধু রত্না নয়, একাধিক নারীর কাছে সে যেত। যৌনতাতে সে যেন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যৌনতার প্রতি এই দ্বিধাহীন ভালবাসা আসলে একরকম সামাজিক প্রতিবাদ। এইভাবে সমাজের সুস্থ অন্ধকারই তার জীবনের আশ্রয় হয়ে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যেই হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত নায়ক সর্বনাশা যন্ত্রণাবোধে ক্ষত-বিক্ষত হয়। এক অপূর্ণতার অনুভূতি তাকে ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে। সে বোঝে রাজনৈতিক আদর্শ ও রাজনৈতিক দলবাজি এক নয়।

'পাতক' উপন্যাসের নায়ক দস্তয়ভস্কির 'দ্য ডাবল' (১৮৪৬), 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' (১৮৬৬), ও 'ব্রাদার্স কারামাজভ' (১৮৮০) ইত্যাদি উপন্যাসগুলির 'নায়কদের' যেন উত্তরসূরি। ভালো ও মন্দের অন্তর্দন্দ্বে যেমন দস্তয়ভস্কির নায়ক ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হয়েছে। সমরেশ বসুর নায়কও অবস্থার চাপে শান্ত ও স্তিমিত থাকতে পারেনি। প্রবল ক্রোধ, নিষ্ঠুর জিঘাংসা, নির্বিচার যৌনতা নিয়ে সে ব্যাতিক্রমী হয়ে উঠতে চেয়েছে। এই ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠাকেই সে মুক্তি বলে মনে করেছে। আবার আলব্যের ক্যামুর 'দ্য আউটসাইডার' উপন্যাসে নায়কের জীবনে যেমন বন্ধুত্ব, ভালবাসা ইত্যাদি আবেগের মোহ ছিল না, একইরকম অবস্থা 'পাতক' উপন্যাসের নায়কের মধ্যেও দেখা যায়। সে কারণেই তো সে মাকে হত্যা করে। এমনকি এই খুনের জন্য সে নিজেকে দায়ী পর্যন্ত করে না। ক্যামুর 'দ্য আউটসাইডার' উপন্যাসে নায়ক মারসোর মা মারা গিয়েছিল। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তার চোখে জল পর্যন্ত পড়েনি। ভালবাসা, শোক, বাৎসল্য ইত্যাদির প্রতি কোনও আবেগ বা দুর্বলতা এদের নেই। 'বিবর' উপন্যাসের নায়ক যা করেছে, সেই পথে হেঁটেছে 'পাতক' উপন্যাসের নায়ক। উভয় নায়কই পচা সময়ের ক্রুদ্ধ যুবক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ক্যামুর লেখা অধিকাংশ উপন্যাসের নায়ক হল 'অ্যাবসার্ড ম্যান'। তাঁর 'দ্যা প্লেগ' উপন্যাসের নায়ক রিও শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে যে, শরীরে প্লেগ শেষ হলেও মনে অবস্থিত প্লেগের জীবাণু শেষ হয় না। এর বীজ লুকিয়ে থাকে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে। এই প্লেগ থেকে বাঁচতে 'পাতক'- এর

নায়ক কখনও লতিকা, কখনও বেবী প্রভৃতি নারীর কাছে যৌন সংসর্গে মেতে উঠে। কিন্তু সেখানেও তার বন্ধন ঘোচেনি। 'প্রজাপতি', 'বিবর', 'পাতক'— এই তিনটি উপন্যাসেই নায়ক তার সমকালের বাংলা, ভারত তথা বিশ্ব সম্বন্ধে এক নিস্পৃহ মনোভাব পোষণ করেছেন। মানুষের জন্য সুস্থ সমাজের কল্পনা তাদের মনে ছিল। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে যে বাস্তবে তা অসম্ভব। এইভাবে সমরেশ বসু তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।

**তথ্যসূত্র:**

১। অলোক রায়, সাহিত্য কোষ কথা সাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা- ৬, সংশোধিত মুদ্রণ মার্চ ২০১৫। পৃষ্ঠা- ২১
২। সমরেশ বসু, বিবর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। পৃষ্ঠা-১৭
৩। অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০১৮। পৃষ্ঠা- (২৮৭-২৮৮)

**গ্রন্থপঞ্জী**

**আকর গ্রন্থ**

১। সমরেশ বসু, শেকলছেঁড়া হাতের খোঁজে, ১৯৮৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯।
২। সমরেশ বসু, সমরেশ রচনাবলী (প্রথম- ত্রয়োদশ খণ্ড), ২০০০-২০০১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯। ৩। সমরেশ বসু, দেখি নাই ফিরে, ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -৭০০০০১।
৪। সমরেশ বসু, বিবর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। পৃষ্ঠা-১৭
৫। সমরেশ বসু, যুগ যুগ জীয়ে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, দ্বাদশ মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৮।

**সহায়ক গ্রন্থ**

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছরঃ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৬। পৃষ্ঠা-১৮
২। কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, কথাসাহিত্যের নতুন পাঠ, সাহিত্যলোক, কলকাতা- ৬, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮।
৩। অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, চতুর্থ সংস্করণ নভেম্বর ২০১৮।
৪। রবিন পাল, উপন্যাসের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১।

# সমরেশ বসুর পাড়ি : মানবিকতার একটি বিশ্বস্ত দলিল

অর্পণ রায়

**সূচক সংখ্যা :**

জানোয়ার, লড়াই, প্রকৃতি, গঙ্গা, অনাহার, মানবিকতা, জীবন, সংগ্রাম, জৈবিকতা, প্রেম, আশা।

**সংক্ষিপ্তসার :**

'পাড়ি' সমরেশ বসুর এক অসাধারণ মানবিকতা তথা জীবনসংগ্রামের গল্প। দুটি দেহাতী নারী পুরুষ শুধুমাত্র একটু খাবারের আশায় কীভাবে মরণপণ সংগ্রাম করে একপাল শুয়োরকে গঙ্গা পার করার কাজ নেয় এবং তা সম্পন্ন করে তারই গল্প পাড়ি। কিন্তু শুধু সংগ্রাম নয়, গল্পে মানবিকতার দিকটিও অসামান্য। মানুষের মধ্যে শুধু জৈবিকতা নয়, আরো অনেক কিছুই থাকে। তারও প্রকাশ এ গল্পে আছে। ভাষা বর্ণনা ও বোধের এ এক অসামান্য গল্প। তীব্র লড়াই ও বেঁচে থাকার মহান গল্প।

**মূল প্রবন্ধ :**

যে কোনো একজন সচেতন শিল্পপ্রাণ মানুষকে গড়ে তোলে তাঁর কাল। সমরেশ বসুর আবির্ভাবকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। ঐ সময়েই তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব' রচিত। তবে 'আদাব' নয়, সমরেশ বসুকে তৈরী করেছিল তাঁর কিশোর জীবনের পরিবেশ, দেশীয় ইতিহাস-চিহ্নিত নানান ঘটনার উত্তাপ। বলা যায় সমরেশ বসুর জন্ম, আবির্ভাব সেই সময়ের সমস্তরকম কালগত ফলাফলের অবধারিত এক পরিণাম:

"সমরেশ বসু আমাদের মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের বিরুদ্ধেই প্রচণ্ড প্রতিবাদ- আর এ প্রতিবাদ এতই জীবনাভিজ্ঞতা-নির্ভর যে কখনই মনে হয় না, সমরেশ বসু পরোক্ষ কল্পনার আশ্রয়ে, কল্পস্বর্গের প্রতিবাদ আনছেন, তাই তাঁর গল্প কোনো ধর্মীয় স্বর্গরাজ্য বা প্রচলিত বিমূর্ত আশাবাদে শেষ হয় না।"[১]

সমরেশ বসুর ছোটগল্প বিষয়বস্তুর বিচারে বহুধাবিভক্ত ও বহুধাবিচিত্র। যিনি জীবনের মূল সত্যের সন্ধানে আমৃত্যু ছিলেন উদগ্রীব। তাঁর গল্পের কুশীলবেরা স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে সমাজের নীচুতলা তথা নিচুতম তলা থেকে। এইসব চরিত্র আক্ষরিখ অর্থেই কখনো এসেছে নিম্নবিত্ত, কখনো সমাজের একেবারে অপাংক্তেয় অংশ থেকে। তাছাড়া সর্বহারা চরিত্রের উপস্থাপনা সমরেশের গল্পে যোগ করেছে এক ভিন্ন মাত্রা। তিনি যখন বিচিত্র পর্যায়ের গল্প লিখছেন, বিভিন্ন সামাজিক এলাকা থেকে গল্পের উপকরণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তখনকার গল্পে হত্যা, মৃত্যু এবং বেঁচে থাকার বিড়ম্বনার ছবি থেকে আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে দুঃখবাদী লেখক মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি তাঁর গল্পের প্রাণপ্রতিমার সন্ধান করি তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সেই গল্পগুলি আসলে বলিষ্ঠ জীবনবাদের গল্প। আসলে মানুষকে জানার অবাধ্য কৌতুহলই তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। তাঁর গল্পে আছে মানুষের

কথা- আছে মানবীয় বিচিত্রতার সন্ধান। কিন্তু এই সন্ধান কখনোই একমাত্র বিষয় হয়ে ওঠেনি। বিশ্বের সব মহৎ গল্পের মতই তাঁর গল্পে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মানব প্রকৃতির অপরাজেয়তার কথা—সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জীবনের জয় ও প্রত্যয়ের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে, দাঙ্গা, মহামারী, মড়ক পেরিয়ে এসেছিল নতুন সৃষ্টির কাল। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভেতর থেকে আবির্ভাব ঘটেছিল বহু সৃজনী প্রতিভার। সমরেশ বসুর জবানীতে এই ঐতিহাসিক সত্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়-

".. একথাও অকপটে স্বীকার করা উচিত, কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই, আমার চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়। আমার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে। আমার নিজের দারিদ্র্য, দুঃখী মানুষদের সম্পর্কে এক আত্মিক চেতনা গড়ে তোলে। আমার ভেতরে জাগিয়ে তোলে সর্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা। আমি জীবনকে নানা দিক থেকে দেখেছি। .. ক্রমে আমার সামনে নতুন জগৎ উন্মোচিত হতে লাগল। গোপাল হালদার, নীরেন রায়, হিরণ সান্যাল, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় .. বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়.. বিখ্যাত সব কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী লেখক কবিদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটলো। .. আমার চিন্তার জগৎ ও দৃষ্টিকে নতুন চেতনার দ্বারা জীবনকে দেখার উদারতা ও সীমাকে সুদূর ও বিস্তৃত করে দিল।"[২]

গল্পকার সমরেশ বসুর অন্যতম স্বাতন্ত্র্য তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচনে। এ ব্যাপারে তাঁর অন্যতম পুঁজি তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা। যা তিনি মূলত অর্জন করেছিলেন শিল্পাঞ্চলের নিম্নবিত্ত ও চিত্তহীন মানুষের অসংস্কৃত, অমার্জিত জীবনের পরিপার্শ্ব থেকে। তাছাড়া জীবনের প্রতি, মানব ধর্মের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে লেখা তাঁর বহু গল্প আছে যা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য 'আদাব', 'কিসমিস', 'পাড়ি'র মতো গল্পগুলি।

মানবিকতার যাবতীয় দাবী আর অধিকার নিয়ে মানুষ শেষ উঠে দাঁড়াবেই পর্যন্ত মানুষের ভবিতব্যের প্রতি এই অপার বিশ্বাসই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল ব্যতিক্রমের সীমানায়। আলোচ্য 'পাড়ি' গল্পে উঠে এসেছে মানবীর স্বভাবের সেই অপরাজেয়তার স্বরূপ। মানুষের অপরাজেয়তার স্বরূপ এবং বেঁচে থাকার সংগ্রামের পরিশুদ্ধতাই মহৎ শিল্পের প্রেক্ষাপট রচনা করে। সংগ্রামের চেয়ে অমোঘ প্রেরণা জীবনে আর কী আছে? 'পাড়ি' গল্পে সমাজের নীচুতলার কর্মচ্যুত এক পুরুষ ও নারীর বেঁচে থাকার জন্য তীব্র সংগ্রামের কথা আছে। আসলে এ গল্প মরণপণ পাড়ি দেওয়ার গল্প, মানবিকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠার গল্প।

গল্পে দেখা যায় কর্মহীন এক দেহাতী দম্পতি শুধুমাত্র দু'মুঠো খাবার জোগাড়ের আশায় জীবন বাজি রেখে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এক কাজে। এই দম্পতির পূর্ব ইতিহাস হল, ননু নামের এক ব্যক্তির হাত ধরে তারা গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল মাসে ষাট টাকা মজুরি পাবার আশায়। কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা বুঝতে পারে যে তারা শহরে এসে ভুল করেছে। মাত্র দেড় মাস পর তাদের কাজ চলে যায়। দিন সাতেক এর ওর সাহায্যে তাদের দু'মুঠো খাবার জুটেছিল। তারপর বাধ্য হয়ে অনাহারে তারা বস্তি ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছিল

নির্জন গঙ্গার পাড়ে। ঠিক এখানেই অসাধারণ বর্ণনা করেছেন গল্পকার—"বসে ছিল দুটিতে। বেটে ঝাড়ালো এক বটের তলায় একজন গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ছিল। শুয়ে ছিল আর একজন। একজন পুরুষ, আর একজন মেয়ে। .. বন-ঝোপ নিয়ে, হামা দিয়ে দিয়ে জমি উঁচুতে উঠেছে পুবে। একটু উত্তরে, উঁচুতে দেখা যায় একটি কারখানা বাড়ি। নামতে নামতে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে।"[৩]

গত পরশু রাতে শেষবার খেতে পেয়েছিল এই দম্পতি। তারপর তারা আশ্রয় নিয়েছে এই গঙ্গার পাড়ে। এখানে এসে তারা দু-দিন কাটাচ্ছে। আজ দুটিতে এলিয়ে পড়েছিল। দুজনের হৃদপিণ্ড দুটি পেটে নেমে এসে দম নিচ্ছিল। গায়ে গায়ে মিলেমিশে রক্তের সাহস সঞ্চয় করছিল। হঠাৎই তারা দেখতে পায় কতগুলি জানোয়ার নেমে আসছে পুবের উঁচু থেকে। মেঘের বুকে আর এক পোঁচ গাঢ় কালিমার মতো নেমে এল কালো কুঁতকুঁতে চোখো, মাদী মদ্দা শুয়োরের দল। এই অবসরে হঠাৎ দুটো মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তারা ওই শুয়োরের পাল কিনেছে, নিয়ে যাবে গঙ্গার ওপারে শিবমন্দিরের কাছে। কিন্তু গঙ্গা এখন উত্তাল, প্রচণ্ড দাপটে বেড়ে চলেছে জোয়ার, উদ্দাম তরঙ্গ আছড়ে কুলের গায়ে। তারা যেন বাঁধ ভাঙার খেলায় মেতেছে। অন্যদিকে আকাশের মেঘ যেন মাটি ছুঁতে চাইছে।

এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে এই জন্তুগুলোকে পার করবার জন্য নারী-পুরুষ দুটির কাছে প্রস্তাব আসে। খাবার পাবার আশা জেগে ওঠে দুটির চোখে মুখে। কিন্তু খালি নৌকায় জানোয়ারগুলোকে এই ভয়াবহ তরঙ্গের মধ্যে পার করা কি সম্ভব ! ভরা গঙ্গা, জল আরও বাড়ছে। ফুলছে, নাচছে আর ঠেলে ঠেলে উঠছে উজানে। ওরা দুটিতে পরস্পর চোখে চোখে চাইল। তারপর মনে মনে রাজি হয়ে গেল দুজনেই। অতঃপর আমরা পেলাম গল্পকারের অসাধারণ বর্ণনা ও কথনভঙ্গি — "ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে গেল দুদিকে। মেয়েটি তার সরু মিষ্টি গলায় টান দিল একটানা, উ.আ. আর পুরুষটি ডাক দিল দেআঁশলা গলায়, আ..হুঃ। আ.. হুঁ। যেন মেয়েটির টানা সুরে পুরুষ দিল তাল। শব্দগুলি বেরোচ্ছিল ওদের ক্ষুধিত পেটের ভেতর থেকে। কেমন ক্লান্ত আর গম্ভীর সেই সুর। হঠাৎ যেন এক বিচিত্র গানের মায়া ছড়িয়ে দিল এই ঢালু বনভূমিতে। ঘোলা লাল জলের তরঙ্গে লাগল সেই সুর। বাতাসে বাতাসে সে সুর লাগল গিয়ে মেঘে মেঘে।"[৪]

কাজটি কঠিন, কিন্তু পশুগুলো ওদের চেনা। গ্রামে ওদের পেলেছে, ওদের স্বভাব-চরিত্র জানে। কিন্তু জানে না এই দরিয়া। জোয়ার লাগা লাল দরিয়াটা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু ক্ষুধার টান তারা সহ্য করছে, তাই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তারা পশুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে জলে নেমে পড়ে। শুরু হয় প্রকৃতি ও মানুষের তীব্র অসম লড়াই। শেষ পর্যন্ত তারা হাঁক পেড়ে জানোয়ারগুলোকে গঙ্গায় নামিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে একটি মাদী শুয়োর দলছুট হয়ে যায়। তার পক্ষে এই তীব্র টান উপেক্ষা করে গঙ্গা পেরোনো অসম্ভব। কারণ সে গর্ভবতী। সমরেশ বসু মানবিক চেতনায় স্পষ্টভাবে মাদী শুয়োরের মুখে ভাষা দিয়ে

বলেন—"ঘাড় গোঁজ করে আড়চোখে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল। জেনে শুনে মারতে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে ! শয়তান মানুষ !"[৫]

বহু কষ্টে মানুষ দুটি শুয়োরের দল নিয়ে প্রাণ বাজি রেখে এগিয়ে চলে অপর পারের দিকে। আর শুয়োরগুলো যাদের তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মোট ২৯ টি শুয়োর যেন ওপারে পৌঁছে যায় যেনতেন প্রকারে। অন্যদিকে না খেতে পাওয়া মানুষ দুটি জানোয়ারগুলির প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করে গঙ্গা দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল—"আমরা ভুখা। সেইজন্য আমাদের পার হতে দাও। সোনার মাকিটা কারবারি, ও আষাঢ় মাসে জানোয়ার পার করতে চায় বিনা নৌকায়.. জানোয়ারগুলোর কোনো দোষ নেই। হেই মায়ী। দুদিন ধরে দেখছ আমাদেরও কোন দোষ নেই।"[৬]

একরকম বাধ্য হয়েই উন্মত্ত গঙ্গার বুকে শুয়োরগুলোকে নামিয়ে দিয়ে তারা এগিয়ে চলল ওপারের দিকে। গল্পকারের বর্ণনায় দেখা যায় নিদারুণ তরঙ্গসঙ্কুল গঙ্গাপথে প্রাণীগুলোরও ভয়ে শঙ্কায় ঠেলে বেরিয়ে আসছে দুটি চোখ। অথচ মানুষ দুটি প্রতিমুহূর্তে নতুন শক্তি সঞ্চয় করছে কেবলমাত্র সামান্য একটু খাবারের আশায়।

জলে নামার পর শুয়োরগুলোকে এক জায়গায় রেখে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে থাকে ওরা দুটিতে। ক্রমশ ওদের চেহারা ও চোখ মুখ প্রায় জন্তুগুলোর মত হয়ে গেছে। মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জোয়ারের দরিয়া যত বাড়ছে ততই মেয়েটির চোখে মুখে বাড়ছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলক আর কড়ড়শব্দ। জানোয়ারগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। আবার তাদের একত্রিত করতে হল বহু কষ্টে। এদিকে সেই গাভীন শুয়োরীটা দলছুট হয়ে গেছে। ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে সে ঘূর্ণির দিকে। আর একবার ঘূর্ণিতে পড়লে আর বাঁচাবার কোনো উপায় নেই। বহু কষ্টে একটি লাঠির সাহায্যে অবশেষে গাভীন শুয়োরীটাকে বাঁচাতে পারে পুরুষটি।

জীবন বাজি রেখে বেঁচে থাকার তীব্র লড়াই-এর গল্প 'পাড়ি'। গল্পকার এই লড়াইকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে ভয়ংকর প্রকৃতির রুদ্ররূপের প্রেক্ষাপটে। গভীরতর মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে গল্পের পরতে পরতে। একের পর এক সমস্যায় বিদীর্ণ পশুগুলি ও এই মানুষ দুটি। মাঝ দরিয়ায় ঊনত্রিশটি শুয়োর পরিণত হয়েছে একত্রিশে। ধীরে ধীরে আমরা দেখি জানোয়ারগুলি মানুষ দুটিকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। মাঝ গঙ্গায় হঠাৎ এক ঘূর্ণি। আর সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে একটি মাদী শুয়োর। তাকে বাঁচানো অসম্ভব। কিন্তু যে মানুষের মধ্যে প্রেম আছে, মানবতা আছে, সেই তো নিজের জীবন বাজি রাখতে পারে। তাই পুরুষটি এগিয়ে গিয়েছিল মাদীটাকে বাঁচাতে। বলেছিল- "মরতে দেব। মরবে শুয়োরীটা। এতগুলি বাচ্চা পেটে নিয়ে মরবে।" বাঁচিয়েছিল শুয়োরীটাকে। এবং সবাই মিলে উঠে এসেছিল শিবমন্দিরের কুলে।

এত কষ্টের পর তারা পাড়ে ওঠে, কিন্তু এতক্ষণ তারা ভুলে গেছিল খিদের কথা। শুধু মনে ছিল পার হতে হবে। গল্পটি এখানেই মানবিক হয়ে উঠেছে। এরপর অসম্ভব ক্লান্ত

মানুষ দুটি আশ্রয় নেয় চালা ঘরে, আর দুদিনের অনাহার কাটানোর কাজে লেগে যায়। কিন্তু মেয়েটির চোখে জল। তার পরনের কাপড় গঙ্গার স্রোতে ভেসে গেছে, নিম্নাঙ্গের কাপড়টা তার বুক ঢাকতে পারছে না। পুরুষটি তাকে সান্ত্বনা দেয়, সোহাগ করে—"তারপর দুজনে রক্তে রক্তে যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।" গল্পের শেষাংশ প্রখর বাস্তবজ্ঞানে সমৃদ্ধ। চিরবঞ্চিত এইসব লড়াকু মানুষরা এমনই হয়। মানুষ দুটিকে সমাজ নিছক জৈবিকভাবে বাঁচার বেশি অধিকার দেয়নি বা সুযোগ দেয়নি। তাই তারা মরণপণ লড়াই করে পেটের খিদে মেটায়, পেটের খিদে মিটলে শরীরের খিদে মেটায়। এর বাইরে তারা কিছু জানে না। লেখকের এই বাস্তববোধ গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। অসামান্য শক্তিমন্ত ভাষা পাঠকের চৈতন্য ও অনুভূতিকে শেষ পর্যন্ত টান টান করে রাখে।

একদিকে লড়াই, অন্যদিকে তীব্র মানবিক আবেদন গল্পটিকে মহৎ করে তুলেছে। এ গল্পে সমরেশ বসু দেখিয়েছেন যথার্থ অর্থেই মানুষ জীবনকে অতল অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরছে। আর মানবসমাজের উত্থানের শক্তি সেখান থেকেই। এ প্রসঙ্গে গল্পের শেষাংশ উদ্ধৃত করা যায়—"খাওয়ার পর মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরশুদিনের রাত্রের মত দুজনের রক্তে ভাঁটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।"[৭]

ব্যক্তিগত জীবনেও একসময় নিরন্ন অবস্থায় বস্তিবাসী ছিলেন সমরেশ বসু। ডিম ও সবজি বিক্রি করতে তাঁকে যেতে হত ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির কোয়ার্টারে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছিলেন খাদ্যের মহিমা। গল্পের ভূমিকাতেও তাই তিনি বলেছিলেন—"নিজের চোখেই দেখেছিলাম, তারা দুজনে একপাল শুয়োরকে কিভাবে গঙ্গার ওপারে নিয়ে গিয়েছিল। রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। সকালে উঠেই গল্পটি লিখতে বসেছিলাম।.. জীবনসংগ্রাম, শ্রমের মাহাত্ম্য, মানবিক সম্পর্কের অপ্রতিরোধ্য আবেগই গল্পের মূল বিষয়, যা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।"[৮]

**তথ্যসূত্র :**


১. সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৮৯, পৃ. ৮১
২. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমি, সমরেশ বসু, দেশ, ২২ নভেম্বর ১৯৮৬
৩. সমরেশ বসু, গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মৌসুমী, ১৪০১, পৃ. ৪০
৪. সমরেশ বসু, গল্প সমগ্র, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৪০১, পৃ. ৪১
৫. তদেব, পৃ. ৪২
৬. তদেব, পৃ. ৪২
৭. তদেব, পৃ. ৪৪
৮. সমরেশ বসু, গল্প সমগ্র, ভূমিকাংশ

# সমকালীন সমাজ : সমরেশ বসুর সওদাগর উপন্যাস

সৈয়দ রাফিকা সুলতানা

**সূচক শব্দ :**

মঙ্গলকাব্য, বাঙালি সমাজ, অন্ত্যজ জীবন, দাঙ্গা, দেশভাগ, সাম্রাজ্যবাদ, মুল্যবৃদ্ধি, উদ্বাস্তু সমস্যা।

**সারসংক্ষেপ :**

সমরেশ বসুর 'সওদাগর' উপন্যাসটিতে দেশবিভাগের ফলস্বরূপ সেখান থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষের প্রতিষ্ঠাগত যে সমস্যা তার কথা বর্তমান। আর মানুষের যে অপরাজেয় বলদৃপ্ত পৌরুষের কথা সমরেশ বসুর প্রিয় প্রসঙ্গ, তারও বিশ্বস্ত বিবরণ দেখতে পাই আমরা 'সওদাগর' উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাস মনে হলেও তা পুরোপুরি রাজনৈতিক নয়। মঙ্গলকাব্যের ধনপতি সওদাগরের সঙ্গে মেঘনাদের মিল লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলকাব্যের সওদাগর হওয়ার বড়ো শখ মেঘনাদের। সেই স্বপ্নেই সবসময় মশগুল থাকে। এই স্বপ্ন একদিক থেকে মেঘুকে হতাশার হাত থেকেও বাঁচায়। সওদাগর হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্ত্রীকে ভালোবাসার সময় পায় না। আর তার ফলস্বরূপ স্ত্রী অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত মেঘনাদ স্বার্থান্বেষী মানুষদের প্ররোচনায় পড়ে নিঃস্ব হয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারে।

**মূল প্রবন্ধ :**

সমরেশ বসুর 'সওদাগর' উপন্যাসটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের আনন্দ সংস্করণের ১ থেকে ৫১ পৃষ্ঠা, ফেলে আসা দিন (প্রথম); ৫২ থেকে ১৬৮ নয়া পাড়ি (দ্বিতীয়); ১৬৯ থেকে ২০১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দিকশূল (তৃতীয়)। যদিও উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৫৬-৫৭ সাল। যে কোনো উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মতই নানামাত্রিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসগুলির মতো আলোচ্য উপন্যাসটি শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। সওদাগরের শিল্পাঞ্চলের মিশ্র জনজীবন, শ্রমজীবী মানুষ পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনে প্রয়োজনে, কখনও অপ্রয়োজনে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। উপন্যাসের পটভূমিতে অধুনা বাংলাদেশের কথা বর্তমান এবং দেশবিভাগের ফলস্বরূপ সেখান থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষের প্রতিষ্ঠাগত যে সমস্যা তার কথা বর্তমান। আর মানুষের যে অপরাজেয় বলদৃপ্ত পৌরুষের কথা সমরেশ বসুর প্রিয় প্রসঙ্গ, তারও বিশ্বস্ত বিবরণ দেখতে পাই আমরা এ উপন্যাসে।

উপন্যাসটির প্রত্যক্ষ সময় অপেক্ষা পরোক্ষ সময় অনেকখানি। মেঘনাদের প্রায় বাল্যকাল থেকেই তার জীবনের যে ইতিহাস তা টুকরো টুকরোভাবে বিবৃত হয়েছে। ঢাকা জেলার সিরাজ দীঘার মেঘনাদ ওরফে মেঘুর অতীতের ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি রেলগাড়ির

মতো 'দ্রুত বেগে ধাবিত' প্রবাহে ভেসে উঠেছে। এই স্মৃতি যখন মেঘনাদকে আষ্টে-পৃষ্ঠে ধরেছে, তখন মেঘনাদের কাছে মনে হয়েছে 'ভবিষ্যৎ হল মৃত্যুর মত গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।' উপন্যাসের শুরুতে বলা হয়েছে:

"আজ উনিশশো সাতচল্লিশ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি। আজ এই দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত রাত্রে দ্রুত ধাবিত ঢাকা মেল ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় অকল্পিত, অভাবিত এই ভাবনা যে মেঘনাদকে এই পরিবেশে কোনওদিন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে, তা সে ভাবতে পারেনি... শুক্লপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। পুঞ্জীভূত মেঘ ছড়ানো আকাশে গাঢ় কালিমা নেই। মেঘের আড়ালে লুকানো চাঁদের আলোয়, সাদা ঘন কুয়াশার মত সারা আকাশটা প্রাণহীন বিষণ্ণতায় ভরে রয়েছে। দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে নেই অন্ধকার। প্রদোষের অস্পষ্ট আলোর মত সব ঝাপসা।"[১]

মেঘনাদের মনে হওয়া ভবিষ্যৎকে কালো অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করার সঙ্গেই বোঝা যায়, আসলে সবকিছু অস্পষ্ট আলোর মত ঝাপসা।

উপন্যাসের পরোক্ষ সময় অনেকটা দীর্ঘ হলেও প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসের সময়কাল এক বছরেরও কম। উপন্যাসে ১৪ই আগষ্টের কথা আছে, বারবার এসেছে সময়ের কথা। সবকিছু মিলিয়ে ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৮-এর এপ্রিল পর্যন্ত উপন্যাসের সময়পর্ব।

উপন্যাসে মেঘনাদ সাহা বাড়ির ছেলে। ব্যবসা করা তার নেশা এবং পেশা। ঔপন্যাসিক বাঙালি সমাজের প্রতিনিধি রূপে ধরতে চেয়েছেন মেঘনাদকে। মেঘনাদ বাঙালি সমাজের প্রতিনিধিত্ব যেমন করেছে সেই সঙ্গে বণিক সমাজের প্রসঙ্গ দেখিয়েছেন। মেঘনাদ প্রসঙ্গে মধ্যযুগের বণিক প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে আসে। মেঘনাদের স্বপ্ন:

"সে ধনপতি সদাগর হবে। সপ্তডিঙা তার বদর বদর করে খাল নালা নদ নদী পেরিয়ে পাড়ি দেবে অকূল সমুদ্রে। সে। কত দূর দূরান্তে যাবে।... পৃথিবীর হাটে হাটে বাণিজ্য করবে। বাগ যাবে নসীরাম গণৎকারের বাড়ি। দেখুন তো ঠাকুরমশায় গুণে গেঁথে মেঘুর সপ্তডিঙা ফিরছে কিনা? নসীরাম একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে ঘর কাটবে, বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াবে আর আঁকি করবে। তারপর এক সময়ে বলবে, ভাবনা কোরো না মদন সাহা এবার থেকে মা লাটাই চন্ডীর ব্রত ধারণ করাও বংশে। তার পরেই মেঘু ফিরে আসবে হীরে জহরৎ ধন রত্ন নিয়ে। ডিম ডিম করে বাজবে কাসর, ঝাঁক বেঁধে মেয়ে বউরা উলু দেবে।"[২]

মঙ্গলকাব্যের সদাগর হওয়ার বড়ো শখ মেঘনাদের। সেই স্বপ্নেই সবসময় মশগুল থাকে মেঘনাদ। এই স্বপ্ন একদিক থেকে মেঘুকে হতাশার হাত থেকেও বাঁচায়। মেঘনাদ যখন সর্বহারা হয়ে লক্ষ্মণ সাহার গদীতে ঝাঁট দেয়, তখনও সে চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের কথা ভাবে। তার বিশ্বাস, একদিন ধনপতির মতই তার সপ্তডিঙা জলের তলা থেকে আবার ভেসে উঠবে। মেঘনাদের স্বপ্নকে এই উপন্যাসে সমরেশ বসু মেলান বৃহত্তর আর এক স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে লৌকিক পুরাণের জাগরণে।

আসলে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ধনপতি উপাখ্যানের লৌকিক পরম্পরাকে সমরেশ বসু ব্যবহার করেছেন তাঁর 'সওদাগর' উপন্যাসে। কিন্তু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে মনসামঙ্গলের কাহিনীরও সামান্য প্রতিফলন এখানে লক্ষ্য করা যায়। সূচনা অংশেই মেঘনাদের ভাবনায় বিষয়টি এসেছে সাপের অনুষঙ্গে। সাপের চিত্রকল্পের বিষয়টি উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ মেঘনাদ ও তার স্ত্রী লীলার সম্পর্কের দিক থেকে। "কালো সুন্দরী" লীলার কোনো বংশগৌরব নেই। বর্ণহিন্দুরা লীলার সঙ্গে মিশতে চায় না। মঙ্গলকাব্যের মনসার মতই সেও অন্ত্যজ। বিয়ের আগে চরের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার মধ্যে লীলা ধর্ষিতা হয়েছিল। বিয়ের পর সে ভেবেছিল মেঘনাদ তাকে ভালোবাসবে, সময় দেবে। কিন্তু ব্যবসাদার মেঘনাদ প্রেমের বিষয়ে ছিল উদাসীন। এককথায় বলতে গেলে বলা যায় প্রেমের পাঠ-পড়া ছিল না। সে জানত না মন ভোলানো কথা বলতে। কীভাবে নারীর মন জয় করতে হয় তা তার জানা ছিল না। বিয়ের রাতে তাই বউয়ের সাথে ব্যবসার কথার প্রসঙ্গ টেনে আনল। ধীরে ধীরে ব্যবসাদার মেঘুর স্ত্রী হয়ে শুধু অর্থ আর গয়নাতেই আবদ্ধ রইল লীলা। মেঘনাদের ঘরে সে হয়ে রইল পরবাসিনী। স্বাভাবিকভাবেই লীলা আশ্রয় চেয়েছে অন্য পুরুষের কাছে। যা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। মেঘনাদের উপেক্ষায় লীলা ভয়ংকরী হয়ে সব কিছুকে ধ্বংস করতে চায়। তার উদ্দেশ্য হয়ে উঠল মেঘনাদ ও তার ব্যবসাকে শেষ করতে। তার সন্তান মারা যায়। তাই লীলা এখন অধিক ভয়ঙ্করী। সে মেঘুর কর্মচারী বিপিনকে নিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। বিপিন তাকে বোঝাতে চায়, কর্তাকে দুঃখ দিতে বারণ করে। তার উত্তরে লীলা বলে—"তোমার কর্তা একটা কারখানার পোকা। মরলে ওকে গুঁড়িয়ে ময়দা করে তোমরা বাজারে ছাড়তে পারবে, "মেঘনাদ মালপো বলে। গদি ওর প্রাণ। মনে নেই, ফুলশয্যার ঘরে পড়েছিলুম একলা, আর তোমাদের কর্তা রাত কাবার করে এসে শোনাতে এল, নতুন মশলার কথা আর মালের কথা। ও-ই কি বিয়ে আর ও-ই কি পুরুষ? প্রাণের ভাগ নেই, মায়া মমতা কীসের? মেয়েমানুষ তোমাদের চেয়ে বুঝি খাটো? কোন বিষয়ে? তোমরা ঠকাতে পারো, আমরা পারিনে? আমরা পারিনে লণ্ডভণ্ড করতে সব? বিনা পুজোয় তুষ্ট কে? তা নয়, তোমরা কীরকম জানো? তোমরা পারো, মেয়েমানুষকে যা হোক, ঘাটে আঘাটে যে কোনও সুযোগে তার সর্বস্ব চুরি করে নিতে। চোরের দল।"[৩]

এখানেই মনসা ও চাঁদ সদাগরের বিবাদ চলে আসে নতুন আঙ্গিকরূপে। উপন্যাসের শেষের দিকে অবশ্য লীলার উত্তরণ ঘটে। যা ছিল লীলা চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে অনিবার্য। এবং শেষ পর্যন্ত মেঘনাদ আত্মসমর্পণ করে লীলার কাছে। সে লীলাকে এনে বসায় তার মেশিনের ওপর। এখানেও উপন্যাসে অস্পষ্ট ছায়া ফেলে চাঁদ সদাগরের মনসাকে পুজো দেওয়ার ঘটনাটি। এভাবেই লৌকিক কাহিনীর বড়ো রকমের আধুনিক রূপান্তর ঘটে। মঙ্গলকাব্য এবং আধুনিক উপন্যাস মিলেমিশে একাকার হয়ে ওঠে।

আসন্ন স্বাধীনতা, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, যুদ্ধ, তেভাগা

আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠন—এই বৃহৎ প্রেক্ষাপটে ওই বিশেষ সময়ে সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর (সওদাগর থেকে ব্যবসায়ী) প্রতিনিধির নতুন জগতে পদার্পণের কাহিনীও বিবৃত করেছেন ঔপন্যাসিক 'সওদাগর'-এ। সমালোচকদের অনেকেই এই বিস্তৃত পটকে সমরেশ বসু এই উপন্যাসে সেভাবে কাজে লাগাতে পারেননি বলে অভিযোগ করেছেন। আমাদের মনে হয় অভিযোগটি যথার্থ নয়। কারণ সমরেশ বসু রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেননি। তিনি যা করেছেন তা হল ইতিহাসের প্রেক্ষিতকে সম্মুখে রেখে ব্যক্তির অবস্থানকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাই উল্লেখিত বিস্তৃত পটকে তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করেননি। মেঘনাদ তার জন্মভূমি ছেড়ে চলে আসে জীবন ও জীবিকার তাগিদে। জীবনসংগ্রামের তাগিদে ছাড়তে হয় জন্মভিটে। যদি দেশভাগ না হতো মেঘনাদকে ছিন্ন হতে হতো না তার চেনা পরিবেশ থেকে। এই ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণাই উপন্যাস জুড়ে ব্যপ্ত? যা উপন্যাসটিতে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে।

উপন্যাসের প্রথম পর্ব অর্থাৎ 'ফেলে আসা দিন'- পর্বে আমরা দেখেছি মেঘনাদের অতীত এবং ব্রতকথা রূপকথার স্বপ্নের চালচিত্র। আর উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব 'নয়া পাড়ি'তে শুরু মেঘনাদের নতুন জীবনজগতে যাত্রা-অর্থাৎ বাস্তবের জীবন। মেঘনাদ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসে পশ্চিমবঙ্গের এক শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে তার শ্বশুরবাড়ীতে। তার শ্যালক হলো বিজয় শ্রমিক। শ্বশুর নকুড় সা এক ব্যর্থ সওদাগর। বিজয় চরিত্র মেঘনাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ব্যবসাদার শ্রমিককে দেখে আর ভাঙতে থাকে তার স্বপ্নের জগৎ। সওদাগরের থেকে শ্রমিকে পরিণত হওয়ার ইতিহাস সমরেশ বসু তুলে ধরেন বিজয় চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। এই অংশে শ্রমিক, কারখানা, দেশভাগ প্রসঙ্গে এসেছে ইউনিয়নের নেতা রাজীব চরিত্রটি। মেঘুর কারবারের কথা মাথায় রেখে বিজয় তাদের ইউনিয়নের নেতা রাজীবকে বুদ্ধি পরামর্শের জন্য নিয়ে আসে। এই রাজীব চরিত্রটির অনুষঙ্গে আসে দেশের তৎকালীন রাজনীতির ভাঙাচোরা প্রসঙ্গ। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জেল খেটেছে রাজীব। জেল ফেরৎ রাজীব সকলের চোখে নায়ক হয়ে উঠল। ঔপন্যাসিক রাজীব সম্পর্কে বলেন:

"নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার একটা তীব্র ইচ্ছে তার সত্যি। বিলোতে গিয়ে দেখল, নেবার পাত্র নেই। বিতৃষ্ণা এসে পড়ল মনে। দেখল, শ্রমিকদের মধ্যে আর যা-ই থাক, দেশপ্রেম বলে বস্তুটি নেই। উলটো বলো, সোজা বলো, সবকিছুতেই মাথা নেড়ে যায় এরা। ব্যক্তিত্বের কাছে সব বর্ষার কাদামাটির কেঁচো। মাঝে মাঝে খেপে যায়। তখন ওরা ভগবানকেও মানে না। সেটা এদের নীচ জীবনে যে পশু লুকিয়ে আছে তারই কারসাজি। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা ওই পশুটাকে খেপিয়ে তোলে মাঝে মাঝে।"[৪]

এই রাজীবই আবার নিয়ে আসে বিনয় চৌধুরীকে। সে হলো আর এক ধুরন্ধর ব্যক্তি। যৌবনে সে ছিল সকলের চোখে রত্নতুল্য। ডাবল এম.এ. করে সে বাইরে পাড়ি দিয়েছিল

অধ্যাপনার কাজ নিয়ে। তারপর দিল্লি থেকে ফিরে এসেছে বিয়ে করে। বিনয়ের দুই সন্তান নিয়ে সংসার, অথচ স্ত্রীর সঙ্গে তার মিল নেই। অস্পষ্ট রহস্যে ঘেরা এই বিনয় চরিত্রটি। বর্তমানে সে নানান ধরনের কারবারের সঙ্গে যুক্ত। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা আছে যথেষ্ট। এই বিনয়কে বিশ্বাস করে তার পরামর্শেই কারখানার জমি, ঘর তোলা, মেশিন কেনা, তন্দুর প্রতিষ্ঠা সবই করা হল। বিজয় একজন যথার্থ শ্রমিক, লড়াকু শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শবাদে সে উদ্বুদ্ধ।

মেঘনাদ বিজয়কে তার স্বপ্নের কথা বলে—"কারখানা হে কারখানা, বড় কারখানা, তাতে আমি মেশিন পিতিষ্ঠে করব। সেই মন্দিরে আমার টাকার পুণ্যি কবে হবে জানি না। কিন্তু এ না হলে আজ আর সিদ্ধিলাভ হবে না। এখন নতুন করে কাজ শিখতে হবে। নতুন কাজের মিস্তিরি হব আমি। পেছিয়ে কেন থাকি? আজকে সময় পড়েছে অন্যরকম, সেই রকম করতে হবে। হাতে কলমে ছেঁকে পুড়ে যা শুরু করেছি যন্তরেই যদি তার শেষ হয় তাহলে সেই শেষ দেখব না? বড় সাধ। সেই দেখে যেন আমি মরি। আমার সোনার পালা আর হাওয়ার গাড়ি চাইনে। আমি যেন নতুন কিছু করে যেতে পারি এই কারবারে।"[৫]

মেঘনাদের এই উক্তিতে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নতুন যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সে নিজেকে এক করে নিতে চাইছে। আবার অপরদিকে বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমরেশ বসু দেখিয়ে দেন কারখানা কীভাবে তাদের দিবানিশি শোষণ করছে। বিজয় স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় মেঘনাদের আসল উদ্দেশ্য—'তোমাদের জাত আলাদা। বড় বড় কথা বলছ, পুজো মন্দির। ছেনালের সাবিত্রী ব্রত। তোমাদের মত ধর্মিষ্টিরা কেন ওই মন্দির গড়ে, তা আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। শালা, সেরেফ টাকার নেশা আর লোভ।'[৬]

ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু সাহা বংশের ছেলে বিজয়কে করে তুলেছেন একজন শুদ্ধ শ্রমিক হিসেবে। আর অপরদিকে ধান্দাবাজ, স্বার্থান্বেষী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যবিত্তসুলভ আচরণ স্পষ্ট করে দেখাতে চেয়েছেন রাজীব চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

নির্বাচন, ট্রেড ইউনিয়ন, সমাজনীতির চরিত্র প্রায় নৈর্ব্যক্তিকভাবে লেখক যেভাবে 'সওদাগর' উপন্যাসে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরেছেন, তাঁর শেষ পর্বের তথাকথিত রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে আদৌ তা নেই। সমরেশ বসু স্বাধীনতার স্বরূপকে দেখিয়েছেন বিজয়ের মধ্য দিয়েই। সে তার নিজের মত করে এ দেশের ভালো-মন্দ ভাবতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু স্বাধীন দেশের স্বতন্ত্র কোনো চরিত্র তার কাছে ধরা পড়ে না। আর উপন্যাসের নায়ক মেঘনাদ সর্বস্বান্ত হয় বিনয় ও হরিহরের বিশ্বাসঘাতকতায়। আবার বিনয় লীলাকেও সর্বস্বান্ত করল। বিনয়ের প্ররোচনায় পড়ে লীলা স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বামীর প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় অন্ধ হয়ে তার সমস্ত গহনা তুলে দিল বিনয়ের হাতে। নতুন দেশ, নতুন রাজনীতির কৌশল যখন মেঘনাদ ধরতে পারল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন আর মেঘনাদের কিছুই করার ছিল না। সংকটে পড়ে মেঘনাদের প্রথমে মনে হয় 'দেবীর কোপ পড়েছে' তার

উপর। আবার তার এও মনে হয় হয়তো লেখাপড়া না শেখার কারণে হেরে গেছে এই সংসারের নিয়মেই। মেঘনাদের আত্মবিশ্লেষণে বোঝা যায় সে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছে। মেঘনাদ হয়ে উঠছে একজন সচেতন নাগরিক। ভুল বুঝতে পেরে হতাশ হওয়ার অবস্থা তার।

আসলে 'সওদাগর' উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাস মনে হলেও প্রত্যক্ষত উপন্যাসটি রাজনৈতিক নয়। কিন্তু একই সঙ্গে উপন্যাসটি 'গোরা' 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'গণদেবতা' বা 'ত্রিদিবা' উপন্যাসের সমধর্মী। এই সমস্ত উপন্যাসকে যদি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়, তাহলে 'সওদাগর'ও রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের বাস্তবচিত্র ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত রয়েছে। এই উপন্যাসের বাস্তববোধ 'টানাপোড়েন' উপন্যাসের প্রকৃতিবাদী বাস্তববোধ নয়। ইতিহাসের এক অন্তঃসলীলা বাস্তবচিত্রকে একটি ব্যক্তির আধারে ধরার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। আর মেঘনাদ, বিজয়, উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইতিহাসের ভাঙা-গড়ার প্রতিনিধিরূপে। তাঁর প্রথম পর্বের বিশিষ্ট বাস্তববোধ ও জীবনচেতনা 'সওদাগর' উপন্যাসের নির্মাণে বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। —এ তো যেকোনো শিল্পীর কাছে ঈর্ষণীয়। এই যে বিশিষ্টতা, সমকালের বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ ছিল।

**তথ্যসূত্র:**

১) সওদাগর, সমরেশ বসু রচনাবলী-২, ২০০০, পৃ. ১৯ ২০)
২) সওদাগর, সমরেশ বসু রচনাবলী-২, ২০০০, পৃ. ২০)
৩) সওদাগর, সমরেশ বসু রচনাবলী-২, ২০০০, পৃ.
৪) সওদাগর, সমরেশ বসু রচনাবলী-২, ২০০০, পৃ. ১০
৫) সওদাগর, সমরেশ বসু রচনাবলী- ২, ২০০০, পৃ. ১২৮-১২৯
৬) সওদাগর, সমরেশ বসু রচনাবলী- ২, ২০০০, পৃ. ১৩০)

# ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’ কিংবা নির্ভেজাল কমিউনিজমের সন্ধানে

প্রীতম চক্রবর্তী

সমরেশ বসুকে রাজনৈতিক পালাবদলের ‘সতর্ক দর্শক’ ও ‘সংবেদনশীল বিশ্লেষক’ হিসেবে চিহ্নিত করে অধ্যাপক দেবলীনা শেঠ লিখেছেন,

“কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েও তাঁর মানসিকতা অটুট থেকেছে বলেই পার্টির শ্রেণি বৈষম্যের বাস্তবতাকে সহজেই উপলব্ধি করেন। নাগরিক কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা বরাবরই প্রকাশিত হয়, ‘পার্টি নেতৃত্বের প্রতি, পার্টির প্রতি আমি বিশ্বস্ত থাকা সত্ত্বেও কলকাতার বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কমরেডরা ছিলেন আমার চোখে হৃদয়হীন ও হালকা মেজাজের মানুষ’, মনে পড়বে, ‘যুগ যুগ জীয়ে’ উপন্যাসে ত্রিদিবেশ শহুরে প্রগতিশীল কমরেডদের বলেছিল ‘কমিউনিস্ট কাঁচপোকা’। আঁতের এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে ক্রমে সমরেশ অনুভব করেছেন কোনো লেখক ‘একটি পার্টির সীমাবদ্ধ নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না।’ রাজনৈতিক তত্ত্বের দর্পণে নয়, মানুষকে দেখতে হবে তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতার আলোয়। এই স্বাধীন মননের অধিকার রক্ষার তাগিদেই সম্ভবত তাঁর পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ।”[১]

এরপরেও “আমৃত্যু নিত্যজাগ্রত তার রাজনৈতিক মানস”। তাই ১৯৪৬ সালে ‘পরিচয়’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় ‘আদাব’ লিখে সাম্যবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে যাঁর আত্মপ্রকাশ, কম্যুনিস্ট পার্টির সমালোচনাও পরবর্তীকালে চলে এসেছে তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাসে, যার মধ্যে অন্যতম ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’।

সমরেশ বসুর কথাবৃত্তে ‘বাংলার রাজনীতির নানা পর্ব-পর্বান্তর ভাষারূপ পেয়েছে’ স্বীকার করতেই হয়, এই সব উপাদানই তাঁর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ। পূর্ববঙ্গের সুতাপুর- একবালপুরের সুরথনাথ বসু নৈহাটিতে সাহিত্যচর্চা করার সময় হয়ে উঠলেন ‘সমরেশ বসু’। মাত্র আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করলেন বন্ধুর দিদি তথা চার বছরের বড় বিধবা গৌরীকে। আতপুর-জগদ্দলে বস্তি জীবন, চটকলের সাহেবদের কোয়ার্টারে ডিম-সবজি ফেরি থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার কারণে জেল জীবন। কারামুক্ত হবার পর পরিবারে যে সরকার প্রদত্ত ১৫০ টাকা মাসোহারা আসত, তাও গেল বন্ধ হয়ে। বন্ড দিয়ে আর ফ্যাক্টরিতে ঢোকেননি তিন। বেকারত্বের যন্ত্রণার মাঝে লেখাকেই তিনি সেদিন বেছে নিয়েছিলেন পেশা হিসেবে, পরবর্তী আটত্রিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্য তাঁর কলমে হয়েছে সমৃদ্ধ। বিবাগী ‘কালকূট’ থেকে সঞ্চয়ী ‘ভ্রমর’ এবং নন্দিত-নিন্দিত সমরেশ বসু বৈচিত্র্য বৈভবে তিনি ধরা দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের পাঠককে।

## ২

১৯৮৪ সালে প্রকাশ পেয়েছিল সমরেশ বসুর ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’ উপন্যাসটি।

অর্থাৎ লেখকের নাতিদীর্ঘ জীবনের শেষ পর্বের রচনাই বলা চলে উপন্যাসটিকে। অথচ এই উপন্যাসের পটভূমিটি চেনাতে গিয়ে দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (শেঠ) উল্লেখ করেছেন—

'... তাঁর যৌবনস্মৃতি, শ্রমিক সংঘের রাজনীতির খণ্ড-বিখণ্ড নগ্ন ছবিও ফিরে এসেছে নানা উপন্যাসে। 'জগদ্দলে' কিংবা 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'। ১৯৮৪-তে প্রকাশিত 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসে চলে এলো ১৯৪৬-এর 'অ্যালায়েন্স জুট মিলে'র অভিজ্ঞতা। সেবার সমরেশ দেখেছিলেন শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ আর ঘৃণাজনিত সংগ্রাম। মিলের দারোয়ানরা একটি শ্রমিককে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। তার পরিণাম হল মারাত্মক। শ্রমিকরা নিজেদের হাতে তুলে নিল নের্তৃত্ব। 'দেশ' পত্রিকার প্রবন্ধে সমরেশ লিখছেন, 'তারা লাঠি হাতে মারমুখী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কারখানায় কারখানায় ভাঙচুর শুরু হলো। তাঁত মেশিনগুলো তুলে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হলো।... সেই ক্ষ্যাপা ক্রুদ্ধ অনিয়ন্ত্রিত শ্রমিকদের সামনে দাঁড়িয়ে জগদ্দলের অবিসংবাদী নেতা সত্যমাস্টার বোঝাবার চেষ্টা করলে। আমি সেই প্রথম দেখলুম, শ্রমিকরা সত্যমাস্টারকে বললে 'তফাৎ যাও! আজ জান কা বদলা জান চাই!"[২]

এই লড়াই-ই সমরেশ বসুর কথাবৃত্তে রূপ পেল নাওয়াল আগারিয়া কিংবা তার বাবা লছমন আগারিয়ার প্রতিবাদী-সত্তায়। তিন পুরুষ না হলেও, এই দুই প্রজন্মেরর লড়াই এবং তার ইতিবাচক ফলশ্রুতি দেখিয়েছেন সমরেশ বসু। কিন্তু সেই প্রতিবাদী মানুষদের প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রে যে মূল্যবোধ ছিল তা স্থান-কাল-পাত্র অনুসারী; কোথাও লেখক সমরেশ নিজের আদর্শকে চাপিয়ে দেননি। অবশ্যই উপন্যাসের নায়ক নাওয়াল আগারিয়া, যার 'আত্মযন্ত্রণা' বা 'রাজনৈতিক দাহ' এই আখ্যানের বিষয়বস্তু। নায়কের সামাজিক বা পারিবারিক পটভূমি লেখক তৈরি করেছিলেন বাস্তব অনুসারে, যেখানে লেখকের নিজের বস্তি-জীবন বা শ্রমিক-কলোনির অভিজ্ঞতা মিলেমিশে গেছে।

লছমন, নাওয়ালের বাবা "...যার জীবন কেটেছে লোহা কাটা কারখানায় উদয়াস্ত কাজ করে। কাজের শেষে কারখানা থেকে সোজা শুঁড়িখানায় গলা পর্যন্ত মদ গিলে চুর চুর হয়ে যে ক্ষ্যাপা মহিষের মত মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতো। আর যাকেই সামনে পেতো তাকেই মারতে আরম্ভ করত।" অশ্রাব্য গালিগালাজের সঙ্গে অনিঃশেষ প্রহার, এই ছিল স্ত্রী বেদামীর প্রতিদিনের প্রাপ্য সোহাগ। বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা বেদামী দামের ঊর্ধে হলেও স্বামীর কাছে এসে দামহীন। শুধু 'জরু' নয় 'ছেলেমেয়েদের নেড়ি কুত্তার বাচ্চার মতো, চুলের মুঠি ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিত, চিৎকার করতো 'হট্ যা ছারপোকার ঝাড়। মাথার উকুন।' সন্তানদের নিষ্ঠুর স্বামীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বেদামী আগেই তাদের পাঠিয়ে দিত 'বস্তির আশেপাশের বাঁদাড়ে।' এ কিন্তু তাদের আবহমানের যাপিত-জীবন নয়। সময়ের হাত ধরে শয়তান ভর করে তাদের উপর। মনে রাখতে হবে, আগারিয়াদের জীবনচর্চা তাদের আরাধ্যে

পরিণত করেছে ময়দানবকে 'তার ক্ষমতা এত বেশি ছিল, তার কাজকর্ম দেখে, মানুষের বিশ্বাসই হতো না, এত বড় বিশাল কাজ কোন দেওতা করতে পারে। একমাত্র দানবই পারে এমন বিরাট নগর মন্দির রথ কয়েদখানা তৈরি করতে। কিন্তু ময় দানব না। সে দেওতা। আগারিয়াদের দেওতা। আগারিয়াদের গুরু।' আর তার সহযোগী আগারিয়ারা 'হিন্দু আমল থেকে শুরু করে, মুসলমান বাদশাহী আমলে তারা টন টন লোহা ঢালাইয়ের কাজ করেছে।' কুতুব মিনারের 'গা ছুঁয়ে' বংশগরিমার 'শিহরণ লেগেছিল' নাওয়াল আগারিয়ার শরীরে, তখন অবশ্য সে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

'লড়াক্কু মজদুর' নাওয়ালের পার্টির মেম্বার থেকে এম.পি হওয়া এর পিছনে আছে আগারিয়া পরিবারের লড়াইয়ের ইতিহাস। ঠিকাদার হালদারবাবুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল নাওয়ালের বাবা লছমন 'কাহে, মজুরি কেন কাটবেন বাবু? এক পয়সাও কাটা চলবে না। আধা পয়সাও না। মাল কি কিছু কম বানাতে হবে?' প্রতিক্রিয়ায় 'শুয়োরের বাচ্চা' থেকে 'বেজন্মা' ছাপার অযোগ্য আরো গালিগালাজ শুনতে হয়েছিল লছমনকে। তারপর মধ্যসত্ত্বভোগী ঠিকাদারের পোষা গুন্ডাদের মারে "তার গোটা মুখটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। নাকের ছিদ্রে, ঠোঁটের কষে রক্ত ঝরছিল। রক্ত চুঁইয়ে বেরচ্ছিল গালপাট্টা দাড়ি ভেদ করে। চোখের কোণ আর কপালের জায়গায় জায়গায় ডুমুরের মতো ফুলে উঠেছিল। আর কালশিটে দাগ।" ১৯৩৫ সাল, নাওয়ালের বয়স তখন বারো; তার চোখে তার 'মাতাল আর রাক্ষস' বাবা 'ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখ' নিয়ে হয়ে উঠল 'শান্ত, গম্ভীর এক যোদ্ধা' "এই বাবাই যে সেই বাবার মধ্যে ছিল, ওর কল্পনায়ও আসেনি। বাবাকেও চিনতে পারেনি। বারো বছর বয়সে সেই দিন নতুন করে চিনেছিল। দূরে অন্ধকার থেকে বাবার মুখের দিকে দেখতে দেখতে, বালক পিতৃগৌরবে, বিস্মিত শ্রদ্ধায় মোহিত হয়েছিল। চিরকালের ছবিটা, একদিনেই কোথায় নিমেষে মুছে গিয়েছিল। সেই মুখ ও সারাজীবনে আর কোনদিন ভুলতে পারেনি।"

চেহারায় 'মাতুলাকৃতি' হলেও বাবার প্রতিবাদের 'লিগ্যাসি' নিয়ে সারা ভারতের 'চেনা নাম হয়ে উঠেছিল' নাওয়াল আগারিয়া। আটঘন্টার বেশি কাজ না করার দাবিতে প্রতিবাদ জানিয়েছিল সে। সর্বহারা লোহাশিল্পী বাবার মত মুখ বুজে মার না খেয়ে বিদেশী শাসককে আক্রমণ করেছিল; 'চুত্তর কা বচ্ছা' বলে নাওয়ালের পাছায় বিলসান(উইলসান) লাথি মারলে তার প্রতিক্রিয়া 'চুত্তর কা বচ্ছা' বিলানের জুতো দুহাতে চেপে ধরেছিল মোচড় দিয়ে হালকা টান মেরেছিল। বিলান মাটিতে ছিটকে পড়েছিল।" এখানেই থামেনি বিষয়টি, খারাপ গালি দিয়ে সাহেব আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নাওয়ালের ওপর, অতঃপর প্রস্তুত ছিল নাওয়ালও : "উনিশ বছরের জোয়ান আগারিয়া দুহাত গদার মতো তুলে বিলানের মাথায় মেরেছিল। বিলান নিচু হয়ে হটে গিয়েছিল। আর মার খাওয়া ক্ষ্যাপা শাদা ভাল্লুকের মতো

মাথা নিচু করে নাওয়ালের কোমর জড়িয়ে ধরেছিল। পৃথিবীতে যা কেউ কোনদিন দেখেনি তা দেখেছিল। বিলান নাওয়ালের বুকে দাঁত বসিয়ে কামড়ে দিয়েছিল। নাওয়ালের বুক থেকে রক্ত বেরিয়েছিল। সে বিলানের মাথায় এত জোরে মেরেছিল, সাহেব ওর পায়ের কাছে বসে পড়েছিল। নাওয়াল একটুও সময় না দিয়ে, বিলানকে দুহাতে মাথার ওপর তুলে দূরে ছুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকেনি। বিলান উঠে দাঁড়াতেই ছুটে গিয়ে আবার তাকে দুহাতে তুলে গঙ্গার দিকে ছুটেছিল...।” সাল ১৯৪২, নাওয়াল তখন উনিশ বছরের; দু পয়সার জন্য লড়াই করা লছমন সেদিন ‘খুনি আগারিয়া বংশের কলঙ্ক’ বলে থামিয়েছিল ছেলেকে। কিন্তু সময়ের স্বর ততদিনে বদলে গেছে। নাওয়ালের রাজনৈতিক উত্থানের এই প্রাথমিক পটভূমির সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বৈশ্বিক রাজনীতিকে মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক।

নাওয়াল আর সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম লোকেশ পাত্র। আর এখান থেকেই আলোচ্য উপন্যাসে সমরেশ শুরু করেছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা। নাওয়ালকে দেখে ত্রিশ বছরের এম.এ পাস কমিউনিস্ট নেতা লোকেশের মনে হয়েছিল ‘মাদার’ উপন্যাসের নায়ক পাভেলের কথা। ‘লিখনে-পড়নে-বালা লালঝান্ডা পার্টি’র নেতা লোকেশের মধ্যেও তো প্রাকস্বাধীন ভারতবর্ষে বামপন্থীদের অবস্থান নিয়ে তৈরি হয়েছিল আত্মিক দ্বন্দ্ব। শ্রমিক নেতা হিসেবে নাওয়ালকে তার ‘স্বপ্নের মানুষ’ বলে মনে হলেও “তেতাল্লিশ সালে তার মনে দ্বিধা ছিল। ইংরেজদের পেটানো তাদের নীতি না। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামরিক আপোষের পন্থা মেনে নেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক-মালিক বিরোধ মিটমাট করে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখাই সেই সময়ের দায়িত্ব।” এই নিয়ে শুধু বিরোধী দল কংগ্রেস নয়, তাদের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গেও। পটভূমিটি অবশ্যই স্মরণ করাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ উপন্যাসটিকে, সেখানেও কমিউনিস্ট নীলু ইংরেজ শাসকের হাতে তুলে দিয়েছিল তার বড় দাদা তথা কংগ্রেস সোসালিস্ট দলের নেতা বিলুকে। জেলে বন্দি গান্ধীবাদী পিতার সঙ্গেও তার তৈরি হয়েছিল দূরত্ব। ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’ উপন্যাসে সমরেশ লোকেশের আত্মকথনে জানাচ্ছেন ‘সারা দেশে তখন তাদের নামে এমনিতেই নানা রকম বিরুদ্ধে প্রচার চলছিল। তারা নাকি কমিউনিস্ট বিরোধী জাতীয় নেতাদের পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন।’ সাহসী নির্ভীক নাওয়াল বা ইসরাইলকে দেখেও পার্টির নীতির বাইরে বের হতে পারেননি লোকেশ, কিন্তু মনের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন “তাঁর চিরকালের আদর্শবাদী শত্রুবিরোধী অন্তরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল নাওয়াল। পারলে, ঐ দাম্ভিক জাত্যাভিমানী মূর্খ উইলসনকে তিনিই পেটাতেন।” বাবার মতো জয়ী হয়েছিল নাওয়াল দু টাকা মজুরি থেকে আট ঘণ্টা কাজের সময়সীমা দুটি ক্ষেত্রেই শ্রমিক শ্রেণির জয় হয়েছিল। পার্থক্য ছিল একটাই ‘বাপ মার

খেয়েছিল। ছেলে মেরেছিল।' লছমন নিজের গোষ্ঠীবৃত্ত অতিক্রম করতে পারেনি বা করতে চায়নি। আর পরবর্তীতে ছেলে নাওয়াল হয়েছিল শ্রমিক পার্টির সর্বভারতীয় একটি মুখ।

৩

উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৮৪, আর নাতিদীর্ঘ এই আখ্যানের সময়কাল বেশ দীর্ঘ প্রাকস্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা-উত্তর এক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় কালকে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। লেখক এবং উপন্যাসের নায়ক নাওয়ালের বয়স প্রায় এক। গবেষক সত্যেন্দ্রনাথ রায় লেখকের 'গঙ্গা' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "সমরেশের অনেক গল্প উপন্যাসেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ আছে, গভীর অনুসন্ধানের ছাপ আছে, অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য গবেষণারও প্রমাণ আছে।"[৩] বলাবাহুল্য এই 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ' তাঁর অন্যান্য রাজনৈতিক উপন্যাসের মতো 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'ও আছে। লেখক নিজেই জানিয়েছেন,

"রাজনীতি এ তো মানে অনিবার্য ব্যাপার, যে-আমার সাহিত্যে আসবে বলে আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারি না আসবেই। আর বিশেষ করে রাজনীতি আসছে কেন? এদিক থেকে রাজনীতি আসছে, এটা 'যুগ যুগ জীয়ে' থেকে এসেছে, তা নয়। আরো অনেক আগে যেমন ধরা যাক একেবারে ষাটের দশকের গোড়ায় ১৯৬২ সালে 'স্বীকারোক্তি' ছোটগল্প দিয়ে যার শুরু এবং সেখান থেকে একশ্রেণির মানে কমিউনিস্ট নিজেদের তাঁরা বলেন আমাকে অত্যন্ত উগ্রকটু ভাষায় আক্রমণ করলেন এই গল্পের পর যে সেটাকে আমি মনে করি আমার, মানে রাজনৈতিক গল্পের প্রথম শুরু হল। একদিক থেকে যা আমার বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাসে যখনই আঘাত লেগেছে এবং যা আমার প্রত্যাশা ছিল তা যখনই দেখলাম শুধু অপূর্ণ থাকছে না সেই প্রত্যাশাকে ভেঙে খানখান করা হচ্ছে বিশ্বাসের সমস্ত বিশ্বাসকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, অথচ যারা এই বিশ্বাস ভাঙছে তারা বলছে তারা সত্যবাদী যা আমি বুঝতে পারছি আমার চিন্তার দিক থেকে যে তারা সত্যি কথা বলছে না এরকম ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপন্যাস, যদি রাজনৈতিক উপন্যাস বলে কিছু থাকে এবং রাজনৈতিক উপন্যাসে নিশ্চয়ই শিল্পরসের উত্তীর্ণ হতে হবে।"[৪]

এই অংশটি উদ্ধৃত করে অশ্রুকুমার শিকদারের সঙ্গে সমকণ্ঠে অলোক রায় বিষয়টিকে সমরেশের 'বিশ্বাসের সংকট' বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সমরেশ বসু। ১৯৪৪-৪৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। আর- 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার আগে ১৯৫৫-য় নিষ্ক্রিয়তার কারণে সদস্যপদ 'খারিজ dropped' হয়ে যায়' লেখকের।[৫] এরই মাঝে "পার্টির কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে বেশ কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। মধ্যবর্তী নেতাদের মধ্যে প্রবল ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ অনেক সময় দাঁত-নখ বের করে

দাঁড়ায়। বেআইনি হয়ে যাওয়া পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালাচ্ছে। উঁচু থাকের নেতারা জেলে। আত্মগোপন করে যারা বাইরে, তাঁদের মধ্যে ঠিক ঠিক ক্ষমতা কার হাতে বোঝা মুশকিল। এমন সময় সমরেশের রাজনৈতিক গুরু সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্ত একটি সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় নিহত হলেন। সমরেশ জেনেছিলেন দুর্ঘটনাটি ঘটানো হয়েছিল।

'আমি রাগে ঘৃণায় যন্ত্রণায় হতবাক'

"১৯৪৯ এর ১৩ ডিসেম্বর সমরেশ নিজেও এক চক্রান্তের শিকার হন এবং সেই রাতেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। লালবাজারে আর লর্ড সিনা রোডের গোয়েন্দা দপ্তরের এল বি সেলে একটা নারকীয় অভিজ্ঞতা হয়। কারাবাস করতে হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। জেলে অবশ্য পার্টির এমন অনেক নেতার দেখা মিলল 'যাঁদের মানবিকতা বোধ ছিল গভীর'। জেলে থাকতে তিনি একান্ত ভাবে অনুভব করেন, রাজনৈতিক কর্মী হওয়া তাঁর পথ নয়, 'একজন লেখক হওয়াই আমার ভবিষ্যৎ। এবং তা একটি পার্টির সীমাবদ্ধ নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না।"[৬]

কিন্তু 'আদাব' গল্প বা 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসের লেখক যা ভাবতে পারেন, লোহাকাটা আগারিয়া বাড়ির ছেলে নাওয়াল তার জীবনের প্রাথমিক পর্বে সেটি বুঝতে পারে না। শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জেলে যেতে হয়েছিল তাকেও। সেখানে বসে শিক্ষিত কমরেডদের কাছে শিখেছিল পড়াশোনা, জেনেছিল কুতুবমিনার তৈরির ইতিহাস এবং সেখানে তার পূর্বপুরুষদের ভূমিকার কথা। কিন্তু ১৯৪৯ এর জেলজীবন বদল এনেছিল রাজবন্দী নাওয়ালের, "তার চেহারাই বদলে গিয়েছিল। ভদ্রলোক বাবু কমরেডদের মতো, সে রংবেরঙের পাতলুন শার্ট, না তো কুর্তাপাজামা পরতে শিখেছিল। পায়ে বাহারি জুতো, গায়ের তামাটে রং রীতিমতো ফর্সা হয়ে গিয়েছিল। চামড়া মিহি। নিজের হাত পা দেখে নিজেরই অবাক লাগতো। আর পেশল শক্ত শরীরে ফুটেছিল একটা কোমলতা।" নিজের বাবাও 'ধোবদুরস্ত' ছেলেকে দেখে 'নয়া আদমি' ভেবেছে। এমনকি নওয়ালের তিন-সন্তানের জননী লছমী 'প্যারোলে' ফেরা মরদকে দেখে শঙ্কিত হয়েছিল। যদিও সেই কয়েক ঘন্টার মাঝেই শরীরী-মিলনে পুনরায় গর্ভবতী হয়েছিল নাওয়াল-জায়া। শুধু বাইরের সাজ নয়, শরীরের খেলাতেও যে নাওয়াল আরো পরিণত হয়েছে, বিষয়টি বুদ্ধিমতী লছমীর চোখ এড়ায়নি।

নাওয়ালের যৌনজীবন, স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের ঘটনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা-ব্যর্থতা ও সাফল্য স্বল্পদৈর্ঘ্যের উপন্যাসে বেশ কয়েক পাতা জুড়ে বর্ণনা করেছেন লেখক। আছে মত্ত লছমনের হাতে মার খাবার পর তারই সঙ্গে বেদামীর যৌনমিলনের বর্ণনা "যে শরীরটাকে মেরে তছনছ করতো, সেই শরীরের ওপরেই অন্য এক রূপে ঝাঁপিয়ে পড়তো। স্বামীর অন্তঃহীন রাগের যেন সেটা আর এক মাত্রা তখনও সে যেন বেদামীকে ছিঁড়ে খেতো, এবং

প্রচণ্ড হয়ে তার অঙ্গ খুঁড়তো। নখ আর দাঁতের আঁচড় লাগতো বুকে। বেদামীর দু'চোখ কূল ছাপানো দরিয়ার মতো ভাসতো। তার বুকের ওপর মত্ত মাতঙ্গ পুরুষটিকে তখনও তার রাগী দুঃখী শিশুর মতো মনে হতো। তার আত্মসমর্পণ ছিল অকাতর। বিশাল শক্ত পুরুষটিকে কখনও ভার বোধ হতো না। অবোধ আর দুর্বার শিশুটিকে শান্ত করার মতোই, সে দু'হাতের স্নেহ ছড়িয়ে দিত স্বামীর গায়ে।" বলাবাহুল্য কোনো পারিবারিক প্রেমের কাহিনি লেখক বয়ন করেননি। কিন্তু নাওয়ালের সামাজিক প্রতিবেশ, অকপট-যাপন এবং তদানীন্তন সারল্যকে স্পষ্ট করার জন্য এর প্রয়োজন ছিল বৈকি! রাজনৈতিক উত্থানের পর দিল্লি-বোম্বে-বিলেতে মেয়েরা তার 'গায়ে গা ঠেকিয়ে' নেচে গেছে, আকৃষ্ট হয়েছে রুশ দোভাষী আনার প্রতি, "সেই সুন্দর স্বাস্থ্যবতী উদার মনের মিষ্টি মেয়েটি"; আর প্রাগের বিবাহ বিচ্ছিন্না কৃষ্টাল, যে ভালোবেসে নিঃসংকোচে বিবস্ত্র হতে পারত নাওয়ালের কাছে। সে তো ভালোবেসে ছিল নাওয়ালের পুরো পরিবারকেই। রাজনৈতিক উত্থানপতনের ছবি আঁকতে গিয়ে বা তার যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেও চরিত্রগুলিকে রক্তমাংসের সজীবতাই দান করেছেন সমরেশ। মনে রাখতে হবে প্রথমা স্ত্রী গৌরী, যিনি সমরেশের চার সন্তানের জননী, তাঁর বর্তমানে শ্যালিকা ধরিত্রীকে বিবাহ করেছিলেন সমরেশ। তারপরেও বহু নারী এসেছিল লেখকের জীবনে, সারেন্ডার জঙ্গলে মাংরি, বাহাদায় কয়ো পরে 'সিন্ধু প্রদেশিনী' শোভনা, যিনি মরতেও চেয়েছিলেন; নিতাই বসু লিখেছেন,

"ব্যক্তি জীবনে সমরেশবাবু মোটেই শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন না, বরং তিনি রোমান্টিক বোহেমিয়ান, প্রথাবহির্ভূত জীবনযাত্রায় আসক্ত, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর কোন ছুঁৎমার্গিতা ছিল না। আদিবাসী, সিন্ধী বা বাঙালি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুবতী মেয়েরা ওঁর জীবনে এসেছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্য তারা স্বেচ্ছায় এসেছে।"[৭]

সমরেশ বসু নিজেও জানিয়েছেন "আমি জীবনভর যে শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় ঘুরে বেড়িয়েছি, তাও তো ঠিক নয়। তবে অবশ্যই স্ত্রীরা ছাড়াও আমার জীবনে অনেক বান্ধবী এসেছেন, তাঁদের কারুর কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে।"[৮] অবশ্যই সাহিত্যিক সমরেশ বসু আর মজদুর থেকে এম.পি হওয়া নামাজের মূল্যবোধ এক ছাঁচে গড়া নয়। রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রথম জীবনে সরিয়ে এনেছিলেন সমরেশ আর রাজনীতিতে নাওয়ালের উত্থানের সঙ্গে পতনও ঘটেছিল নির্মমভাবে। আর সেই আঘাতকে স্পষ্ট করে তুলতে তার পুরুষ-প্রবৃত্তিকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছিলেন লেখক।

নাওয়াল আগারিয়ার রাজনীতিতে উত্থান প্রতিবাদী মজুরের ভূমিকা থেকে, কমরেড মুজফ্ফর আহমেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছিল যে বক্তব্যে "কমরেডরা মনে রাখবেন, এরকম করেই একজন লড়াকু মজদুরের জন্ম হয়। আমাদের কাজ হল গিয়ে পার্টির তত্ত্ব, আদর্শ আর নীতির দ্বারা এদের শিক্ষিত করে তোলা। নাওয়ালেরাই পার্টির ভবিষ্যতের নেতা।" নেতা হয়েছিল নাওয়াল; জওহরলালের সঙ্গে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে

করমর্দন করেছিল, নিকিতা ক্রুশ্চেভের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সে এমন ছবিও উঠেছিল। আর নাওয়ালের রাজনৈতিক উত্থানের যে কাল, ভারতের ইতিহাসে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সেখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনি ঘোষিত হওয়া এবং পরে বৈধ হয় ১৯৫১ সালে। এই ঘটনা ছাড়াও তেভাগা বা কৃষক আন্দোলন, নৌ বিদ্রোহ, খাদ্য আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিশেষ ভূমিকা ছিল তাদের। দেশভাগ-উত্তর উদ্বাস্তু সমস্যায় শরণার্থীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ভূমিকা নিয়েছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। রাশিয়া ও চীন, কমিউনিজমের দ্বৈরথে ভাঙন ধরেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। অন্যদিকে ভারত-চীন যুদ্ধে ভারতের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কমিউনিস্টদের একাংশ। পরে পার্টি বিভাজিত হয় রুশপন্থী/ দক্ষিণপন্থী সিপিআই এবং চিনপন্থী/বামপন্থী সিপিআইএম। ‘বিপ্লব করব’ মানসিকতা নিয়ে সিপিআইএম তৈরি হলেও যখন ১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় যোগদান করেন জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙারের মত নেতারা, তখন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সিপিআই(এমএল)-এর জন্ম দেন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী, অসীম চট্টোপাধ্যায়, সৌরেন বসুর মতো নেতৃবৃন্দ। ‘গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা’ নকশাল বিদ্রোহে বলি হয় বাংলা তরুণ তাজা প্রাণ। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতির ভাঙাগড়া, রাষ্ট্রপতি শাসন; ষাটের শেষ থেকে সত্তর জুড়ে এক অশান্ত সময় জরুরি অবস্থা নিয়ে আসে আবার অন্য এক ইতিহাস। যদিও সমরেশ আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি অতদূর টানেননি, কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। উপন্যাসে ১৯৫৬-র লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হলো নাওয়াল। কিন্তু এই প্রার্থী হবার পদ্ধতি তো নিষ্কণ্টক ছিল না। যে লোকেশের কাছে নাওয়াল একদিন ‘মজুর নায়ক পাভেল’ ছিল, ‘শ্রমিক ক্যাডার’ থেকে তার এম. পি হবার পথে এই যাত্রা ‘আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল’ সেই লোকেশেরই মাথায়। এও তো এক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব জগৎ সেন, লোকেশ পাত্রের সঙ্গে ভবনাথ বা জয়ন্ত রায়ের সংঘাত। আর নওয়ালের মত ‘অশিক্ষিত মূর্খ’কে করুণা করতে পারলেও, এম. পি করার মহানুভবতা দেখাতে পারে না লোকেশ পাত্রের মতো নেতারা। নাওয়াল বুঝেছিল ‘লড়াই সব সময় পার্টির অভ্যন্তরেও বর্তমান’। তাইতো এম.এ পাস লোকেশের মুখে চলে আসে ‘ছেনালি’ বা ‘খচড়ামি’র মতো শব্দ।

ছাপান্ন সালে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিল নাওয়াল, ‘সেই আমলে যখন আজকের মত রিগিং আর খুনাখুনি ছিল না”। পরেরবার জিতলেও ব্যবধান গিয়েছিল কমে। আর তারপর রাজনীতিতে নাওয়ালের অবনমন; নির্বাচনে একের পর এক পরাজয়। যে নাওয়াল একসময় শিক্ষিত সুবক্তাদের পাশে অসংলগ্ন ত্রুটিপূর্ণ বক্তব্য রেখে আসর জমিয়ে দিত, দিনে দিনে

সে জনপ্রিয়তার ভাঁটা পড়েছে। দলীয় রাজনীতিতে যেমন ঘটেছে বিভাজন, দলীয় কর্মীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়েছে ভয়ানক রূপ। ভবনাথের বক্তব্য- "নাওয়াল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো। কিন্তু জেনে রেখো, এটা তোমার পথ নয়। এর থেকে তুমি শিক্ষা নেবে; সংসদীয় রাজনীতির পচা নর্দমায় তোমার যাত্রা শুরু হলো, নর্দমা ঘেঁটে এসো। তারপরে শুদ্ধ হয়ে, তোমার নিজের শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেবে। নিজের জায়গা ভুলে যেও না। ভেসে যেও না। তোমার একটাই মাত্র শিকল হারাবার কথা। মনে রেখো, এই শিকল, শিকল পরার ছল। ঠুনকো, মেকি।'

৪

উপন্যাসের কাহিনির দিকে তাকালে দেখা যাবে উপন্যাসের সময়কাল একটি সন্ধ্যা মাত্র, কিন্তু নায়ক নাওয়ালের স্মৃতিচারণায় পিছনের প্রায় চল্লিশ বছরের ইতিবৃত্ত ধরা পড়েছে। ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাঠামো। তা না হলে এক কমিউনিস্টদের আত্মবিশ্লেষণ ঘটবে কিভাবে? বীরেন্দ্র দত্ত 'বাংলা উপন্যাসের পালাবদলের পালাকার' হিসেবে সমরেশ বসুর কথা বলতে গিয়ে জানাচ্ছেন—

"শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসে আছে রাজনীতির আর এক স্তরের প্রয়োগমূলক পরীক্ষার কথা সংসদীয় রাজনীতির কঠিন সীমার শিক্ষার কথা। কমরেড, একদা সংগ্রামী মজদুর নাওয়াল আগারিয়ার বর্তমান অবস্থার স্মৃতি সূত্রে স্বপ্নভঙ্গের যে কাহিনি এঁকেছেন লেখক, তার মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে সংশয় ও কমিউনিস্টদের তার মধ্যে আশ্রয় দিয়ে বিপ্লবী মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের অক্ষমতা দেখানোর প্রয়াস আছে। পার্টি-নির্ভর রাজনীতি বিষয়ে উদভ্রান্ত, উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ভবনাথ নাওয়ালকে যে গান্ধীজীর মত ও শিক্ষার কথা বলে, যেন বা তারই সূত্রে আসে 'তিনপুরুষ' উপন্যাসে গান্ধীবাদী ঠাকুরদা সূর্যমোহন।'[৯]

'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' আসলে নাওয়ালের আত্মসমীক্ষা বা 'এক কমিউনিস্টদের আত্মযন্ত্রণা' হলেও সেখানেও এসেছে তিনপুরুষ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট না বুঝেই যে গান্ধী টুপি পরে ঠিকাদারের ধমক খেয়ে ছিল নাওয়ালের বাবা লছমন; যে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খেয়েছে, কিন্তু মারের বদলা মার দিত পারেনি। আর নাওয়ালের ছেলে লাল্লু, যার বাবা শ্রমিক নেতা থেকে হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির এম.পি হয়েছিল, সে বি.এ পাস করে ট্যাক্সির ব্যবসা করেছে, হাত পাকাচ্ছে রাজনীতিতে; খুব শিগগিরই পার্টির মেম্বার এর পদও পাবে। রাতের অন্ধকারে তার ঘর থেকে ভেসে আসে মদ-সিগারেটের গন্ধ, 'বন্ধুদের সঙ্গে বসে ব্যবসার ভবিষ্যতের কথা' বলে; পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রেরই প্রতিভূ হয়ে উঠেছে সে।

আর কংগ্রেসের কাছে নাওয়ালের হেরে যাওয়া সিট কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে যে

শিউপূজন জিতিয়ে এনেছিল, সে “ওদের মহল্লার নওজোয়ান মাস্তান। মোটরবাইকে চেপে ঘুরে বেড়াতো। সঙ্গে থাকতো সবসময়ই অনেক বন্ধু-বান্ধব। ওয়াগান ব্রেকার বা ডাকাতি ছিনতাইবাজ দুর্নাম তার ছিল না। কিন্তু মারকুটে ছিল। ক্লাব, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, এসব নিয়ে দলাদলি করতো। দাঙ্গা-হাঙ্গামাও অনেক করেছে। বোমাবাজিতে হাত পোক্ত। সবাই বলতো, ও পকেটে রিভলবার নিয়ে ঘোরে।” এখান থেকেই ‘কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যতে’র অনুসন্ধান করেছিল নাওয়াল; কারণ নাওয়ালের মত শ্রমজীবী মানুষও রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেয়ে ‘দিল্লির ওই ঠান্ডা গোল ঘর’ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি, “দুনিয়ার যে কোন দামি সরাব, আর যত খুবসুরত জেনানা হোক ঐ ঘরের থেকে কোনো বড় নেশা নেই।” আর সেই নেশায় বুঁদ হয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম-বিলাসিতার মদে ডুব দিয়ে শেষ পর্যন্ত নাওয়ালের পরিণতি ‘গাড্ডায় পড়া একটা কাদামাখা শুয়োর’ কিংবা ‘একজন লাথখোর’। নিজের গোষ্ঠী ও আত্মীয়দের সমর্থন হারিয়েছে অনেক আগেই, পরিজন হয়েছে পর; রাজনীতিতে ‘রাস্তা বদলাবার’ পথ খুঁজেও পথ পায়নি। তবুও সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নের্তৃত্বে সমাজতন্ত্র গঠনের স্বপ্ন দেখে চলে সে।

আসলে স্বপ্ন ও বাস্তবের ভেদ রাজনৈতিক নীতি নির্দেশনার ভিতরেই বহতা ছিল। পার্টির ‘বিলকুল বদলে’ যাওয়া চেহারা নওয়াল দেখেছিল আগেই ‘মজদুরের পার্টি? মজদুর কোথায়, বেকার আর ছাত্র আর একশ্রেণীর মধ্যবিত্ত, সরকারি কর্মচারী, স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা পার্টির সর্বস্তরের স্থান করে নিয়েছিল। এরা আগেও ছিল। কিন্তু নাওয়ালের ধারণা ছিল, পার্টির গোটা যন্ত্রটা এদের কব্জায় ছিল না।’ লোকাল কমিটির মধ্যে ঘটে গিয়েছিল ‘ব্যাপক পরিবর্তন’। সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির পার্টি হয়েও সমাজতন্ত্র ‘কায়েম’ করতে পারেনি, আনতে পারেনি ‘মজদুর রাজ’। নেতা জগৎ সেন একসময় বলেছিল “সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব মানে এই নয়, শ্রমিক শ্রেণিকেই এই নেতৃত্ব বহন করতে হবে। যারা তাত্ত্বিক, বুদ্ধিমান, পার্টির নীতি আর কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছে, শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বের দায় তাদেরই বহন করতে হবে। তবে, এটাও ঠিক, অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে আমাদেরই। কিন্তু কবে তারা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবে, তার জন্য পার্টি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। এটা ঠিক, আমরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করি। তার জন্য প্রস্তুতি আর সময় দরকার।” এই বিপ্লবের বদলে ‘শোধনবাদ’ ও ‘সুবিধাবাদ’ গ্রাস করেছিল নেতাদের। রাশিয়ার বৈকাল হ্রদের ধারে ‘নিজেকে লেনিনের সঙ্গে তুলনা করে’ হাঙল বলেছিলেন ‘শ্রমিক নেতৃত্ব দেবে না। শ্রমিক শ্রেণির আদর্শে, সর্বহারা তাত্ত্বিক নেতা, কমিউনিস্ট ইনটেলিজেনসিয়ারা পার্টির নেতৃত্ব দেবে।” নাওয়াল ‘মজদুর ইনটেলিজেনসিয়া’ হতে পারেনি, আসলে ‘কমিউনিস্ট ইনটেলিজেনসিয়া যাদের বলে, তাদের কোন শ্রেণি নেই। তারাও শ্রেণিহীন সর্বহারা।’

পার্টি ভরেছে জঞ্জালে শত্রু তো তার অভ্যন্তরেও। সুখ আর ক্ষমতাকে আত্মসাৎ করতে কাজে লাগাচ্ছে দলীয় রাজনীতিকে। ভবনাথের কথায় "খুনোখুনি করছে, যার থেকে কোনো ফায়দাই উঠবে না, কেবল গদি আঁকড়ে থাকার জন্য সবরকম নোংরামি চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা কংগ্রেসের কাছ থেকেই এসব শিখেছে, আর এখন কংগ্রেসীদেরও ছাড়িয়ে যাবার তাল করছে... কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ে সারা দুনিয়ায় গরিবের আর বড় পার্টি নেই। কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি? মজদুরের নেতৃত্ব কোথায়? মজদুরদের ওরা বেশ ভালো ভাবেই হটিয়েছে। এখন লেগেছে গ্রামের গরীবদের চরিত্র নষ্ট করতে।" ভবনাথ লছমনের চোখ দিয়ে দেখেছে "মজদুররা সব বাবু বনছে, সিনেমা দেখছে, জুয়া খেলছে, জোয়ানগুলো মাগীদের পেছনে ঘুরছে। ছিনতাই পার্টির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। আর ডাক পড়লেই ঝান্ডার নিচে গিয়ে পুকার করছে।" আসলে 'লুমপেন প্রোলেতারিয়েতে'র বদলে বেকার, চোর, পকেটমার- জাতীয় লোকেরা 'শুদ্ধ' হয়েছিল পার্টির পতাকা ধরে। আর তাই বুলেটের মতো ছেলেরাই হয় নেতাদের প্রধান শক্তি। অতি-বাম মানসিকতা নিয়ে তিমিরের মতো ছেলেরা চলে যায় আন্ডারগ্রাউন্ডে, নকশালদের ব্যর্থতার বীজ আছে তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই : "নকশালদের হাতগুলো আসলে শেকল ছেঁড়া ভূতের হাত। ওদের কোন জমিন আর গোড়া ছিল না। ভূতের যেমন ছায়া পড়ে না লোকে বলে, তাদেরও কোন ছায়া ছিল না। থাকলে আজ এ অবস্থা হতো না।"

সমরেশ বসু দেশভাগ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন "দেশভাগ আমি অন্তর থেকে কোনওকালেই মেনে নিতে পারিনি। মাস্টারমশাই অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ... এ ব্যাপারটি অন্তর গ্রহণ করেনি। মহাত্মাই ছিলেন আমার অন্তরের একমাত্র আশ্রয়। কথাটা কাউকে বলতুম না।"[১০] পরে লেখা 'তিনপুরুষ'এর গান্ধীবাদী সূর্যমোহন এর মত আলোচ্য উপন্যাসের শেষে কমিউনিস্ট পার্টির এককালীন সদস্য ভবনাথ নাওয়ালকে গান্ধীজীর কথাই শুনিয়ে যান "গান্ধীজী বলতেন, একমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই নিজেদের অবস্থা ফেরাবার জন্য লড়ে। তার মানে কী? একমাত্র মধ্যবিত্তরাই নিজের অবস্থাকে ফিরিয়ে বড়লোক হতে চায়। এমনটা যদি সব গরীবরা চাইতো, তা হলে ঠিক হতো। কিন্তু জানবে, ওটা একজন কমিউনিস্টের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল কথা। তিনি মধ্যবিত্তদের তারিফ করছেন, আর এখন আমাদের পার্টির নেতারা ক্যাডাররা সবাই গান্ধীজীর সেই লাইনটা নিয়ে চলেছে।" সমরেশের এই গান্ধী-ভাবনার সূত্র ধরে দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (শেঠ) লিখেছেন--

"কিছু সমালোচকের ধুয়োর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলবো কি তবে, ভোল বদলে শেষ জীবনে গান্ধীবাদের প্রচার করেছেন। কিন্তু সব ডায়ালগই যে তার মার্কসবাদ আর মার্কসবাদী পার্টির সঙ্গে। মিথ্যাচার অনৈতিকতা নির্লজ্জ সুবিধাবাদ এবং নীতিভ্রষ্ট রাজনৈতিক পরিবেশের প্রেক্ষিতেই তাঁর গান্ধী স্মরণ। এককালে পার্টির সেই সক্রিয় সদস্যের গ্লানি তো এইখানেই

'বন্দেমাতারাম আর ইনকিলাব জিন্দাবাদ কোথায় যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে।' শ্রেণি বিপ্লবের আদর্শ ভুলে শুধুই ন্যায়নীতিহীন আত্মতুষ্টি আর বিপ্লবের নামে মিথ্যাচার। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় পুড়ে ছাই হয় অন্তর আর সেই রাজনৈতিক দহনেই খাঁটি সোনার মূল্য যাচাই হয়ে যায়।"[১১]

'শ্রীমতী কাফে', 'খণ্ডিতা' বা পরবর্তীকালে 'তিন পুরুষ' উপন্যাসে যে গান্ধী-প্রসঙ্গ এসেছে তা মূলত সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবেচনাতে। উপন্যাসের শেষে 'ছিন্ন শিকল পায়ে' নাওয়াল মুখোমুখি হয়েছে লছমনের, 'বাবুজি' সম্বোধনে বহুদিন পর ডেকেছে তার অহিংস প্রতিবাদী বাবাকে। এখানেই কেমন যেন স্মরণে আসে 'বাপুজী'কে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম মুখ। মনে রাখতে হবে ১৯৮৭ সালে 'দেশ' পত্রিকায় সমরেশ লিখবেন 'কেন গান্ধী'-র মতো প্রবন্ধ। একদিন প্রবল নেশায় যে নাওয়াল 'স্নেহ ভালোবাসার গণ্ডি' 'দুপায়ে মাড়িয়ে' গিয়েছিল, শিকড়ের সন্ধানে সেখানেই ফিরতে হয়েছে তাকে। নিকষ অন্ধকারে 'আগারিয়ার বাচ্চা' বেরিয়েছে রাস্তায়, তার চলার পথে মিশে গেছে 'অতীত আর ভবিষ্যৎ', আর এখানেই সমাজের কাছে 'কমিটেড' শিল্পী সমরেশের অনিঃশেষ যাত্রা।

**সূত্র সংকেত :**


১. দেবলীনা শেঠ, 'সমরেশ বসুর রাজনৈতিক দাহ : দুটি উপন্যাসে' (প্রবন্ধ), বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০০১, পৃ. ১৫৩

২. দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (শেঠ), 'কথার পিঠে কথা', গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ২১২

৩. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', দে'জ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০২২, পৃ. ২৬৬

৪. অলোক রায়, 'বাংলা উপন্যাস : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ৩৫১-৩৫২

৫. সত্যজিৎ চৌধুরী, 'সমরেশ বসু', সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৯, পৃ. ৮৮

৬. তদেব, পৃ. ৮

৭. নিতাই বসু, 'আমার সমরেশ চর্চার ভূমিকা'। পরোক্ষ তথ্য সংগৃহীত : রবিন পাল, 'উপন্যাস : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৭৯

৮. সমরেশ বসু, 'আজকাল', ৬ অক্টোবর, ১৯৮৫। পরোক্ষ তথ্য সংগৃহীত : রবিন পাল, 'উপন্যাস : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৯. বীরেন্দ্র দত্ত, 'কবি ও কথাকার', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ২৯১

১০. সমরেশ বসু, 'ভারতের কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি', দেশ, ২২ নভেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ৭৩

১১. দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (শেঠ), 'কথার পিঠে কথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

# শহীদের মা ও হাজার চুরাশির মা : রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক পাঠ

**হিমাদ্রি মণ্ডল**

(১)

প্রতিটা রাজনৈতিক দল মানুষের জন্য কাজ করতে চায় বলে দাবি করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণসাধনই নাকি রাজনৈতিক দলগুলোর মূল ব্রত! অথচ 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ' এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রায় প্রতিটা রাজনৈতিক দল যেন প্রতিযোগিতায় সামিল। বর্তমান সময়ে তাই আমাদের বলতে দ্বিধা নেই- 'শাসক যে দলেরই হোক ভয়ংকর'। রাজনৈতিক দলগুলোর সুবিধা ও ক্ষমতা দখলের হীন ও নীচ পন্থা বনের পশুকেও লজ্জা দিচ্ছে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একটা অংশ গিরগিটির মতো রং পরিবর্তনে ব্যস্ত। রাতে শুতে যাওয়ার আগে তিনি এক দলে, ভোরে উঠে তিনি আর এক দলে, বিকালে আর এক দলের পতাকা নিয়ে হাঁটলেও আজ আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আর সেজন্য রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ মানুষ সাধারণ মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে ভাঁড় বা হাস্যস্পদ চরিত্রে পরিণত। এই বিশ্বের প্রতিটা মানুষকে কোনো না কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতি। মানুষ চাক বা না চাক রাজনীতির চক্রের আবর্তনে তাকে ঘুরতেই হবে। সামাজিক সম্পর্কের মাত্রা হিসেবে কে কোন দল সেটিও আজ বহুক্ষেত্রে বিবেচিত। অনেক সময় পারিবারিক সম্পর্কেও ছায়া ফেলছে এই রাজনীতি। ফলে বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি জ্ঞানশূন্য মানুষের ধারণা 'সোনার পাথর বাটি'।

শুধুই জয়ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য, প্রীতি ও ভ্রাতৃধর্মকে দলের ঘোলা-জলে ভাসিয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। সত্যি 'ক্ষুদ্র সুখে' ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা যে ভরে না সেটি চারদিকে রাজনৈতিক দলের লোকজনদের দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। মুখে যতই তারা গণতন্ত্রের আদর্শের কথা বলুন না কেন নিজেদের রাজনৈতিক রং ছাড়া অন্য রং প্রতিটা রাজনৈতিক দলের 'না পসন্দ'। তারা পছন্দ করেন প্রশ্নহীন অনুগত সদস্য, যারা শুধু মারবে আর মরবে। মোরা বাক্য কব, তোমরা রবে নিরুত্তর—এটাই তাদের মোটো। ওপর মহলের নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন না করলে কোনো সমস্যাই হয় না। তবু কিছু কিছু মানুষ এই রাজনৈতিক চক্রজালের পেষণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন, নিজের স্বাধীন মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান। কিছু মানুষ বিপরীত পথে হাঁটেন। ফলে এই মানুষগুলি রাজনৈতিক দলের মানুষদের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠেন। চিহ্নিত হন 'বিরোধী', 'কুৎসাকারী', 'সমাজদ্রোহী' হিসেবে। যদি পূর্বের দলটিকে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গাটি শুধু দখল করাই কোনো ব্যক্তি বা দলের কাজ হয় অর্থাৎ ব্যক্তি স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থ সেখানে মুখ্য হয় তাহলে একথা বলতে দ্বিধা থাকে না তারাও একদিন ক্ষমতাভোগী হয়ে উঠবেন। আর যারা ব্যক্তি স্বার্থকে গৌণ করে সমষ্টি বা সামাজিক

স্বার্থকে বড়ো করে দেখেন, অব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে সুস্থ, স্বাভাবিক- মনুষ্য বাস-উপযোগী করে তুলতে চান তারা চিহ্নিত হন সমাজ সংস্কারক- মহাত্মা কিংবা মহামানব হিসেবে।

শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে নিজের আদর্শের সঙ্গে না মেলা মানেই বিরোধী এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ প্রকৃত সমালোচকের কথার মধ্য থেকে অনেক সময় নিজেদের চলার পথের ত্রুটিগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু রাজনীতির মঞ্চে পাছে বিপরীত পক্ষের কথাকে মান্যতা দেওয়া হয়ে যায় সেজন্য বিরুদ্ধ দলের কথা মাত্রেই 'ভিত্তিহীন', 'মিথ্যা', 'অপপ্রচার', 'কুৎসা' এমনটা দেগে দেওয়াই অলিখিত নিয়ম। অন্যদিকে বিপরীত দলের সমস্ত কর্ম ও আদর্শই ভ্রান্ত এমন একটা প্রচার ও ভাবনা অন্য রাজনৈতিক দলের মানুষেরা করতে চেষ্টা করেন। পরস্পরের সব কথা যদি নাও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হোক কিছু কথার যে সারমর্ম থাকে না এমন নয়। তবু রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপরীত পক্ষের কথা না শোনা ও গুরুত্ব না দেওয়াই যেন নীতি। আর বিরোধী দলের লোক মানেই শত্রু। এর গভীরে কোন্ অভিসন্ধি—অর্থ-বিত্তের ভাগাভাগির লড়াই সুপ্ত থাকে, একই সঙ্গে ক্ষমতার একচ্ছত্র স্বৈরাচারী মনোভাব, কতজন গণতান্ত্রিকতা বোঝেন!

আবার অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা যে বা যাদের দ্বারা সমস্যার সম্মুখীন হয় তাদের সরিয়ে ফেললে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে রাজনৈতিক দলগুলি অনেক সময় মনে করে। এই সরিয়ে ফেলার পদ্ধতি তিন রকমের। কখনও ভয়, কখনও লোভ। এই দুই পন্থা ব্যর্থ হলে চরম সিধান্ত- প্রশ্নকারিকে, বিপরীত মতবাদের মানুষকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। সুস্থ প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠে বা পারবে না এই আশঙ্কাতেও এই ধরনের হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এইরকম হত্যায় এক ধরনের হিংস্রতা কাজ করে। এতে সমস্যার সমাধান হয়তো হয় না, প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায়। আর আপাত অর্থে নিজেদের সবলতা যাকে বলে মনে হয় তা যে দুর্বলতা ছাড়া কিছু নয়, তা তারা বোঝার মতো জায়গাতেই থাকে না। কারণ রাজনীতি মানুষের চোখে এমন এক ঠুলি পরিয়ে দেয় যে নিজ দলীয় আদর্শ ছাড়া অপর দলের আদর্শকে, কর্মীকে ধ্বংসের মধ্যেই রয়েছে সচ্চিদানন্দ বোধ হয়। আর বিপরীত পক্ষের মানুষকে হত্যার মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষের কাছে একটি ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় এবং বার্তা দেওয়া যায় বিপরীতে হাঁটলে তার দশাও এমন হবে। এমনকি ক্ষমতার লোভের প্রশ্নে নিজের দলের লোকদেরই হত্যার ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মানুষেরা এই ধরনের হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে পুলিশ প্রশাসন থেকে সমস্ত কিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে কে বা কারা এই হত্যা করল তার হদিশ মেলে না। পুলিশ কেস নেয় না কিংবা বিচার এমনভাবে চলে যে অপরাধীরা তথ্য লোপাটের উপযুক্ত সময় পেয়ে নির্দোষ প্রমাণের সময় পেয়ে যায়। প্রমাণ থাকলেও জনগণের পাহারাদার, যার হাতে সুরক্ষার নিশ্চিত অবসর—সে-ই ঢুকে পড়ে শাসকদলের অন্দরে, প্রোমোশনের লোভে, অর্থের লোভে; ফল জনগণের জন্য কারাগারের শাস্তি অপেক্ষায় থাকে।

সবাই প্রায় জানেন কে বা কারা এই হত্যার সঙ্গে যুক্ত তবু ভয়ে কেউ মুখ খোলেন না। পাছে তারও কোনো ক্ষতি হয়। বিষয়টা অনেকটা এরকম—কেউ হত্যা করেনি অথচ একজন রাজনৈতিক হত্যার স্বীকার। শুধু যাদের কোল শূন্য হয়, যারা হারায় তাদের কাছের মানুষকে তারাই বোঝেন প্রিয়জন হারানোর কষ্ট।

(২)

সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) 'শহীদের মা' (প্রথম প্রকাশ: আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৭) ছোটগল্প এবং মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) 'হাজার চুরাশির মা' (প্রথম প্রকাশ- আগস্ট, ১৯৭৪) উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে প্রত্যক্ষ রাজনীতি এবং রাজনৈতিক হত্যা। দুটি রচনাই রাজনৈতিক হত্যার কারণে সন্তানহারা দুই মায়ের গল্প এবং সন্তানের মৃত্যুর পর সন্তানকে আবিষ্কারের আখ্যান। 'শহীদের মা' রচনার প্রেক্ষাপট দেশভাগ পরবর্তী কোন সময় লেখক সঠিকভাবে উল্লেখ না করলেও রচনাকালের সমসাময়িক সময়ই যে এই গল্পের প্রেক্ষাপট তা বুঝতে সুধী পাঠকের অসুবিধা হয় না। দুই রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলের জায়গা দেশভাগ। বাদলদের পিতৃপুরুষের ভিটে ছিল পূর্ববঙ্গে। কৃপাল, দয়ালদের জন্ম হয়েছিল পদ্মার ওপারে। বাদলের জন্ম স্বাধীন ভারতবর্ষে। গল্পের রচনাকাল ইংরেজি বছরের হিসেবে ১৯৬৯-৭০ খ্রি.। বাদল ১৮ বছর বয়সে খুন হয়। তাহলে বাদলের জন্ম সাল দাঁড়াচ্ছে ১৯৪৮-১৯৫২-র মধ্যবর্তী কোনো এক সময়। গল্পের সময়কাল সেদিক থেকে দেখতে গেলেও নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গিয়ে স্থিত হচ্ছে। অন্যদিকে 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট গত শতাব্দীর সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলন ঔপন্যাসিক সেটি স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন।

১৯৪৭-এ ভারতবর্ষ কাগজে কলমে ব্রিটিশ সরকারের কবল থেকে স্বাধীন হলেও সাধারণ মানুষ মুক্তির স্বাদ পায়নি। শুধু ক্ষমতার বদল ঘটেছিল। আগে বিদেশিদের দ্বারা এদেশের মানুষ শোষিত হতেন, এখন স্বদেশীদের দ্বারা। সুবিধাবাদী, ধূর্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এই দেশকে কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। আর সত্যিকারের স্বাধীন দেশ এদেশের অধিকাংশ মানুষের কল্পনাতেই রয়ে গিয়েছিল। তবুও স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এদেশের মানুষের মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম দিয়েছিল তাকে কাজে লাগায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। উত্তরবঙ্গের "অখ্যাত 'নকশাল বাড়ি' যেমন রাজনীতির পরিভাষায় ঠাঁই করে নিল, বিদ্রোহ ও আরক্ত প্রতিবাদের অনুষঙ্গ জড়িয়ে"[১]। তেমনি চোখের সামনে দিনের পর দিন এদেশীয় কিছু মানুষের ক্ষমতা, অর্থের আস্ফালন ও দম্ভ মেনে ও মানিয়ে নিতে নিতে, দিনের পর দিন বঞ্চিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত হতে হতে, সময় অখ্যাতজনের থেকে জন্ম দিয়েছিল বহু নেতার। বঞ্চনার দিনের অবসান ঘটিয়ে হিসাব নেওয়ার দিনে সাধারণ মানুষ রাতারাতি যেন রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। চিরচেনা দলীয় রাজনীতি এ নয়; এ রাজনীতি মানুষের বাঁচার, অধিকার বুঝে নেওয়ার।

স্বাধীনতার পরপর ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলো প্রবল বিরোধী হয়ে ওঠে। বিশ শতকের সাতের দশকে এদেশে কমিউনিস্ট দলগুলোর নানা কারণে ক্রমশ জনসমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সদস্যদের একাংশ যারা মনে করতেন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তন করতে পারলেই তবে মানুষকে স্থায়ী উপকার দেওয়া সম্ভব তারা ১৯৬৭ সালে দলের বিরোধিতা করে 'অল ইন্ডিয়া কমিটি অব কমিউনিস্ট রেভুলশনারী' (এ আই সি সি সি আর) নামক একটি পৃথক উগ্র বামপন্থী দল গঠন করেন। পরে ১৯৬৯ সালে 'এ আই সি সি সি আর' থেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী) দল গঠিত হয়। এই দল মাও সে তুং-এর আদর্শের অনুসরণে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন- চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সুশীতল রায়চৌধুরী, জঙ্গল সাঁওতালদের মতো নেতারা। শ্রেণিশত্রুকে চিহ্নিত করে তাদের খতমের মধ্য দিয়ে সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কথা তারা বলেন। এই সশস্ত্র বিপ্লবের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের 'নকশালবাড়ি'র কৃষক আন্দোলন।[২]

অতর্কিতে নকশাল আন্দোলন ছাত্র-যুবদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। বেকারত্ব, দুর্নীতি, দারিদ্র থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাদের এই পথে ঠেলে দেয়। লেখাপড়া ছেড়ে শ্রেণিশত্রুদের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনে তারাও সামিল হয়। কিন্তু অচিরেই এই আন্দোলন বিপথগামী হয়ে পড়ে। আর নকশালরা তখন ঘরে-বাইরে উভয় সংকটের মধ্যে পড়েন। একদিকে কংগ্রেসের মদতপুষ্ট পুলিশ প্রশাসন, অন্যদিকে কংগ্রেস দলের লোকজন, আর ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)রা যারা সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে ছিলেন না তারা এই তিন দলের কাছেই নকশালরা ছিলেন শত্রুপক্ষ বা বিরোধীপক্ষ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'পলাতক ও অনুসরণকারী' গল্পে নকশাল আন্দোলনের সময়কার এই চতুর্দলীয় রাজনীতি ও পরস্পরকে শত্রুভাবা ও হত্যার বিষয়কে সুন্দরভাবে ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষের এক অংশের কাছে প্রথম দিকে নকশালরা সমর্থন পেলেও, তাদের হাত ধরে দিন বদলের স্বপ্ন দেখলেও নকশালদের শ্রেণিশত্রুর সংজ্ঞা পরিবর্তনের ফলে নিষ্পাপ সাধারণ মানুষকে (যাদের সঙ্গে মানুষকে শোষণের কোনোই সম্পর্ক ছিল না) হত্যার বিষয়টা ভালোভাবে মেনে নেননি, তাদের উগ্র ধ্বংসাত্মক রাজনীতি পচ্ছন্দ করেননি। আবার এই নকশালদের অনেকেই ভয় কিংবা সুবিধা প্রাপ্তির লোভে দল এবং দলের সদস্যদের সঙ্গে বিরোধিতা করে। আলোচনার জন্য নির্বাচিত দুই রচনাতেই ওপরে উল্লেখিত রাজনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে।

(৩)

'শহীদের মা' গল্পের বাদল ও 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসের ব্রতী দুজনই মায়ের কনিষ্ঠ সন্তান (সে সময়কার পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির নবাগত নকশাল পন্থী দলের

ইঙ্গিতবাহী?)। দুজনই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে রাজনৈতিক হত্যার শিকার। ব্রতী নকশাল আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিল। বাদল কোন দলের সদস্য ছিল তা লেখক স্পষ্ট করে না জানালেও আমাদের মনে হয় বাদলও নকশালই ছিল।

'শহীদের মা' রচনায় 'জাগরী' উপন্যাসের মতো পরিবারের সকল পুরুষ সদস্য- বাদলের বাবা হরপ্রসাদ, বড়দা কৃপাল, ছোড়দা দয়াল এবং বাদল প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী; লেখক এই তথ্যটুকু দিলেও বাদল বাদে ('কমরেড বাদল' শব্দটি বাদলের কমিউনিস্ট মতাদর্শকে চিহ্নিত করে) আর অন্যরা কে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক তা লেখক স্পষ্ট করেননি। কিন্তু বাদলের বাবা হরপ্রসাদ কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তার বড়দা কৃপাল কংগ্রেস স্যোসালিস্ট বা সেই সময়কার কংগ্রেস বিরোধী কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত হয়), ছোড়দা দয়াল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সদস্য, আর বাদল যুক্ত হয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী) যারা নকশালবাড়ির আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল—সেই দলের সঙ্গে এমন অনুমান করাটা কি খুব অন্যায় হবে? কৃপাল, দয়ালের রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে বাবার অনুকরণ যদি একটা কারণ হয় বাদলের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। বাদল রাজনীতিতে যোগদান করেছে ছোড়দাকে আদর্শ মেনে। বক্তব্যের সমর্থনে লেখকের বলা কথা উদ্ধৃত করা হল—

"ছোড়দা দয়ালের দিকে ওর টান বেশি। বলতো, 'ছোড়দা ঠিক বলে।'

বিমলা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন?'

বাদল বলতো, 'আমাদের স্কুলের সব ওপর ক্লাসের ছেলেরা ছোড়দাকে মানে, ছোড়দা গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে সব ছেলেরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে।"[৩]

স্পষ্ট 'শহীদের মা' গল্পের রচনাকালের সময়কার পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির কথা মনে আসে। আর এই সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন 'অল ইন্ডিয়া কমিটি অব কমিউনিস্ট রেভুলশনারী' (এ আই সি সি সি আর) নামক উগ্র বামপন্থী দলটি কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) থেকে বিছিন্ন হয়েই গঠিত হয়। ফলে ছোড়দার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি বাদলের একসময় দুর্বলতা ছিল। কিন্তু নকশালরা যেহেতু ওপরে উল্লেখিত সমস্ত দলের লোকজনের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে সেজন্য খেয়াল করুন হরপ্রসাদ-কৃপাল-দয়াল বাদল ও বাদলের দল সম্পর্কে এধরনের শব্দ ব্যবহার করেছে- 'খুনী পার্টি', 'বাদল আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মস্তানি আর মারামারি করে বেড়াচ্ছে।', 'ওর বড় পাখনা গজিয়েছে। ও পাখনা পুড়ে যাবে।', 'বাদলার মরণ ধরেছে। পার্টির নেতাদের উস্কানিতে, ও নিজেকে কী একটা ভাবতে আরম্ভ করেছে।' আর শেষ পর্যন্ত বাদলকে নৃশংস খুন করা কোথাও নকশাল আন্দোলনের সময়কালে নকশাল যুবকদের হত্যার কথা আমাদের মনে করায়।

(৪)

বিমলা ও সুজাতা দুজনই স্মৃতিচারী। 'শহীদের মা' ও 'হাজার চুরাশির মা' দুটি রচনার

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল স্মরণ। অতীত ও বর্তমান এই দুই-এর মধ্যে বারবার চলাচল রয়েছে। আর দুই মায়ের ক্ষেত্রেই সন্তানের মৃত্যুর পরবর্তী জন্মদিন অত্যধিক গুরুত্ব পেয়েছে। দুই রচনার শিরোনামেই 'মা' শব্দের উল্লেখ আমাদের জানায় কাহিনি বয়ন করা হয়েছে মায়ের দিক থেকে। রচয়িতার প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহৃত হলেও মায়ের অনুভবের বিষয়টা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

বাদল এবং ব্রতী উভয়ই মায়ের সবথেকে প্রিয় সন্তান। দু'জনের মধ্যেই মায়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রকাশ পায়। সন্তানদের মধ্যে তদেরই মা-রা কাছে পেতেন। আজ সেই সন্তানরাই তাদের থেকে সবথেকে দূরবর্তী। বিমলার কাছে সন্তান প্রিয় হয়েছিল তার জন্মের সংস্কার সূত্রে (মাতৃমুখী) এবং মায়ের কাজে সাহায্য করে। অন্যদিকে সুজাতার কাছে ব্রতী প্রিয় হয়ে ওঠে পারিবারিক সদস্যদের মানস রাজনীতির কারণে। মায়ের দুঃখ বোঝে। কিন্তু বাদল ও ব্রতী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে তাদের মায়েদের কাছেও অপরিচিত হয়ে ওঠে। মায়েরা যেন তাদের বুঝে উঠতে পারেন না। আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে বাদল ও ব্রতী হয়ে ওঠে অপ্রিয়। এমনকি মৃত্যুর পরে মা বাদে পরিবারের অন্য সদস্যরা তাদের আরও দূরে ঠেলে দেয়। ফলে মা বাদে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে তারা বর্তমানে আক্ষরিক অর্থেই মৃত। তারা বেঁচে আছে শুধু মায়ের স্মৃতিতে।

বাদলকে তার বাবা দাদারা অন্য দলের কর্মী হিসেবেই দেখেছে। সেজন্য বাদলের মৃত্যুর পর তার শ্মশানযাত্রাতেও পর্যন্ত তারা সামিল হয়নি। অন্যদিকে 'হাজার চুরাশির মা' রচনায় ব্রতী 'মাদার্স চাইল্ড' হওয়ার কারণে পারিবারের অন্যদের কাছে 'অন্য' দলের হয়ে তো ছিলই, তার ওপর নকশাল হওয়ার কারণে যখন তাকে হত্যা করা হল তখন নিজেদের ভালো থাকায় যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য ব্রতীর লাশ নিতে যাওয়া, শ্মশানে যাওয়া তো দূরের কথা ব্রতীর নাম যেন খবরের কাগজে না বের হয় সেই মরিয়া চেষ্টায় দিব্যনাথ ও তার পরিবারের অন্য সদস্যরা সামিল হয় এবং সক্ষম হয়। ব্রতী নামক কেউ যে এই পরিবারে ছিল সেটাও তারা মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছেন। এমনকি পারিবারিক সম্পর্ক পরিচয়কেও যদি মুছে দেওয়া সম্ভব হতো তাহলেই তারা বেশি খুশি হতেন।

দুটি রচনাতেই সন্তানের জন্ম ও মৃত্যুর বর্ণনায় বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ দুই রচনায় মায়ের অনুভব প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু দুই রচনাতেই সন্তানের জন্ম মৃত্যু প্রায় একই রকম। বাদলের জন্মের সময় বিমলাই যেমন সমস্ত উদ্যোগ নেয় ব্রতীর ক্ষেত্রেও সুজাতা। পরিবারের অন্য সদস্যদের নিস্ক্রিয়তা দুই রচনাতেই রয়েছে। তাদের মৃত্যুর পরেও পরিবারের লোকজন তথা সমাজের মানুষের নিষ্ক্রিয়তা দুই মা কেই কষ্ট দিয়েছে। পরিবারের অন্য সদস্যদের খাওয়া-পরা, আমোদ-আহ্লাদে কোথাও পরিবর্তন দেখা দেয়নি। বাদল ও ব্রতী যে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল সেই দলের ছেলেরাও আজ তাদের ভুলে গেছে। সেসময় যারা

নকশালদের কাছে আশ্রয় খুঁজেছিল (সাধারণ মানুষ যারা সমর্থন করেছিল) তারাও আজ তাদের মনে রাখেনি। 'শহীদের মা' রচনায় কমরেড বাদলের শহীদবেদী দ্রুত ভেঙে যাওয়া, কুকুরের আর আশ্রয় গ্রহণ না করার ব্যঞ্জনায় তা স্পষ্ট।

'হাজার চুরাশির মা'র সুজাতা উচ্চবিত্ত পরিবারের শিক্ষিতা, রোজগেরে স্বাধীনচেতা মহিলা। আর 'শহীদের মা'র বিমলা নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের তথাকথিত অশিক্ষিতা, বাইরের জগত শূন্য সংসারের বৃত্তে আবদ্ধ মহিলা। সুজাতা সেই উচ্চবিত্তের গণ্ডি পেরিয়ে নিম্নবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তকে চিনেছে ব্রতীর মৃত্যুর পর, যেটা ব্রতী মৃত্যুর আগে শ্রেণিচ্যুতির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করেছিল। সন্তান হারানোর আঘাত বিমলা ও সুজাতার শ্রেণি ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। যেমন করে 'হাজার চুরাশির মা'র সুজাতা উপলব্ধি করেছিলেন- "ব্রতী তাঁকে, তাঁর নিঃসঙ্গ শোকের 'একাকিত্বে রেখে চলে যায় নি। তাঁর মতো আরো বহুজনের সঙ্গে তাঁকে এক করে, আত্মীয় পাতিয়ে দিয়ে গেছে।"[৪] প্রত্যেক পাঠকও রাজনীতির চক্রজালের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে বিমলা সুজাতাদের কাছের হয়ে ওঠেন। সন্তানের মৃত্যু তাদের মধ্যে প্রতিবাদী সত্তার জন্ম দেয়। যে বিমলা সন্তানের মৃত্যুর দিনেও রান্নাঘরে রান্না করতে গিয়েছিলেন স্বামী-পুত্র কি খাবে এই ভেবে সেই বিমলাই আজ স্বামী-সন্তানদের ডাকে সাড়া দেন না, রান্না চাপান না। ঘরে ফেরার কথায় সকলের মুখের ওপর বলেন- 'না'। বিমলার এই নতুন রূপ সবার কাছে অপরিচিত মনে হয়। পুরুষতন্ত্রের শৃঙ্খলে বদ্ধ সুজাতার ক্ষেত্রে এই প্রতিবাদ ব্রতীর জন্মের আগে থেকেই জমা হচ্ছিল, যেটা উপন্যাসের শেষে এসে বিস্ফোরণের রূপ নেয় (অ্যাপেনডিকস্ ফেটে যাওয়ার রূপকে)। বাদল ব্রতীরা সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই-এর শিক্ষা পেয়েছিল সময়ের থেকে। আর বিমলা ও সুজাতা পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জোর পেয়েছে সন্তানের মৃত্যুর আঘাতের মধ্য দিয়ে।

ওপরের মিলগুলি ছাড়াও 'শহীদের মা' ও 'হাজার চুরাশির মা' রচনা দুটোর মধ্যে আরও বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। দুই রচনাতেই ছোটবেলায় সন্তানের প্রবল অসুখে জীবন সংকট মায়ের স্মৃতিতে আজও অমলিন। 'শহীদের মা' রচনায় বাদলের হয়েছিল টাইফয়েড, আর 'হাজার চুরাশির মা' রচনায় ব্রতীর জন্ডিস। টাইফয়েড জ্বরের প্রসঙ্গ কিন্তু 'হাজার চুরাশির মা' রচনায় সমুর প্রসঙ্গে আনা হয়েছে।

দুই রচনাতেই পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য ও পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের বিষয় রয়েছে। যেজন্য ব্রতী তার বাবা দিব্যনাথকে 'বস' বলেও ব্যঙ্গ করেছে। হরপ্রসাদকেও আমরা বলতে শুনি- "ওসব কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে থাকতে হলে, তোকে ওই পার্টি ছাড়তে হবে।"[৫] আধিপত্যের এধরনের উচ্চারণ বিমলার ভালো লাগত না। সুজাতারও পছন্দ ছিল না দিব্যনাথের আচরণ। পিতার একনায়কতন্ত্রের প্রতি কৃপাল, দয়ালরা চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কিন্তু বাদল ধীর-স্থিরভাবে যুক্তি দেয়। বাদল ও ব্রতী প্রয়োজনে

গৃহত্যাগের কথাও ভাবে। বাদলের এই আচরণ আর ব্রতীর শান্তভাবে কথা বলা আসলে তৎকালীন সময় ও রাজনীতি সচেতন বিবেকবান যুবক সম্প্রদায়ের স্বাধীন, যুক্তিবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। যা পূর্ব-প্রজন্মের মধ্যে অভাব ছিল। কৃপাল, দয়ালরা তাই ঘরছাড়ার কথা চিন্তাও করতে পারে না। প্রবীণরা তাদের চেনা ছকের সুখের বৃত্ত ছেড়ে বেরুতে চায়নি। এমনকি নবীনরা বেরুতে চাইলে তারা বাধা সৃষ্টি করে। নকশালরা তাদের পারিবারিক সমর্থন পায়নি। আর ব্রতীর বাবার ক্ষেত্রে তো বিষয়টা আরো জটিল। কারণ তিনি নিজেই বুর্জোয়া- যাদেরকে শ্রেণিশত্রু বলে ব্রতীদের মনে হয়। আর হরপ্রসাদকে যদি ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের সদস্য ধরা হয় তাহলে তো বাদলের মূল লড়াই তার পিতার বিরুদ্ধে। আর একটি বিষয় খেয়াল করুন 'শহীদের মা'র হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল কিংবা 'হাজার চুরাশির মা'-র দিব্যনাথ, জ্যোতি, নীপা, তুলিদের কাছে সমাজকে পচা-নষ্ট মনে হয়নি। যেটি বাদল ও ব্রতীর কাছে বোধ হয়েছে। আর যে কারণে তারা সামগ্রিক ব্যবস্থার বদল চেয়েছে। আর সেজন্য বাদল ও ব্রতীর রাজনৈতিক দল- 'খুনি পার্টি'র তকমা পেয়েছে। তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপরে উল্লিখিত চতুর্দলের বাইরে বিমলা ও সুজাতাকে যদি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি ধরা হয় তাহলে দুই রচনার আর একটা পাঠ ও সাদৃশ্য আমাদের সামনে উঠে আসে।

(৬)

স্বরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ বসুর 'স্বনির্বাচিত ছোটগল্প' গ্রন্থের "অশান্ত বসন্তে একটি অনুমেয় ভূমিকা" নামক শিরোনামের মুখবন্ধে লিখছেন- 'আধুনিক ব্যক্তির অনন্যোপায় ট্র্যাজিক প্রকৃতিকে সমরেশ তাঁর গল্পে উপন্যাসে যে মর্যাদা দিলেন, সেটাই গল্প লেখক হিসাবে তাঁকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য।' প্রকৃতি বা নিয়তির মতো রাজনীতিও আমাদের জীবনে অনন্যোপায় ট্র্যাজেডির কারণ হয়ে উঠেছে 'শহীদের মা' রচনায় লেখক তাই দেখিয়েছেন। আর "ব্রতী যদি জ্যোতির মত প্রচুর মদ খেত, নীপার বরের মত মাতলামি করত, ব্রতীর বাবা যেমন সেদিনও এক টাইপিস্ট মেয়েকে নিয়ে ঢলাঢলি করেছেন, তাই করত, ঝানু জোচ্চোর হত টোনি কাপাডিয়ার মত, দুশ্চরিত্র হত ওর দিদি নীপার মত, যে এক পিসতুত দেওরের সঙ্গে প্রায় বসবাস করে; তাহলে ওরা ব্রতীকে বিপক্ষ মনে করত না।"[৬] তার বাবা, দাদাদের মতো ব্রতী ভোগের জীবনকে বেছে নেয়নি, আত্মকেন্দ্রিকতায় ডুবে যায়নি, সুখের সংজ্ঞা বলতে সকল মানুষের সঙ্গে ভালো থাকাকে বুঝেছে বলেই তাকে লাশে পরিণত হতে হয়েছে। আসলে বিবেকবান মানুষদের কষ্ট বেশি। কারণ তারা যে নিজের বেঁচে থাকা এবং সমাজের মানুষদের বেঁচে থাকা নিয়ে ভাবে এবং প্রশ্ন তোলে। এমনকি নিজের সঙ্গেও তর্ক করে। তাদের যুক্তির পাল্টা যুক্তি বা প্রশ্নের উত্তর সমাজ দিতে ব্যর্থ হয় বলেই বাদল, ব্রতীদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হয়।

আলোচনা শেষ করা যাক 'শহীদের মা' গল্পে বাদলকে করা বিমলার একটা প্রশ্ন দিয়ে।

সমাজে আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা যারা রাজনীতির কচকচানি চাই না, চাই শান্তি, চাই মানুষে মানুষে মিলে মিশে এক সৌহার্দ্যের পরিবেশ; বিমলা 'জাগরী' উপন্যাসের মায়ের মতো তাদের প্রতিনিধি হয়ে যেন বাদলকে বলছেন- 'কেন, তুই বাবা দাদাদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে পারিস না?' এর উত্তরে বাদল যে কথা বলেছিল তাতেই উঠে আসে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মনস্তত্ত্ব- "বাবা দাদারা বুঝি মিলে-মিশে আছে? পার্টির ব্যাপারে কারোর সঙ্গে কারোর মিল-মিশ হবে না।. পার্টির সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারব না। তা বাবা আর দাদারা আমাকে যতই শাসাক।"[৭] এভাবেই রাজনীতি মানুষে মানুষে দূরত্ব রচনা করে। সামাজিক সম্পর্ক তো দূরের কথা পারিবারিক সম্পর্ককেও বিষিয়ে তোলে- "পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়।"[৮] নিজস্ব আদর্শ বা বিশ্বাসকে মানুষ সর্বদা গুরুত্ব দিতে চায়, তৈরি করতে চায় নিজস্ব পরিচিতি ও জগৎ। কিন্তু রাজনীতিতে অন্যের আদর্শ বা বিশ্বাসকে অস্বীকার করে নিজের আদর্শের বিপরীত জনকে শত্রু ভাবতে শেখানো ও মানুষের স্বেচ্ছাচারের জগৎ নির্মাণের বিষয়টা কখনই সমর্থন যোগ্য নয়। 'শহীদের মা' ও 'হাজার চুরাশির মা' রাজনীতির কারণে মানুষকে শত্রু ভাবা, হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গল্প। রাজনৈতিক হত্যার কারণে যে বা যারা তাদের প্রিয় মানুষকে হারিয়েছে তাদের দুঃখে সমব্যথী হওয়ার আখ্যান।

**তথ্যসূত্র :**


১. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯৭, পৃ ১০৩

২. এই বিষয়ক তথ্যের জন্য উইকিপিডিয়া এবং পুলকেশ মণ্ডল ও জয়া মণ্ডল (সম্পাদিত) সেই দশক নকশাল আন্দোলন : ফিরে দেখা, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৪ বই-টির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে

৩. সমরেশ বসু, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ ১৫১

৪. মহাশ্বেতা দেবী, হাজার চুরাশির মা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বিংশ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ ৫২

৫. সমরেশ বসু, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ ১৫২

৬. মহাশ্বেতা দেবী, হাজার চুরাশির মা, পৃ ৩০

৭. সমরেশ বসু, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ ১৫৪

৮. ওই, পৃ ১৫১।

# ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ ও ‘কোথায় পাবো তারে’- কালকূটের ভারতবোধের আধার

মিঠু সরকার

**সংক্ষিপ্তসার**

সমরেশ বসু আশৈশব ছিলেন ঘরছাড়া। নিজে নিঃসঙ্গ অথচ মানুষের সঙ্গ তার পরম প্রিয়। অন্যের সংসারের হালহদ্দ জানার তীব্র কৌতূহল ছিল, কিন্তু নিজে ছিলেন সংসারে পরবাসী। অমৃত পিপাসার টানে ছুটে চললেন আর নিজের রক্তে মিশিয়ে নিলেন ‘কালকূট’- যার অর্থ তীব্র বিষ। সমরেশ বসুর লেখক সত্তার দুটি স্তর দুটি ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত। সমরেশ বসু ও কালকূট। প্রথম জন বাস্তবহীন, সচেতন ও জীবন জিজ্ঞাসু। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে সামাজিক বাতাবরণের মধ্যে মানুষের শিকড় ধরে নাড়া দেওয়ার চেষ্টাই তাঁর কাজ। আর কালকূট বারমুখো এক ভাবুক অভিযাত্রী, অতীন্দ্রিয় টানে মাঝে মাঝেই তাঁর ডানায় কাঁপন লাগে। সংসারের বিচিত্র নরনারীর ব্যক্তিগত সুলুক সন্ধানেই কালকূট ঘর ছেড়ে ছুটে যান তথাকথিত সমাজের বাইরের আঙিনায়। সমরেশ বসু হয়তো নিরাসক্ত শিল্পী , কালকূট হয়তো ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসক্ত সংরাগে কূট জীবনের গরল মন্থন করে অমৃতের প্রত্যাশী। রুঢ় বাস্তবের প্রেক্ষিতে কালকূট নিজেকে বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনই কালকূটের কাছে অমৃত। আর এই অমৃতের সন্ধানেই তার যাত্রা। ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ ও ‘কোথায় পাবো তারে’ আসলে এক ভারতীয়ের আর্ত ও আত্ম-অনুসন্ধানের কাহিনি। যতটা আত্মার তার থেকে বেশি আত্মীয়ের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানই কালকূটকে নিয়ে গেছে বিশিষ্ট ভারত জিজ্ঞাসায়। তাই আমরা দেখতে পাই ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ ও ‘কোথায় পাবো তারে’ উপন্যাসে তাঁর সেই ভারতবোধের চেহারাই উন্মোচিত হয়েছে।

**মূল প্রবন্ধ**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন সমরেশ বসু। বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি থিয়েটার করা, বাঁশি বাজানো, গান গাওয়া, ছবি আঁকায় যথেষ্ট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই ভবঘুরে ও মিশুকে প্রকৃতির এই মনিষী জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে পূর্ণ করেছেন। সমরেশ বসু আশৈশব ছিলেন ঘরছাড়া। নিজে নিঃসঙ্গ অথচ মানুষের সঙ্গ তাঁর পরম প্রিয়। অন্যের সংসারের হালহদ্দ জানার তীব্র কৌতূহল ছিল, কিন্তু নিজের সংসারে ছিলেন পরবাসী। অমৃত পিপাসার টানে ছুটে চললেন আর নিজের রক্তে মিশিয়ে নিলেন ‘কালকূট’- যার অর্থ তীব্র বিষ। কালকূট ছদ্মনাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সমরেশ বসু নিজে বলেছেন —“কার আজ্ঞায় কে বা রাখে নাম। নাম, কালকূট। ছদ্ম নামের প্রয়োজন হয়, নামের আড়াল থেকে নিজেকে ব্যক্ত করা। এমন না যে সংসারেতে

এসেছিলাম কিছু কথা বলব বলে। বরং বলতে হয় 'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে / আমার ঘরের কাছে আরশিনগর এক পড়শি বসত করে। ..আসলে তো আরশিনগরটি তার আপন দেহ, পড়শিটি হলেন তাঁর সাধক সত্ত্বা।' কিন্তু আমি তো আর সাধক না। অতএব বলি, নামের আড়াল থেকে নিজেকে ব্যক্ত করা কথাটা তেমন যুতসই লাগছে না। বরং আমার আরশিনগর যদি হয় জগত ও জগতজন, তাদের মধ্যে আমার পড়শি সত্ত্বাটিকে সন্ধানই নামের আড়ালে ঘুরে ফেরা। ..আড়াল দিয়ে খুঁজে ফিরি বোধ হই নিজেকেই। তারই নাম কালকূট।"[১]

প্রাথমিকভাবে 'ভোটদর্পণ' নামে একটি রাজনৈতিক লেখার সূত্রে কালকূটের বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরে কালকূটের দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ ঘটে পরিচয় পত্রিকায় 'আদাব' গল্প রচনার মধ্যে দিয়ে। সমরেশ বসুর লেখক সত্তার দুটি স্তর দুটি ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত। সমরেশ বসু ও কালকূট। প্রথমজন বাস্তবহীন, সচেতন ও জীবন জিজ্ঞাসু। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে সামাজিক বাতাবরণের মধ্যে মানুষের শিকড় ধরে নাড়া দেওয়ার চেষ্টাই তাঁর কাজ। আর কালকূট বারমুখো এক ভাবুক অভিযাত্রী, অতীন্দ্রিয় টানে মাঝে মাঝেই তার ডানায় কাঁপন লাগে। সংসারের বিচিত্র নরনারীর ব্যক্তিগত সুলুক সন্ধানেই কালকূট ঘর ছেড়ে ছুটে যান তথাকথিত সমাজের বাইরের আঙ্গিনায়। সমরেশ বসু হয়তো নিরাসক্ত শিল্পী, কালকূট হয়তো ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসক্ত সংরাগে কূট জীবনের গরল মন্থন করে অমৃতের প্রত্যাশী। তবে মাঝে মধ্যেই সমরেশের মধ্যে কালকূট আর কালকূটের মধ্যে সমরেশকে আমরা খুঁজে পায়। এ প্রসঙ্গে সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে' ও কালকূটের 'আরব সাগরের মন লোনা' উপন্যাস দুটির উল্লেখ করা যায়। আসলে কালকূট মূলত ভ্রমণ রসিক শিল্পী। ভ্রমণের বৈচিত্র্য অনুযায়ী তাকে বলা যায়- সুদূর ভ্রমণ, অদূর ভ্রমণ ও মানস ভ্রমণ। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' সুদূর ভ্রমণ জাতীয় রচনা।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' রচনাটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই রচনাটির মাধ্যমেই কালকূটের সগৌরব আগমন ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। এই রচনার মাধ্যমে বোঝা গেল যে কালকূটের রচনার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ, তাঁর জীবন, তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর প্রেম, তাঁর মুক্তি। এটাই কালকূটের শিল্পীসত্তার প্রধান অন্বিষ্ট, এরই সন্ধানে কালকূট ছুটে গেছেন মানুষের মিলনক্ষেত্রে তথা মেলায়। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'র দ্বিতীয় সংস্করণে 'বিচিত্র' নামের সংযোজনীতে কালকূট লেখেন—"অনেক বিচিত্রের মধ্যে মানুষের চেয়ে বিচিত্র তো আর কিছু কোনদিন দেখিনি। সে বিচিত্রের মধ্যেই আমার অপরূপের দর্শন ঘটেছে। সব মানুষই একজন নন। আর একজন আছেন তার মধ্যে। একজন যিনি কাজ করেন; বাঁচবার জন্য, গলদঘর্ম দিবানিশি। যিনি আহার মৈথুন সন্তান পালনের মহৎ কর্তব্যে ব্যাপৃত প্রায় সর্বক্ষণ। এই জটিল সংসারে যার অনেক সংশয়, ভয় প্রতি পদে পদে।"[২]

মানুষের দার্শনিক অবস্থানের এবং অস্তিত্বের মোহমানসের পর্দা উন্মোচন করে

অন্দরমহলে উঁকি দেওয়াই যেন কালকূটের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। কালকূটের রচনায় মানুষের ভিতরে যে আর এক মানুষের বাস, তারই প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। ভ্রমণকে কেন্দ্র করে কালকূটের অন্বেষণ আসলে মাটির মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করা। তিনি যাদের সান্নিধ্যে আসেন, তাদের ভিতরে সন্ধান করেন অচিন সত্ত্বাকে। আবার পুরাণ জাতীয় ইতিহাসের চরিত্রের মানবায়ন ঘটান কালকূট। বিচিত্র মানুষের সন্ধানে কালকূটের ঘর ছেড়ে বাইরে যাত্রা। কালকূটের এই যাত্রাপথের প্রথম পদক্ষেপ 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'। সমালোচক ও কালকূটের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—"তখনও আমাদের স্বাধীনতা কৈশোর ডিঙোয়নি। বাংলা উপন্যাসের জগতে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রতি যে পক্ষপাত তখন জেগেছিল, তাকে আমরা যতই সমালোচনা করি না কেন, একটা মূল ছিল স্বাধীনত-উত্তর দেশপ্রেম। যে দেশপ্রেম এতদিন ইংরেজের প্রতিমুখে স্থাপিত হয়েই আত্মপরিচয় দিয়েছে, সে দেশপ্রেম এবার আরও গভীরে যেতে চাইল। দেশকে- বিশাল ভারতবর্ষকে সে এবার চিনতে চাইল মমতায় এবং জিজ্ঞাসায়। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' সেই ভারতবোধের অভিজ্ঞানকে প্রথম থেকেই সযত্নে ধারণ করে রেখেছে।"[৩]

যে ট্রেনে কালকূটের অমৃতকুম্ভে যাত্রা, তার চলার ছন্দেই শোনা গেছে ভারতবোধের অভিজ্ঞান। ট্রেনটাও ধরা দিয়েছে এক প্রতীকই তাৎপর্যে। 'আমরা বেরিয়ে পড়েছি যে যার ছকে বাধা ভদ্রাসনটি ত্যাগ করে বিশাল ভারতবর্ষের বুকে'। কালকূট কোনো আঞ্চলিকতাকে পাত্তা না দিয়ে খুঁজে বেড়ালেন ভারতের মহামেলায় বহু কালের কলরবের মাঝে মানুষকে। যে মানুষ সমস্ত জটিলতাকে ছিন্ন করে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়। আসলে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে এনেছিল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। কালকূট স্বয়ং এই কাহিনির নায়ক হলেও চরিত্রে তিনি অনুসন্ধিৎসু বাউল। প্রয়াগের মেলা তাঁর গন্তব্য। অবশ্য তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য সঙ্গমে অবগাহন করে জাগতিক পাপ আর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ নয়; বরং বহু মানবের আগমনে রচিত ভারততীর্থের ধূলাস্নান। তাই কালকূট বলেন—"বৈচিত্র্যের সন্ধান আমাদের মনেরই সন্ধান। মানুষ খোঁজার ছলে আমরা মন খুঁজি। তাই বন্ধু যখন বিদ্রূপ করে বললে, 'কেন যাচ্ছ কুম্ভমেলায়? ধর্ম করতে নাকি?' ধর্মের নামে যে হিসাবে ধার্মিক বোঝায়, আমি তা নই, আবার বিধর্মীও নই। আমরা সেই মানিকবাবুর 'লেভেল ক্রসিং'এর নায়কের মতো। বললাম 'দেখতে। কী দেখতে? লক্ষ লক্ষ ধর্মান্ধ মানুষকে?' ধর্মান্ধ! লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি ধর্মান্ধ হয়, তবে খুঁজে দেখি না কেন, লক্ষ মনের কোন চোখে পরানো আছে সেই ঠুলি।"[৪]

সন্দেহ নেই, কালকূট তাঁর এই লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন শেষ পর্যন্ত। আমরা আমাদের চারপাশের পরিচিত মানুষের মধ্যে যারা সাধারণত আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়, তাদের এক স্বতন্ত্র রূপ ও স্বরূপে আবিষ্কার করি কালকূটের আলোচ্য রচনায়।

প্রয়াগের মেলা মানেই মানুষের মেলা। অবশ্য মেলা এখন ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

যেমন সঙ্গীতমেলা, স্বর্ণমেলা, বইমেলা, পুষ্পমেলা ইত্যাদি। যাইহোক আমরা প্রয়াগমেলা বা কুম্ভমেলার বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল কালকূটের অন্বেষণ। মানুষের মনের অন্দরমহলে উঁকি মারা। কাহিনির শুরুতে এক যক্ষা রোগীর মৃত্যু প্রাথমিকভাবে আমাদের হতাশ করলেও ক্রমশ আমরা বুঝতে পারি জীবন রসিক কালকূট আসলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনকেই মহৎ করে তুলতে চেয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও গল্পে আমরা একাধিক মৃত্যু ও আত্মহত্যার ছবি পেয়েছি। যা জীবনকে আরও মহান ও বিচিত্ররূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' চরিত্রের অভাব নেই। বহু চরিত্রের ভিড়ে উল্লেখযোগ্য অবশ্যই বলরাম চরিত্রটি। সমগ্র কাহিনি ও কালকূটের মানসভূমি জুড়ে রয়েছে বলরাম। তার মৃত্যুতে কাহিনি শেষে ম্যাজিক বোধ ও এক মহত্ত্ব জীবনের ভূমিকা তৈরি হয়। আর লক্ষ্মী দাসী যেন আরও পরিপূর্ণ হতে হয়ে ওঠে এই মৃত্যুর ছোঁয়ায়। কুম্ভমেলার পটভূমিতে কাহিনি গতিলাভ করেছে একের পর এক ঘটনায়। টাঙ্গায় চলতে চলতে শ্যামার সঙ্গে কালকূটের দৃষ্টি বিনিময়, শ্যামার মানসিক পরিবর্তন, ভূতানন্দ ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ প্রেম, নারী-পুরুষ বালকের বিবস্ত্র হয়ে সঙ্গমে স্নান, শ্যামার সঙ্গে কালকূটের সম্পর্ক, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের প্রাথমিক পর্বে বিরোধ ও পরে বন্ধুত্ব- ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত ঘটনার হাত ধরে কাহিনি এগিয়ে গেছে তার পরিণতির দিকে।

কাহিনির যাবতীয় ঘটনার কেন্দ্রীয় পাত্র অবশ্যই কালকূট স্বয়ং। তাকে কেন্দ্র করে কাহিনির তীর্যক, জটিল তথা সরল স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। কারণ কালকূট এখানে কেবলমাত্র দ্রষ্টা নন, ঘটন-অঘটনের স্রষ্টাও বটে তিনি। ব্যক্তি মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতার সাথে কালকুট নিজেকে এক আশ্চর্য ক্ষমতায় সম্পৃক্ত করে নেন। তাই তো কুম্ভমেলায় তিনি হারিয়ে যাননি, বরং হয়ে ওঠেন কারো বিশ্বাসের পাত্র, কারো সান্ত্বনার আশ্রয়, কারো বা আগ্রাসী প্রেমের আধার। অন্যদিকে এই কুম্ভমেলাতেই বলরামের দুটি আশ্রয়- লক্ষ্মী দাসী ও কালকূট। লক্ষ্মী দাসী বলরামের বেঁচে থাকার প্রেরণা, চলার শক্তি। আর কালকূট বলরামের বন্ধু। ধীরে ধীরে বলরাম মিশে যেতে থাকে কালকূটের মধ্যে। শ্যামা ও কালকূটের সম্পর্কের মাঝে বলরাম নিজেকে স্থাপন করে। কালকূট আর বলরামকে ঘিরে তৈরি হতে থাকে একের পর এক সম্পর্কসূত্র। কিন্তু কোন সম্পর্কই লেখক কালকূট পরিণতি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। কারণ ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে কালকূট জীবনের পূর্ণতার স্বাদ পেতে চান। অনন্ত জীবনপ্রবাহে মিশে যাবার পরিণতিবোধই কালকূটকে টেনে নিয়ে গেছে ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে। যে সর্বনাশী মেয়েটি কালকূটকে সর্বদা হেনস্থা করেছে, তার চারিত্রিক পরিবর্তনে কালকূট বলেন 'পরিবেশ ও কাজের গুনে মানুষের চেহারাও কি বদলে যায়? তাই। তাই যায়।' তখন আমরা বুঝতে পারি, এই মেয়েটির জীবনের রূঢ় বাস্তবের প্রেক্ষিতে আসলে কালকূট নিজেকে বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনই কালকূটের কাছে অমৃত। আর এই অমৃতের সন্ধানেই তার যাত্রা। ভারত সংস্কৃতির

অনুসরণে ধর্ম ও প্রেমের পাশাপাশি নারী সত্তার স্বরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে কালকূট এক স্বতন্ত্র পথের দিশারী। এ প্রসঙ্গে রুক্মিণী চরিত্রটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রয়াগের রুক্মিণী। কালকূট বলেন "হে ব্রহ্মা ও জ্ঞান তোমার নাম রুক্মিণী। হে পৃথিবী তোমার নাম রুক্মিণী। এই হিমালয় ও গঙ্গা, এই বিহঙ্গ ও গাছ, এই আকাশ ও মাঠ সকলেই রুক্মিণী নামে ও রূপে সুন্দরী। হে অবধূত হংস তুমি আসলে দেহস্তিত একটি নারী।" তিনি দেখিয়েছেন এই রুক্মিণীকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। আর ভোগ তো সুদূর পরাহত।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানের' যাবতীয় চমৎকারিত্ব মেনে নিয়েও একটি কথা না বললেই নয়, এই রচনার কাহিনিতে পাওয়া যাবে বহু চরিত্রের কষ্টকল্পিত অবয়ব। যার মধ্যে দিয়ে উঁকি দেয় এক ধরনের মেলোড্রামা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সর্বনাশী, ভূতানন্দ, খান পিসি, প্রহ্লাদ ইত্যাদি চরিত্র কথা। তবে সমকালের পাঠক অকুণ্ঠ চিত্তে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধান'কে গ্রহণ করেছেন। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' সমরেশ বসুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও কালকূটের ভারত সন্ধান তথা ভারত বোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সমরেশ বসুর ভারত সন্ধানের আর একটি নিদর্শন হল- 'কোথায় পাবো তারে'। এই রচনায় কালকূটের বিস্ময়কর যাত্রা বাংলাদেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সংসারের সাবেক বন্ধন ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন মনের মানুষ খুঁজতে। ব্যাকুল যাত্রাপথে তার নিরন্তর বিপন্ন জিজ্ঞাসা- কোথায় পাব তারে? কালকূট রূপের কারবারি। অশেষ অরূপের নিত্য সন্ধানে নবনগর রূপে মানুষ আসে তার চেতনার দ্বার উন্মোচনে। এই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ অরূপের মধ্যে নিহিত আছে কালকূটের ভারতবোধ তথা ভারতসংস্কৃতি। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে 'বাবুর যাওয়া হবে কোথায়?' এই বাক্য বন্ধ দিয়ে। তারপর বসিরহাট এবং সন্নিহিত অঞ্চল ঘুরে কালকূট পৌঁছেছেন ২৪ পরগনার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে। তারপর তিনি চলে গেছেন রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায়। যাবার পথে পড়েছে মুলাটি, আর সেখানেই প্রসঙ্গত এসেছে চন্ডীদাস তীর্থ ও নানুরের কথা। সেখান থেকে বক্রেশ্বর ঘুরে কেন্দুলী চলে গেছেন। একের পর এক অতিক্রম করেছেন বিভিন্ন জায়গা- নবদ্বীপের ধুলোটি উৎসব, বর্ধমানের কুলীন গ্রামের মেলায়, মৌগ্রামে জলেশ্বর এর মেলায়, তারপর হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের স্মরণ মেলায়। বিস্তৃত চালচিত্রে দীর্ঘ পরিক্রমায় রয়ে গেছে অগণিত চরিত্রের যাওয়া-আসা। চরৈবতি মন্ত্রপূত এই দীর্ঘ যাত্রাপথে কালকূটের বিশেষ অনুসন্ধিৎসা সর্বদা বাউল সঙ্গেই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

'কোথায় পাবো তারে' উপন্যাসে কালকূট পৌষ মেলার ছবি এঁকেছেন সম্পূর্ণরূপে। ভাষার অসাধারণ নির্মিতিতে ঐশ্বর্যময় যে ভাবময়তা, চিত্ররূপে তা প্রকাশ পেয়েছে— "সাতুই পৌষ, সকালবেলার প্রথম শুরু ছাতিমতলায়। গম্ভীর উচ্চস্বরে প্রথম উচ্চারিত স্তোত্র। ..ছাতিমের ছায়াতলে বেদি, সেখান থেকে উচ্চারিত হয় স্তোত্র। সুরে, গম্ভীর্যে, রবে যেন কোন দুর্দিনের স্মৃতি নিয়ে আসে মনে। দূর কালের ছবি জাগিয়ে দেয় চোখে।"[৫]

এই ধরনের তথ্যনিষ্ঠ ছবি ছাড়াও এখানে আছে মেলার নানান কোলাজ। প্রকৃতি আর মানুষের নানা টুকরো টুকরো ছবি আর বাউল সংগীতের আসর। আছে বাউল ও তাদের সঙ্গিনীদের কথা, যাদের গানের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকে দেহতত্ত্বের ইশারা। বাউলের স্বাধীকা নারী প্রকৃতি বিন্দুর আখরায় কালকূটের বাউল জীবনচর্চার প্রতি কৌতূহল দেখা যায়। এই রচনায় কালকূট দুজন বাউল চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। একজন গাজী, আর দ্বিতীয় জন গোপী দাস। গাজী বসিরহাটের রাস্তায় ঘোরা এক স্বঘোষিত বাউল। গাজীর মাথায় পাগড়ী, হাতে বালা, ডুবকি বাজিয়ে সে বাউল গান গায়। কালকূট এই গাজীর জীবনে ঢুকে পড়েন। কারণ তিনি মানুষ ও জীবন দুই-ই দেখেন। গাজীর বাউল বেশের অন্তরালে যে একটা ছাপোসা বিত্তহীন অসহায় মানুষ আছে, কালকূট পরম মমতায় তাকে আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেন।

এই উপন্যাসের একটি চরিত্র ঝিনি, ওরফে অলকা চক্রবর্তী। অলকার কথা না বললে আলোচনাটি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দীর্ঘ ভ্রমণ পথে একাধিক স্থানে অলকা কালকূটের ভ্রমণসঙ্গিনী। কালকূটকে একান্ত করে পাবার চঞ্চলতায় অলকার আকুলতা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু কালকূট কোন বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাননি। তাই তিনি চলে যান সুদূরের আহ্বানে, বিচিত্র মানুষের সন্ধানে। কালকূট নিজেই বলেন 'বিদেশের কথা জানিনা।. কিন্তু ভারতবর্ষের দরজা খুলে উঁকি দাও। দেখবে হাটের মাঝে, চালচুলোহীন মানুষ তত্ত্ব কথা বলে। গাছতলাতে নগ্ন মানুষ জীবন ব্যাখ্যা করে। এই দেশেতেই আছে কেবল, সোনার মুকুট ছার, রাজার ছেলে বটতলাতে রাজার রাজা সাজে। আলখাল্লা গায়ে তুলে উর্দবাহু নাচে। কেতাব পুঁথি রাখো, এমন জায়গায় এমন জিনিস পৃথিবীর আর কে আমাকে দেবে।' বোঝা গেল যে, 'কোথায় পাবো তারে' আসলে এক ভারতীয়ের আর্ত ও আত্ম-অনুসন্ধানের কাহিনি। যতটা আত্মার তার থেকে বেশি আত্মীয়ের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানই কালকূটকে নিয়ে গেছে বিশিষ্ট ভারত জিজ্ঞাসায়, তাঁর ভারতবোধের চেহারা উন্মোচিত হয়েছে এভাবেই। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ও 'কোথায় পাবো তারে' রচনা দুটি এভাবেই কালকূটের ভারতবোধ ও ভারতসংস্কৃতির আধার হয়ে উঠেছে।

**তথ্যসূত্র :**

১) সমরেশ বসু, গাহে অচিন পাখি, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২, পৃষ্ঠা-৩২।
২) কালকূট, কালকূট রচনা সমগ্র ১, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৩১৫-৩১৬
৩) কালকূট, ভূমিকা, কালকূট রচনা সমগ্র ১, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১১
৪) কালকূট, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, কালকূট রচনা সমগ্র ১, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৯
৫) কালকূট, কোথায় পাবো তারে, কালকূট রচনা সমগ্র ৩, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৩৪

# পুরাণের প্রতিফলকে কালকূটের 'শাম্বাদিত্য'

রিয়া দাড়িয়া

'ধর্ম এব হতো হন্তি/ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ' মহাভারতের বনপর্বে বসুদেব কৃষ্ণ এই উক্তির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেন ধর্মের বাণী—ন্যায় ও ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্মও তাকে রক্ষা করে। এ নিউটনের প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ার মতোই এক সত্তা। পূর্বে রাশিয়া থেকে পশ্চিমে ভিয়েতনাম পর্যন্ত সুদূর বিস্তৃত এই পৌরাণিক ভারতবর্ষ আরাবল্লীর মতোই প্রাচীন, পূর্বের দেবভূমি নামে পরিচিত এই ভূখণ্ড নানা রকমের আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী। যা পর্যালোচনা করতে গিয়ে আধুনিক মানুষরা হিমশিম খান 'may be' আর 'may be not' এর দ্বন্দ্বে। পুরাণের শত প্রমাণ থাকলেও ইতিহাসের শিলমোহর সে পায় না, পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকেরা এই মিথকে প্রকাশ্যে অট্টহাস্যে উড়িয়ে দিয়ে নিশাকালে তারই দুর্বোধ্য জট ছাড়াতে রোমাঞ্চকর অভিযানে মাতেন। এই পুরাণই আমাদের আনুমানিক সময় চেতনার ইতিহাস, পরবর্তীকালে তার ভিত্তির উপরে চলেছে নানা নির্মাণ, বিনির্মাণ, পুনঃনির্মাণের কারসাজি। সমরেশ বসু ওরফে কালকূটের কালজয়ী উপন্যাস 'শাম্ব' সেই পুরাণকেই নির্মাণ করেছেন আধুনিকতার দাবিতে। যেখানে কল্পনার আস্তরণ ছাড়িয়ে ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে স্বর্গভূমির। প্রাচীনকালে ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার 'আধুনিক পামির পূর্ব তুর্কিস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত'[১]। তেত্রিশ কোটি ভগবান অর্থাৎ এই স্থানটি জনবসতি পূর্ণ হয়ে পড়েছিল—তাই ভারতভূমিতে দেবতাদের পদার্পণ হয়, আবার দেবতা ও অসুর ড.সুকুমার সেনের—মতে দুটি জাতি ছিল। এই রকম decoding করেই পুরাণকে আমাদের বাস্তবযোগ্য করে নিতে হবে। যেখানে ইন্দ্র থাকবেন দেবতা রূপে নন একটি কর্মপদ হিসেবে, বেদের অনুসারে অনেক ইন্দ্র আছেন, তারা দিব্যশক্তি অর্জন করে দেবতা হন। আবার দধীচি আসলে কোনও ব্যক্তি নন, কোনো বড়ো অবয়বধারী কোনো প্রাণী যার অস্থি বজ্র বা ক্যাটায়ন অ্যানায়ন চার্জ গ্রহণে সক্ষম। আবার সংস্কৃত সাংখ্যকারদের মতে, পিঙ্গলবর্ণ কপিল কোনো মুনি নয়, বরং এক দুরারোগ্য ব্যাধি, মূলত মাহেশ্বর জ্বর বা যকৃত সংক্রান্ত জ্বর, যা ষাটহাজার সগরপুত্র ও সগর বংশধরপুত্র অসমঞ্জস্যকে আক্রমণ করে প্রাণ নেয়। একমাত্র তাই শীতকালে পৌষ সংক্রান্তির দিনে সেখানে যাওয়ার নিয়ম, অন্যথা কপিল ক্ষুব্ধ হন।

এইরকম কী কেন কিভাবে এই ত্রিছকে যিনি বাংলাসাহিত্যে পুরাণের বিনির্মাণ করলেন তিনি কালকূট নামে সিদ্ধ, ভ্রমর নামও তার, নৈহাটিতে করেছিলেন শৈশব ও কৈশোর পার, বাংলা সাহিত্যভুবনেও সমৃদ্ধি যার অপার ইনি হলেন সমরেশ বসু, জন্মনাম সুরথনাথ বসু(১১ ডিসেম্বর ১৯২৪১২ মার্চ ১৯৮৮)। সাহিত্য তাঁর রচনায় পায় জীবনযুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, শ্রমজীবী মানুষের বুলিদাতা তিনি, যৌন আগ্রাসনের নির্মম চিত্র তিনি বেআব্রুভাবেই

তুলে ধরতেন কলমের ডগায়। বিচিত্র ছিল তার কর্মযোগী সত্তা, ডিম বেচা থেকে বন্দুক কারখানায় চাকরি, কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্পর্শে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি নিত্য নতুন বিস্ময়ে ভরপুর। দেবেশ রায়ের মতে, তার ক্রিয়াশীলতার বীজমন্ত্রই ছিল 'জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি লেখক এবং পেশাদার লেখক'। কারাবাসে রচনা করেছিলেন প্রথম উপন্যাস 'উত্তরবঙ্গ'। পুরাণের সঙ্গে তার গবেষণা বহুদিনের, পাতালের নিম্নের সুতালে অবস্থিত তীব্রতম বিষধর নাগ কালকূটকেই নিজের ছদ্মনাম ধারণ করলেন। হিংসা, হানাহানির দুর্বিষহ যাপননামার বিষকে ভস্মীভূত করে তিনি লিখলেন 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাব তারে', 'অমৃত বিষের পাত্র', ' মন মেরামতের আশায়' , 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' প্রভৃতি উপন্যাস। তাঁর ভ্রমণপিপাসু মন একদা আটকে থাকতে চায়নি দেওয়াল আঁটা সংসারে; বরং তাঁর মন্ত্র 'ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে'। আকাঙ্ক্ষা ছিল হাসকুটে দাদা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একাকী ভ্রমণে গিয়ে গাছতলার মালসায় চড়াবেন চালে-ডালে। সে সাধ পূরণ হয়নি, কিন্তু গোয়েন্দা গোগোলের নির্মাতা অন্বেষণ থামাননি, পৌঁছে গেছেন কৃষাব্দে। এক হাজার চারশো আটান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দের দ্বারকাপুরীতে। কিন্তু উদ্দেশ্য কৃষ্ণানুরাগে গা ভাসানো নয় বরং কৃষ্ণপুত্র শাম্বের নামে নতুন পুরাণ নির্মাণ। দেবতার ঈর্ষায় মানবের মনুষ্যত্ব মরে না পচনের মধ্যে নির্মাণ হয় এক উল্টো পুরাণ, 'শাম্ব' উপন্যাসের এই নতুন দৃষ্টিকোণ তাঁকে এনে দেয় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৮০)। কালকূটের টাইম মেশিনে ভর করে চলুন আমরাও পৌঁছে যাই সে দ্বারকাপুরীতে, ষড়রিপুর জাল ছিন্ন করে এক মানুষের মানব হয়ে ওঠার কাহিনি পর্যবেক্ষণ করি।

সমগ্র উপন্যাসটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাণকে দেখেছে, প্রথমেই ঔপন্যাসিক কীভাবে পুরাণের অতিশয়োক্তি ব্যতিরেকে মূলভাবকে ধরতে হয় পাঠককে নিজে হাতে করে শিখিয়েছেন। রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করে স্বর্গারোহন করলেন এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—পুরাণে 'সহস্র' একপ্রকার অতিশয়োক্তি, আসলে 'রামের মতো একজন রাজার এগারো বছরের রাজত্বের আশর্য ঘটনা—বহুল কীর্তিকে এগারো হাজার বলতে দোষ কী!' সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত এই হল পুরাণের মূল কায়া। রাজার পোষা ইতিহাসবিদদের পথ নয় নিরপেক্ষ ইতিবৃত্তকারের মার্গদর্শনই তার পথদ্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, 'সূতেরাই হলেন খাঁটি লোক, কোনো বিশেষ বংশের পোঁ ধরা ছিলেন না। মিথ্যাকে কাট-ছাঁট করতে জানতেন'। কালের হিসেবের সমতাবিধানের সঙ্গে তিনি স্থানেরও হদিশ বের করেছেন যৌক্তিক উপায়ে। এ যাত্রা রৈবতক পর্বতের কৃষ্ণাভনীল মহীরুহের মাঝের নিশানাভিমুখী, বর্তমানের কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের জুনাগড় রাজ্যের রৈবতক পাহাড়ের ওপরে কুশস্থলী সুদৃঢ় পুরী গুজরাটের দ্বারকা। এখানে লেখক ভৌগোলিক অবস্থান ভৌগোলিক প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গেই ব্যাখা দেন, বলরাম বৃন্দাবনে ঘর্মাক্ত অবস্থায় যমুনাকে আহ্বান করলে যমুনা তাতে নির্বিকার থাকে। ক্রোধে লাঙ্গলী বলরাম যমুনাকে বৃন্দাবনের তটে উপনীত করে, এই পুরাণকথন আসলে ছদ্ম, মূলত কৃত্রিম খাল খনন ও তার ফলে উৎপন্ন ভূমিকম্পই

পুরাণকারের মূল উপজীব্য ছিল। আবার বর্তমানের মথুরা থেকে বৃন্দাবনের দূরত্ব মোটরযানে একঘন্টারও কম কিন্তু পূর্বের বেগবান অশ্বযুক্ত রথে কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবন থেকে মথুরা এসেছিলেন আশি মাইল পেরিয়ে, বিমল প্রভাত থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত এ যাত্রাও ভূমিকম্প ও প্লেট টেকটনিকের ফলে হওয়া পাতের সংকোচনে স্থানসমীপের প্রামাণ্য নিদর্শন। এই স্থান ও কালের বর্ণন পাঠকের মনে যুক্তির প্রকাশ ঘটায়, পৌরাণিক উপন্যাসের ব্যাখ্যায় তাই এসবের হিসেব উল্লেখ করে লেখক পাঠকের মনকে দ্বারাবতীর কিনারায় পৌঁছে দিলেন। উদ্দেশ্য শাম্বকে জানা, এটা টিভি সিরিয়ালের খল চরিত্র হিসেবে নয় 'দিব্য আরোহণের' মধ্যে দিয়ে মানুষের ভগবান হয়ে ওঠার কাহিনি।

জন্মকথা, একবার শ্রীকৃষ্ণের শিবের মতো গুণসম্পন্ন একটি পুত্রলাভের ইচ্ছা হয়। তখন তিনি উপযুক্ত পদ্ধতির জন্য নারদ মুনির পরামর্শে এক হাজার ফুল নিবেদন করে বহু বছর ধরে নিভৃতে গিয়ে সারা অঙ্গে ভস্ম মেখে এবং বল্কল ধারণ করে শিবের আরাধনা করেন। উপাসনায় প্রসন্ন হরগৌরী কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে শিবের সকল গুণসম্পন্ন পুত্রের বরদান করে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। বরপ্রাপ্ত কৃষ্ণ কিছুকাল পরে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং কৃষ্ণপত্নী জাম্ববতীর গর্ভে শাম্বের জন্ম হয়। উজ্জ্বল বর্ণ যা যমুনার জলের মতো স্বচ্ছ, মিষ্টভাষী, বীরযোদ্ধা, সকলের প্রিয় সে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব। তিনি যেন সাক্ষাৎ প্রণয়দূত কামদেব, আবার পাশাপাশি ত্যাগী-যোগী সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন বীর মুসাফির। কিন্তু তখনও তার জীবনে লক্ষ্য ছিল না, উপলক্ষ্যের প্রমোদকানন তাকে গুল্মলতা দ্বারা আবদ্ধ করে রাখায় প্রকৃত উদ্দেশ্যের সম্মুখীন তাকে হতে হয়নি।

'The Myth of Sisyphus'[৩] সিসিফাস ছিলেন দেবতাদের দ্বারা এক নিন্দিত চরিত্র। সে চিরকাল পাহাড়ের গড়ানো পাথর উপরে তুলতো ও পরক্ষণেই তা গড়িয়ে নীচে চলে যেত। গূহ্যার্থ হল জীবনের কোনো অর্থ হয় না, বরং মানুষকে অপরিহার্য দুর্গতির বিরুদ্ধে অবিরাম পরিশ্রম করে জীবনকে কোনো উজ্জ্বল অর্থ প্রদান করতে হয়। আসলে মানুষ নিজেই তার কারিগর, শাম্ব যৌবনকালে দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করে বন্দি হয়, জ্যেঠা বলরাম তাকে মুক্ত করে আনে। এভাবেই দ্বারকার প্রমোদ উদ্যানে সখী সাহচার্যে, কামোচ্ছ্বাসে, সঙ্গলাভের মত্ততায় উদ্যত যুবরাজের জীবন কাটছিল নিশ্চিন্তে। প্রণয়ের তৃষ্ণায় সে নারদ মুনির আগমনে ভ্রুক্ষেপ করেন না, তাৎক্ষণিক সুখে মত্ততা তার জীবনে ডেকে আনে ঘোর বিপত্তি। নারদ মুনি বিচক্ষণ তিনি নিজের উপেক্ষার প্রতিশোধ নিতে তৎপর অথবা ভবিষ্যতের কোনো অসীম মুক্তির পথের পরিকল্পনা করেন।

ফ্রয়েডের Oedipus Complex[৪] অনুসারে মাতার প্রতি পুত্র ও পিতার প্রতি কন্যার আকর্ষণের একটি যৌন মনস্তত্ত্ব কাজ দেখান। গ্রিক অডিপাস তার পিতাকে হত্যা করে মাতাকে বিবাহ করে। নারী ও ভূমি ছিল প্রাচীনকাল থেকেই বীরভোগ্যা। এই রকম শোষণ পথ—তাদের নসিবের যেন একটি চেনা। অডিপাসের সত্য জানার পর তার মাতা আত্মহত্যা

করে, এ যেন মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতো যাপননামা। এই স্রোতের বিপরীতে ফ্রয়েড ব্যাখ্যা করেছেন ইলেকট্রা কমপ্লেক্স। এটি হল নারীদের পিতার প্রতি আকর্ষণের তত্ত্ব। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতভূমিতে উক্ত সম্পর্কগুলোকে অযাচার সম্পর্কের মাত্রা দেওয়া হয়। নিজ নারীর প্রতি ব্যক্তিগত মালিকানা পৌরুষের দম্ভ এইসব সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ও ইগোর দ্বন্দ্ব গ্রিসের জন্মের বহু আগেই মানুষের মনে ছিল, বিচক্ষণ নারদ মুনি সেই ক্ষতকেই বাড়িয়ে তোলেন। বসুদেব কৃষ্ণ তখন প্রৌঢ়, নারদকে জানান 'জ্ঞাতিদের অর্ধেক ঐশ্বর্য দান করে, তাঁদের কটুবাক্য শুনে তাঁদেরই দাসের ন্যায় রয়েছি।' এমনই একদিনে অতিথিরূপী নারদ কৃষ্ণকে শাম্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, একদা নরকের লালসালয়ের ষোল হাজার রমণীকে মুক্ত করেছিলেন কৃষ্ণ—সেই গোপীনিগণ কৃষ্ণের দাসী, কিন্তু শাম্ব তাদের প্রতি আসক্ত। বসুদেব কৃষ্ণ তার প্রত্যুত্তরে বলেন 'বংশের পুত্রগণ ব্যতীত, যাদবশ্রেষ্ঠগণের অনেকেই এই রমণীদের প্রার্থনা করে থাকেন, যথোচিত সমাদরের দ্বারা সঙ্গলাভও করে'। পুত্রগর্ব ও সকল গোপিনী মনন নিজের নখদর্পণে এই দম্ভ কৃষ্ণের মনকে বিচলিত করতে পারে না। কিন্তু নারদ মুনিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে গোপিনী আবৃত প্রমোদকাননে ভ্রান্ত খবর দিয়ে শাম্বকে প্রেরণ করেন। সুরারসে ভেসে কৃষ্ণ পত্নীগণ ব্যতিরেকে বাকি রমণীরা কৃষ্ণের উপস্থিতিতে শাম্বের প্রতি কামাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এ ঘটনা কৃষ্ণের পক্ষে অপমানজনক—তাই সে পুত্র শাম্বের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিসম্পাত করেন 'তোমার এ রমণীমোহনরূপ নিপাত যাক, কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক'। অমোঘ এ অন্তরের বিকার নির্দোষপুত্রকে নারদের ছলনা থেকে সর্বজ্ঞ দেবতাও বাঁচাতে পারলেন না। শুরু হল শাম্বের জীবনের ভিন্নমুখী প্রবাহ। পূর্বেও শাম্ব মুনিগণের সঙ্গে রসিকতা করার জন্য শাপ পান। গর্ভবতী রমণীদের মতো বেশ ধারণ করে তাঁর গর্ভ থেকে কি হবে—পুত্র না কন্যা জিজ্ঞেস করলে মুনিরা ক্ষিপ্ত হয়ে শাম্বকে অভিশাপ দেয় যে তার গর্ভ থেকে মুষল নির্গত হবে, পরবর্তীকালে এই মুষলকেই যদু বংশের পতনের কারণ ধরা হয়।

পুনর্জন্ম, শাম্বের প্রাসাদের সুখের দিন ফুরালো পত্নী লক্ষ্মণাকে ছেড়ে দ্বারাবতীর ভোগবিলাসী হাওয়াকে ত্যাগ করে সে একাকী কুটিরে নিজের পচনকে মেনে নিল, পরিচয় গ্রহণ করলেন অভিশপ্তের। শাপমোচনের জন্য কৃষ্ণ ও নারদের সাক্ষাৎ পেতে দ্বারকায় গেলে প্রহরীরা তাকে করুণা করে, রমণীরা তাকে উপেক্ষা করে। কিন্তু কৃষ্ণ দর্শনমাত্রেই শাম্বকে কাছে টেনে নেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাম্ব তবুও বলে পিতার দুঃখজাগানিয়া হতে সে আসেনি, এসেছে জগতকে মুক্তির পথ দেখাতে। নারদ মুনি তাকে এক দুর্গম জীবনের উদ্দেশ্য পাঠান। গলিত শরীরে তার কুণ্ডল, অঙ্গুরীয় বেমানান, পাদুকা তার লোলচর্ম পদে অপ্রয়োজনীয়, রোগগ্রস্ত বিকট মূর্তি নিয়ে রথারোহণ, অশ্বারোহণ জনগণের কাছে তাকে হাস্যকর করে তুলতো। ব্যধিগ্রস্ত হতদরিদ্র অন্যের কৃপায় বেঁচে থাকা রূপকুমার পাড়ি দিলেন সূর্য পূজায়। মহর্ষি বলেছেন, 'ইনি সকল শক্তির উৎস। তোমার একমাত্র পূজ্য

দেবতা এই সূর্য'। গৃহপালিত পোষ্য ও গৃহকর্তারা শাম্বের বিকট মূর্তি দেখে ভীত হয়, সকল যাত্রীগণের শেষে মাঝি তাঁকে নৌকা পারাপার করে দেন। সংশয়, হতাশা, নিরাশাকে বুকে করে শাম্ব পৌঁছান মিত্রবন নামে এক সূর্যক্ষেত্র পঞ্চনদীর দেশে। যমালয়ে জ্যান্তমানুষের মতো সে যেন এক সাক্ষাৎ নরক, চারিদিকে কুষ্ঠরোগীদের ভিড়। কচি প্রাণও সেখানে কুঁড়ির মতো বিকশিত হয়, কিন্তু চিরস্থায়ী হয় না, ক্ষণকাল পরেই কুষ্ঠরোগে মারা যায়। সেখানে নীলিক্ষি নামক এক যুবতী মহিলা তাকে প্রাণধারণের খাবার দেন পরিবর্তে চায় শরীরী তৃষ্ণা পূর্ণ করতে। কিন্তু শাম্ব দৃঢ়চেতা সে শাপমুক্তির সংকল্পকে জীবনের ব্রত করেছে—নীলাক্ষির কাছে সে মার্জনা চান, প্রত্যুত্তরে পায় তিরষ্কার 'তুমি অক্ষমই থাকো। তোমাকে ধিক!' শেয়ালের উৎপাতকে অতিক্রম করে প্রাতঃকালে সান্নিধ্য পান তিনি—ঋষি পুরুষের। জীবনের প্রতি ফিরে পান বিশ্বাস, সংযমের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মচার্যের পালনের মাধ্যমে ফলাহারে এই রোগ নিরাময়ের পথ খুঁজে পান। মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে লবণদধি তীরে উদয়াচলে সৌরদেব প্রথম আবির্ভূত হন, নাম তার কোণাদিত্য; যমুনার দক্ষিণ ভাগে দ্বারকার নিকটবর্তী স্থানে মধ্যাহ্নে বিরাজ করেন কালপ্রিয়, আর আদ্যস্থানে তিনি পশ্চিম দক্ষিণে অস্তাচলে যান। মহাব্যধির জন্য এই তিন স্থানে, তিন কালের প্রভা অঙ্গে ধারণ করলেই মুক্তি। কিন্তু ঔষধের হদিশ পেলেও তৎকালীন সময়ের যানবাহনের অভাব, অধিক দূরত্বে ও আত্মবিশ্বাস হারানোর জন্য যাত্রীরা ভীত ও বীতশ্রদ্ধ হত ও চর্মরোগকে সঙ্গী করে মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়াতেই বিশ্বাস করতেন।

জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন 'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব থেকে যায়' বৃহৎ মানুষেরা শুধু নিজের স্বপ্নই পূরণ করেন না, হয়েও ওঠেন রাশি রাশি মানুষের স্বপ্নপূরণের চাবিকাঠি। শাম্বও অপমান, লাঞ্ছনাকে সহ্য করে সকল কুষ্ঠরোগীকে এই মহৎযাত্রায় সামিল করেন। বীর নেতার মতো কুষ্ঠরোগীদের ব্রহ্মচার্য, উপবাস ও সূর্য তীর্থ ভ্রমণের অনুরোধ করেন। এর পূর্বেও ঋষি পুরুষ কুষ্ঠরোগীদের পরিত্রাণের এই হদিশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সে নির্দেশ অপেক্ষা এ অনুরোগ অধিক মনস্পর্শী ছিল, কারণ আগেরটি ছিল উপদেশ আর এটি হল এক ভুক্তভোগীর আর্তি। তাদের কঠিন যাত্রাপথ শুধু তাদের একার নয় বরং শাম্বও তাতে সামিল হবে, যে ক্ষুধার তাড়না অন্তরভেদ করে কুষ্ঠের গলিত চর্মকে দহন করবে তাতে শাম্বও সামিল হবে, ঋতু বৈচিত্র্যের রুক্ষ্মতায় সেও কাতর হবে। তাই সকলে কুণ্ঠা ছেড়ে বরণ করে নেয় পথপ্রদর্শক শাম্বের বাণী। সত্তরজন কুষ্ঠরোগীকে নিয়ে শুরু হয় নিরাময়ের যাত্রা। ষড়ঋতুর পরিক্রমা ফুরাতে ফুরাতে একটা একটা করে রোগী হেরে যায় সফরে, মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে পড়েন, নীলাক্ষির কোলের শিশুটিও বাঁচে না। কিন্তু আলোর পথযাত্রীদের তো কালরত্রি থামাতে পারেনা, মনের জোরে টিকে থাকে শাম্বসহ চোদ্দজন অনুগামী। তারা সেরে উঠলে দ্বারকাপুরীতে গিয়ে শাম্ব নিজ সম্পত্তির সকল অর্থ প্রদান করেন, দ্বাদশ বৎসর শেষে তিনদিকের তিনটি সূর্যমন্দির নির্মাণে। দশঋতু অতিক্রান্ত করে চর্মরোগের পথ্য

সংগ্রহের জন্য শাম্ব শাকদ্বীপে পৌঁছান—মগ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণের পাদ্যার্ঘ গ্রহণ করে তাকে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন ভারতবর্ষে আগমনের। পূর্বেও তারা ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন, কিন্তু তৎকালীন রাজাদের অপৃষ্ঠপোষকতায়, অব্যবস্থায় তারা স্থান ত্যাগ করেন। শাম্ব নিজের ক্ষত্রজাত সম্পত্তি দিয়ে আঠারোজনের প্রতিষ্ঠা ও যত্নের ব্যবস্থা করলেন, কর্ষণযোগ্য ভূমি ও গাভী প্রদান করে মহাব্যধির সমূলে নিরাময়ের ব্যবস্থা করেন।

'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল/ চঞ্চল চীএ পইঠো কাল চর্যাপদের লুই পা বর্ণনা করেছিলেন মানব জীবনের এক প্রকৃত মনস্তত্ত্বকে। যেখানে কায়ার পঞ্চইন্দ্রিয়ের তাড়নায় মন চঞ্চল হয়, আর চঞ্চল মন বিনাশের কারণ, বর্তমানের ডিজিটাল ডিসট্রাকশনের যুগেও এই পদ ধ্রুব সত্য। শাম্ব প্রমোদকাননে সম্ভোগ তাড়নায় যে অসম্মান মুনিকে করেছিলেন নিজের ভ্রান্তিতে, তারই প্রায়শ্চিত্তে সে হয়ে উঠলেন প্রকৃত মানুষ। যোগাসনে নিম্নে থাকে লাল জ্যোতি যা কামনা তাড়নাকে ধারণ করে, কিন্তু যোগাসনের অন্তিম বিন্দু বেগুনি, তা সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ কামনার সঙ্গে মানুষের মনপ্রাণকে বাঁধে, তাই শাম্বের মনুষ্যজীবন থেকে মানব হয়ে ওঠার অন্তিম পর্বে সে হয়ে ওঠে শাম্বাদিত্য—"হে সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্ব শ্রুতিমান্য, হে শাম্বাদিত্য! আপনি সন্তুষ্ট হোন, আমার পূজা গ্রহণ করুন। শাম্ব তাঁর অভিশাপের দিনেও অশ্রুমোচন করেন নি।' কিন্তু গ্রহরাজের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন অশ্রুরোধ হল না, সে মানুষ কি আর ষড়রিপুর ষড়যন্ত্রে পোষ মানবেন? উত্তর না। ত্যাগ তিতিক্ষা তাকে করে তুলেছে উত্তম পুরুষ। আজও শাম্ব দশমীর দিন হিন্দুরা সূর্য পূজা করেন গৃহস্থের কল্যাণের আশায়, যাকে প্রদেশান্তরে ছট পূজাও বলে। ওড়িষ্যার কোনারকের সূর্য বিগ্রহ শাম্বের আমলের কোণাদিত্য যা পুরাণের প্রমাণরূপে আজও সাক্ষ্য বহন করছে।

"পরিত্রাণায় সাধুনং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম/ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।" বিশ্ব একটা মুক্তোর মালার মতো বস্তু, সমস্ত ক্রিয়ার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ও প্রভাব বর্তমান। সৌরকুটম্ব থেকে সমুদ্রগর্ভ পর্যন্ত একই সূত্রে গ্রন্থিত। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের মোহর লাগিয়ে তার মনুষ্য সত্তাকে অবজ্ঞা করলেও উনি জৈবিক নিয়মেই বড়ো হয়েছেন এই ভারত ভূখণ্ডে। অপার বুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চমার্গের আদর্শের পথে চলা একনায়ক ছিলেন তিনি। ওনার কথিত বাণী যে ধর্ম নির্মাণ করে তা শুধু ধর্ম নয়, তা আদর্শ মানব জীবনের চিত্র। গীতার বাণীতে কোটি কোটি মানুষকে সততার পথ দেখান, তাঁর চেয়ে বড়ো গুরু আর নেই। জরাসন্ধসহ অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির থেকে সুরক্ষার জন্য সমুদ্রের মধ্যভাগে দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁর চেয়ে বড়ো স্থপতিবিদ আর কে আছেন? সদাহাস্যময় চোখের বুলি দিয়ে মানুষের মনের ভাব বুঝে নেওয়া কৃষ্ণের চেয়ে বড়ো মনোবিশেষজ্ঞ আর কে? বাঁশি বাজিয়ে ধেনুকূলে ধ্যান আকর্ষণ করতে পারা তিনি শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। হোমযজ্ঞের মাধ্যমে খরার মধ্যে বর্ষা নামালো, তিনি ছিলেন একজন আবহাওয়াবিদ্যার জ্ঞাতা। ধর্মের

জন্য যুদ্ধ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলো তার চেয়ে বড়ো বীর আর হয় নাকি? অনিয়ন্ত্রিত সুদর্শনচক্রের মধ্যভাগের সুস্থির অংশে আঙুল দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কাইনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংএর জ্ঞান তার ছিল। এ হেন ব্যক্তি শুধু মিথিক্যাল চরিত্র নয় বরং আমাদের পূর্বপুরুষও বটে। কিন্তু এই অনিবার্য কৃষ্ণ সত্তাকে নয় বরং কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে বেছে নিলেন ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু, যাতে নিখাদ মনুষ্য সত্তার উপর দেবত্ব না আরোপ হয়। যাতে পাঠককুল নিজেকে গ্রিক ট্রাজেডির মতো নিয়তির পুতুল বা শেক্সপিয়ারিয়ান ট্রাজেডির মতো কোনো চারিত্রিক ত্রুটির মধ্যে দিয়ে অধঃপতনের শিকার না হন বরং পরিশ্রম দিয়ে সংযম দিয়ে জয় করে নিতে পারে নিজ ভবিষ্যত। অনুগ্রহ যেমন গ্রহদোষ কাটায়, কঠোর জীবনাচারণ দৈব অভিসম্পাতকেও মিথ্যা করে দেয়। 'Struggle for the existence' থেকে 'Survival of the fittest'এ পরিণত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য। উপলক্ষ্যের জোয়ারে মানুষ ভ্রান্ত পথে চালিত হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে বলেছিলেন 'গোড়ায় কঠিন চাষ দরকার'। কল্যাণকামী কর্মে মানুষের মনের মধ্যেকার 'মাধব' এমনিই জাগে, তাই অমৃতের পুত্র মানুষরাই সব এক একটি পরমাণুর মতো বিপুল ক্ষমতাধর, তারাই পারে জৈবাস্ত্র নির্মাণ করতে আবার অ্যান্টিডোজও নির্মাণ করতে। মানুষের শুভবুদ্ধিই তাকে মহামানবের মর্যাদা দেয়, সেই মুক্তিপথের এক দূত হলেন শাম্বাদিত্য, ধর্মের বেড়াজাল নয়, অধর্মের কলুষিত পথ নয়, নীতির পথেই বিকাশ আসবে তাই অন্তিমে সকল মহামানবের জন্য কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে এটিই বলার—আত্মদীপ্তিকে যেন মানুষ হারিয়ে না ফেলে, সংঘর্ষের মধ্যেকার উত্তরণের পথ যেন সকলের পদচুম্বন করে, মননের নিস্পৃহতাকে উপেক্ষা করে যেন নির্গত হয় "ও আলোর পথযাত্রী, এ যে রাত্রি/ এখানে থেমো না/ এ বালুচরে আশার তরণী তোমার/ যেন বেঁধো না"।

**তথ্যসূত্র :**


১. সমরেশ বসু, শাম্ব, ১ম(কলকাতা ০৯; আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮), ১৩

২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম(কলকাতা ০৯, আনন্দ পাবলিশার্স,১৯৪০), ৯

৩. Albert Camus– Myth of Sisyphus– 1st France– New York- Alfred A. Knop.– 1942)

৪. Sigmund Freud– The Interpretation of Dreams– 1st ( Selection of Classic Articles on Sigmund Freud's Psychoanalytical Theory– 1899)

৫. ড. নির্মল দাশ, চর্যাগীতি পরিক্রমা, ১ম (কলকাতা ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭),১১৭

# জনজীবনের বহুমাত্রিকতা : প্রসঙ্গ সমরেশ বসুর গল্পগ্রন্থ 'মরশুমের একদিন'

সুকান্ত মণ্ডল

**সারসংক্ষেপ :** কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু তাঁর প্রথম কয়েকটি ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে পাঠকের মনে বিশেষ জায়গা করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম দিককার ছোটগল্পগুলি মূলত 'স্বাধীনতা', 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্য থেকে নির্বাচিত বারোটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় সমরেশ বসুর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মরশুমের একদিন' (ডিসেম্বর ১৯৫২)। উক্ত গল্পগ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন লেখক ঋষি দাশ। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে আমাদের জনজীবনের বিচিত্র দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। নিম্নবিত্ত মানুষ, শ্রমিক জীবন, উদ্বাস্তু জীবন, দাঙ্গাক্লিষ্ট জীবন গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

**সূচক শব্দ :** সমরেশ বসু, মরশুমের একদিন, জনজীবন, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক জীবন, উদ্বাস্তু মানুষ, দাঙ্গা।

**মূল আলোচনা :** সমরেশ বসু সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেন ছোটগল্প লেখার মধ্য দিয়ে। বিয়াল্লিশ বছরের (১৯৪৬-১৯৮৮) সাহিত্য জীবনে তিনি দুই শতাধিক ছোটগল্প লিখেছেন। তবে সমরেশ বসুর সামগ্রিক ছোটগল্প অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পর্বের গল্পগুলির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। ১৯৪৬-এ শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় 'আদাব' গল্প প্রকাশের পর 'ঈষানী' ছোটগল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রথম গল্পের সুনাম অক্ষুণ্ণতার প্রশ্নে' অমনোনয়ন করেছিলেন।[১] এরপর অবশ্য লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁকে তেমন 'বেগ পেতে' হয়নি। লক্ষণীয়, ওই একই বছরে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'নতুন খোকা'(১৯৪৬) গল্পটি। এরপর ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্প যেমন 'প্রতিরোধ'(১৯৪৭), 'মৃত্যুঞ্জয়'(১৯৪৭), 'জলসা'(১৯৪৮), 'একশো চারজন'(১৯৫২), 'একটি মুখ'(১৯৫২) প্রকাশিত হয়েছিল। 'পরিচয়' পত্রিকা ছাড়াও তাঁর ছোটগল্প লেখালেখির প্রথম পর্বে 'দেশ', 'নতুন সাহিত্য'সহ একাধিক পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে ঋষি দাশের তৎপরতায় 'ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি' থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মরশুমের একদিন'।[২] এই গ্রন্থটিতে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২-র মধ্যে প্রকাশিত নির্বাচিত মোট বারোটি গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমরেশ বসুর 'জীবনের দ্বিতীয় পর্ব' অর্থাৎ আতপুর, ইছাপুরে থাকাকালীন তাঁর 'স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতা'র ছায়া আলোচ্য গল্পগুলিতে দীপ্যমান। এছাড়াও আমরা জানি, এই সময়পর্বে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান(১৯৪৪) করেছিলেন এবং যার ফলে তাঁর চিন্তা-চেতনার মধ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য 'কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে

আসার পরেই আমার চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি হয়। আমার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে।'[৩]

'মরশুমের একদিন' গল্পগ্রন্থের বারোটি ছোটগল্প বিষয়-বৈচিত্রের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ, যার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয় জনজীবনের বহুধা বৈচিত্র সম্পর্কে লেখকের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার দিকটি। যেমন, এই বইয়ের প্রথম গল্প 'পকেটমার'-এ এক নিম্নবিত্ত পরিবারের কথা উঠে এসেছে। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ অর্থাভাবের কারণে তার মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। এই গল্পের মুখ্য চরিত্র গৌরমোহন, যিনি নিত্য পূজা-আহ্নিক নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিন ছেলে, দুই পুত্রবধূ এবং অনড়-বাকশক্তিহীনা পঙ্গু স্ত্রী সুনয়নীকে নিয়ে তার অভাবী সংসার। গৌরমোহন ইতিপূর্বে চটকলে কেরানির কাজ করলেও বর্তমানে তিনি দোকানে সামান্য খাতা লেখার কাজ করেন। উল্লেখ্য, গৌরমোহনের চটকলে কাজ করার সময় তার অন্যান্য সহকর্মীরা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করলেও তিনি সততার প্রশ্নে কখনও আপোষ করেননি। প্রবাসী মেজ ছেলের পাঠানো সামান্য টাকায় এই নিম্নবিত্ত পরিবারে বিবিধ সংকট লক্ষ করা যায়। এবং আমরা লক্ষ করি, এই সংকট যখন চরমমাত্রায় পৌঁছায় তখন গৌরমোহন তার মেজ বউ মালতীর শখের সোনার গয়নাকে ব্যবহার করেছে এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সে নিজের জামার পকেট কেটেছে। বস্তুত গয়না হারানোর প্রসঙ্গে ব্যঞ্জনার্থে যে 'পকেটমার'-এর কথা বলা হয়েছে তা আসলে গৌরমোহন নিজেই, গল্পের শেষে বিষয়টি পাঠকের কাছে আর অস্পষ্ট থাকে না। গৌরমোহনের এতদিনের সততা চূর্ণ হয়ে যায় একটিমাত্র ঘটনায়। অসৎ উপায়ের ব্যাপারের অন্য কেউ না জানলেও গৌরমোহনের নিজের মধ্যে অস্থিরতা ফুটে উঠেছে। এবং এই অস্থিরতা যে তার এতদিনের সততা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা জানি, সমরেশ বসু যখন লেখালেখি শুরু করেছিলেন সেই সময়টা ছিল ভীষণভাবে অস্থির। কেননা ইতিপূর্বে ঘটে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত ভয়ংকর ঘটনা এবং যার প্রভাবে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন লক্ষণীয়। তাছাড়া জাপানি আক্রমণ (১৯৪১), আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা জনজীবনে এক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।[৪] তিনি সমসাময়িক এসমস্ত ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছোটগল্প লিখেছিলেন। আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'শেষ মেলায়' গল্পটিকে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের অসম্পূর্ণ প্রণয়ের কাহিনি বলে মনে হলেও আসলে এর মধ্য দিয়ে গল্পকার তৎকালীন বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৩৫০) ছবিটি তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি নিম্নবিত্ত মানুষদের সংগ্রামের সঙ্গে বেঁচে থাকার যে লড়াই সেটিও গল্পে উপস্থাপিত। এই গল্পে দরিদ্র চিত্রকর মোহন এবং গণেশ কামারের বিবাহিত ও স্বামীপরিত্যক্তা কন্যা সুভদ্রা দুজনেই অর্থ উপার্জনের জন্য সারা বছর ধরে জেলার বিভিন্ন মেলা পরিক্রমণ করে। গল্পটির সময় পরিসর এক বছরের

(চৈত্র থেকে চৈত্র) মধ্যে একাধিক মেলায় তাদের বেশ কয়েকবার দেখাও হয়। এই মেলাতেই তারা পরিকল্পনা করে নতুন সংসারের 'একখান ছোটমোটো ভিটে আর মা দুর্গের কোলে গণেশ ঠাকুরের পারা একটা ছ্যালা।'[৫] তবে সমকালীন সমাজের অবস্থার কথা চিন্তা করে মোহনের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয় 'মানুষ জনার যা অবস্থা হবার লাগছে, মেলাগুলান সব পড়ে যাবে। চাষ আবাদ নাই, পরে শহরকে যেতে হবে কুলির কাম করতে।'[৬] এবং গল্পে দেখা যায় এই আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত সত্যি হয়। কোপগড়ের চৈত্র-সংক্রান্তির মেলায় তাদের প্রণয়ের পরিণতির কথা থাকলেও তার আগেই মন্বন্তরের ভয়ানক পরিণতির শিকার হয় মোহন। তবে শুধুমাত্র মোহন নয়, এক্ষেত্রে মন্বন্তর সমকালীন বাংলার গ্রামের সকল মানুষের দুরবস্থার ছবিটি পরিস্ফুট হয়েছে। অর্থাৎ মোহনের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ গ্রাম জনমানবহীন হয়ে পড়ে।

আমরা জানি, পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে সেইসময় বাংলার কীরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলে। বহু গ্রামের মানুষ শহরের অভিমুখী হয়েছিল শুধুমাত্র খাবারের অন্বেষণে। আলোচ্য গল্পে মোহনের মধ্যেও সেই আশঙ্কা লক্ষ করা যায়। তাছাড়া এই গল্পে 'কঙ্কালরূপী মানুষ'দের যে মিছিলের কথা বলা হয়েছে তারা সকলই এই মন্বন্তরের ফল। শুধু তাই নয়, গ্রামে মানুষদের সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে শকুনের দল। গ্রাম হয়েছে শ্মশান। যেখানে রক্ত মাংসের মানুষ সুভদ্রাকে দেখে চমকে যায় শকুনের দল। এই সময়কালে গ্রামের পর গ্রামের যা পরিস্থিতি সেখানে এমন মানুষের কল্পনা করা যে প্রায় অসম্ভব ছিল তা গল্পকার ব্যঞ্জনার সঙ্গে তুলে ধরে ধরেছেন।

'জলসা' গল্পটি প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় কার্তিক ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে। গল্পকার এই গল্পে চটকলের শ্রমিকদের কথা তুলে ধরেছেন। ট্রেড ইউনিয়নের কাজের সূত্রে বহু বছর ধরে চটকলের শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে আমরা জানতে পারি। ফলে তিনি তাদের সংগ্রামকে খুব কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এক্ষেত্রে বেশ কিছু ছোটগল্পে তাঁর ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ্য করি। আলোচ্য 'জলসা' গল্পে তিনি শ্রমিকদের অনিশ্চিত জীবন ও লড়াইয়ের দিকটি তুলে ধরেছেন। রেললাইন সংলগ্ন বস্তিবাসী বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিকদের মধ্যে বিলাসবহুল, বর্ণিল 'জলসা'কে কেন্দ্র করে নানা ধরণের কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়। পরিশ্রমী জীবনে তারাও এরকম এক জলসার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বাস্তবিক এই জলসা বা বিনোদন যে তাদের জীবনের অংশ নয় তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যায় গল্পে। বরং উক্ত জলসার মঞ্চে গান্ধীজির অহিংসতার কথা বলা হলেও বাস্তবে এর বিপরীত ছবি ধরা পড়ে। লক্ষণীয়, মালিক শ্রেণি তাদের অতিরিক্ত লাভের আকাঙ্ক্ষায় শ্রমিকদের ছাঁটাই শুরু করে। আবার একইভাবে মঞ্চে 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যেই কালো গাড়িতে শ্রমিকদের বন্দী করে নিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। শুধু এই নয়, পুলিশ দ্বারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এদেরকে প্রহার করা হয়। গল্পে এই দুই বিপরীতধর্মী ঘটনা বিশেষ

ব্যঞ্জনার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। তবে শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও তা বিশেষ কোনো লাভ হয় না। আসলে নিম্নবিত্ত-শ্রমিকশ্রেণি যে চিরকালই মালিকশ্রেণি দ্বারা শোষিত, এমনকী স্বাধীনতার পরেও তার যে কোন পরিবর্তন হয়নি গল্পে মূলত সেইদিকটি প্রতিভাত।

'গন্তব্য' গল্পে একদল উদ্বাস্তু মানুষের নিজ দেশ ছেড়ে আসার যাত্রাপথের বর্ণনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে নতুন দেশে এসে তাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম ও মানসিক লড়াই— সেই দিকটিও ফুটে উঠেছে। আমরা দেখি, একদল উদ্বাস্তু মানুষ নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে জন্মভূমি ছেড়ে পালিয়ে আসছে গোপনে। যাদের 'গন্তব্য' মূলত পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের উদ্দেশে, বিশেষত এই বাংলায়। উল্লেখ্য, উদ্বাস্তুদের দলে বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শিশু সকলেই রয়েছে। এবং এই দলের 'নেতা' হল প্রসন্ন। তার নেতৃত্বে সকলে একসঙ্গে দেশ ছাড়া হয়েছে। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রাপথে বিভিন্ন চরিত্র যেমন বুড়ো কামার গোবিন্দ, নিকুঞ্জের মা, পরেশ, অনন্ত, প্রসন্ন সকলেরই মনে পড়েছে তাদের জন্মভূমির নানাকথা। গল্পের প্রত্যেক চরিত্র-পাত্রদের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে নিজ দেশ ত্যাগের হৃদয়যন্ত্রণা 'কেঁদেছিল সকলেই। ঘরে ঘরে বুকভরা একটা আর্তনাদে রাত্রি ভোরের অন্ধকার যেন আরও খানিকটা জমাট হয়ে উঠেছিল।'[৭]। এছাড়াও তাদের মধ্যে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা লক্ষ করা যায়। নতুন দেশ তাদের কীভাবে গ্রহণ করবে, কোথায় তারা আশ্রয় নেবে—এসমস্ত ভাবনায় তারা প্রত্যেকেই উদ্বেলিত। গল্পে আমরা দেখি, উদ্বাস্তু এই মানুষেরা এক সুখকর দিনযাপনের কল্পনা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে এলেও বাস্তবে তা সম্ভবপর হয়নি। বরং ভারতে এসে নতুনভাবে জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছে তারা। গল্পে সতেরো দিন পরের শিয়ালদা ষ্টেশনের যে ছবি গল্পে ফুটে উঠেছে তা ভয়াবহ : 'শিয়ালদা ষ্টেশনের যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটুকুতে পা ফেলবার স্থান নেই কোথাও। আরও লোক এসেছে, সংসার পেতেছে আরও অনেকগুলো পরিবার। শিশুদের মলমূত্র পরিত্যাগ থেকে শুরু করে সবই চলছে। মানুষ মানুষ মালে দুর্গন্ধে, মলমূত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানান জঞ্জাল নরক গুলজার।'[৮] সামান্য খাবারের জন্য কেউ ভিক্ষা করেছে, কেউ আবার সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সেইসঙ্গে এদেশের মানুষ তাদের 'জঞ্জাল', 'বাঙাল' বলে কটাক্ষ করেছে। তারা আশ্রয়ের জন্য কলকাতার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং শেষপর্যন্ত সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা স্থিত হয় কলকাতারই পরিত্যক্ত এক বাড়িতে। গল্পশেষে বাঁকার বউয়ের সন্তান জন্মানোর মধ্য দিয়ে লেখক এই নবজাতকের 'দেশ' কোনটা সেই প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন গল্পে। আসলে এ ছোটগল্পে লেখক সমরেশ বসু উদ্বাস্তু মানুষের যে জীবন সংগ্রাম সেই দিকটিকেই তুলে ধরেছেন।

মানুষের অভাব জীবনের কথা তাঁর পর্বের একাধিক ছোটগল্পে উঠে এসেছে। 'বিষের ঝাড়' গল্পটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। গল্পে হারাধন চক্রবর্তীর জীবনের অভাবী জীবনের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। তার ন'জন সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। তার বংশগত পেশা

যজমানী ছেড়ে সে পতিতাপল্লীতে ডাক্তারি করে। উল্লেখ্য, এই কাজের থেকে তার যে উপার্জন তাতে তার সংসারে অভাব দূর হয় না। সামান্য অর্থের জন্য তার পরিবারের সন্তানদের অভুক্ত থাকতে হয় মাঝেমধ্যেই। হারাধনের একমাত্র ছেলে ক্ষিদের জ্বালায় বিষফল খেয়ে মারা গেছে। তবে সন্তান হারানোর পরেও হারাধনের মধ্যে তার অন্যান্য সন্তানদের জন্য তার লড়াকু মানসিকতা আমরা লক্ষ করি। গল্পে দারিদ্র মানুষের প্রতীক হিসেবে হারাধন চক্রবর্তী চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন স্রষ্টা। এছাড়াও আলোচ্য গল্পে পতিতাপল্লীর মানুষের জীবনের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

'গুণিন' চরিত্র-নির্ভর একটি ছোটগল্প। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পকারের প্রথম গল্প এটি। গল্পটি ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫১(৫ আশ্বিন ১৩৫৮) সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পে ব্যক্তির অন্তর্মুখী প্রতিক্রিয়া প্রাধান্য পেয়েছে।[৯] এই গল্পের মূল বিষয় প্রেম বা প্রণয়। গল্পের মুখ্য চরিত্র নকুড় অনেক বছর পর ফিরে এসেছে তার স্বভূমিতে। ফিরে এসে মনে পড়েছে তার বাল্য প্রেমিকাকে। তবে আমরা দেখি, নকুড় অন্ধবিশ্বাসের মতো অসহতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অর্থাৎ বাল্য প্রেমিকাকে পাওয়ার আশায় তার ভিতরের কুসংস্কারই শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর একমাত্র কারণ হয়েছে।

মানুষের অভাবের ভিন্ন আরেক চিত্র ধরা পড়ে 'কাজ নেই' ছোটগল্পে। সমাজের এক শ্রেণির বিত্তবান মানুষদের দ্বারা কীভাবে সাধারণ বেকার-মানুষ শোষিত হয় এই গল্পে সেই ছবি ফুটে উঠেছে। গল্পের চরিত্র ফটিকচাঁদ একজন কর্মহীন মানুষ। একমাত্র মেয়ে বুলাকে নিয়ে তার অভাবের সংসার। তার নির্দিষ্ট কোন কাজ নেই। কলকারখানা, ঘরামি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে কাজের খোঁজ করে। একশো টাকা ঘুষের কারণে সে কারখানার কাজ প্রত্যাখ্যান করে। কর্মসংস্থান না হওয়ার কারণেই তার মধ্যে একরকম হতাশা লক্ষ করা যায়- 'কাজ নেই এ-সংসারে, তবে কেমন করে বাঁচি বল?'[১০] এই অভাবের কারণেই ফটিকচাঁদ শেষপর্যন্ত গরু চুরির মত অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেয়। ফটিকের এই অভাবের সুযোগ নিয়ে লক্ষ্মী কুণ্ডু ফটিকের মেয়ে অর্থাৎ অন্ধ বুলার সম্মান নষ্ট করেছে। নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে বিচিত্র লড়াই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে।

চটকলের দিনমজুরদের জীবন নিয়ে লেখা একটি গল্প হল 'জোয়ার ভাটা'। গঙ্গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এ গল্পের পটভূমি। এখানে দিনমজুর হিসেবে শুধুমাত্র পুরুষ নয়, নারীরাও সমানভাবে রয়েছে। মজুরদের দলে রয়েছে পাঁচজন নারী এবং পনেরো জন পুরুষ কর্মী। চটকলের আড়তে তারা নৌকা থেকে মাল ওঠা-নামানোর কাজ করে। তবে এ কোন স্থায়ী কাজ নয়। এই প্রসঙ্গে কথক তাদের জীবনকে নদীর জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ জোয়ারের ফলে যেমন নদীর পূর্ণতা প্রকাশ পায় অনুরূপভাবে গঙ্গায় এই জোয়ারের জলে নৌকা ভেসে এলে তবেই তাদের কর্মসংস্থান হয়। সেইসঙ্গে খাবারেরও ব্যবস্থা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সব দিন জোয়ারের ফলেই যে তাদের কাজের ব্যবস্থা হয় এমনটাও আবার

নয়। ফলে কোনো কোনো দিন তাদের কাজের অন্বেষণে ইট পোড়ানো কলে, বাড়ি তৈরির কন্ট্রাক্টরের ফার্মে কিংবা সুরকির গোলায় কাজ করতে যেতে হয়। তবে সেখানেও এক অনিশ্চয়তা রয়েছে। অর্থাৎ এসব জায়গায়ও সবসময় কাজ মেলে না। আবার একসঙ্গে কখনই দু-তিন দিনের কাজ জোটে না। তাদের 'এ ছন্নছাড়া আয়ের মতো জীবনও ছন্নছাড়া। কম হোক, বেশি হোক, কোনও বাঁধা আয় নেই অথচ বাঁধা পেট আছে।'[১১] বস্তুত মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ক্ষুধার জন্যই তাদের এ জীবনসংগ্রাম। গল্পে আমরা লক্ষ করি, শুধুমাত্র খাদ্যসংস্থানের তাড়নায় মজুরেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। জীবিকাহীনতা এদের নিরাশ করে তোলে। এ এক অদ্ভুত অনিশ্চিত সংগ্রামী জীবন। 'যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ আশ'- এটাই তাদের জীবনবীক্ষা। বাঁধা কাজের স্বপ্ন তারা দেখে, কিন্তু তা যে দুর্লভ তারা সেটা ভালো করেই জানে। চটকলের জীবনের মধ্যেও যে সূক্ষ্ম শ্রেণিগত পার্থক্য রয়েছে তা আমরা এই গল্পে লক্ষ করি। কাজ না করার পর একজন বাঁধা কর্মচারী এবং একজন অস্থায়ী দিনমজুরের জন্য যে ভিন্ন ব্যবস্থা গল্পে তার উল্লেখ রয়েছে। দিনমজুরদের গাওয়া সেই গানে উঠে আসে তাদের সংগ্রামী জীবনকথা:

বাবুসাহেব গো, পেট ভরেনি,
কাজ করিয়ে প'সা দেও, ক্ষুধা মরেনি।
দেখ আমার শুকনো বুক, ছাঁয়ের তেষ মেটেনি,
বয়স কালের শরীলে মোর রং লাগেনি।[১২]

আসলে গল্পকার এখানে দিনমজুরের অস্থায়ী অনিশ্চিত কাজ এবং স্থায়ী নিশ্চিত খিদে—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করেছেন।

সমরেশ বসু তাঁর 'মরশুমের একদিন' ছোটগল্পে মানুষের দারিদ্র্যের এক ভিন্ন ছবি তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র নবীন, সে থিয়েটারে যাত্রার অভিনয়ের কাজ করে। প্রতি অভিনয় পিছু তার উপার্জন। থিয়েটার থেকে উপার্জিত সামান্য টাকাতেই তার অভাবের সংসার চলে। অর্থ উপার্জনের কথা চিন্তা করে শরীরে রাতজাগা ক্লান্তিকে সে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। এছাড়াও নবীন মাঝেমধ্যে পতিতালয়ে গিয়ে তবলা বাজায়। আলোচ্য গল্পে, নবীনের জীবনের পাশাপাশি বিপিন, ফনে, সানার জীবনকথাও রয়েছে। যারা মূলত থিয়েটারে মঞ্চ তৈরি, সিন খাটান, মাল বওয়া প্রভৃতি কাজ করে। নবীনের মত এদের জীবনেও অর্থের বিশেষ অভাব লক্ষ্য করা যায়। সংসার জীবনের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাদের এই ভাবনা থেকে পিছিয়ে আসতে দেখি। তবে গল্পে সানার আকস্মিক আত্মহত্যা তাদের এই অভাবের চিত্রকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। এই ঘটনার কারণ যেমন সানার আর্থিক সংকট তেমনি এই ঘটনার ফলে যে তারা যে কাজ বন্ধ দিয়ে সানার মৃত্যুতে ব্যথিত হবে সেই অবসর বা সুযোগটুকুও তাদের জীবনে নেই। আসলে সানার আত্মহত্যা সকলকে আহত করলেও কাজের মরশুমের সময় একদিনও যে তারা নষ্ট করতে পারে না

নবীনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের এই চরম সত্য গল্পে উঠে এসেছে। এবং আমরা দেখি, নবীনের যেহেতু প্রতি যাত্রা-পিছু তার উপার্জন তাই সানার মৃত্যুর কথা জেনেও সে মরশুমের সময়কালে একদিনও নষ্ট করতে চায়নি। আসলে এখানে মানুষের হৃদয়, আবেগ ও সংবেদনশীলতার থেকে বড় হয়ে উঠেছে মানুষের অর্থের উপার্জন তথা তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই।

'আদাব' গল্পটি শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। আমরা জানি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়পর্বে মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর আহ্বানে দেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। এই ঘটনার অভিঘাত সমসময় অবিভক্ত বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দুই শ্রেণির মানুষের মধ্যে পারস্পারিক সন্দেহ, বিদ্বেষ, ঘৃণা এই দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটায়। 'আদাব' এই গল্পে আমরা সেই একই প্রতিচ্ছবি লক্ষ করি। গল্প শুরুই হয়েছে এক অস্থির সময়ের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এ গল্পের চরিত্র দুইজন মানুষ অর্থাৎ সুতাকলের শ্রমিক এবং নৌকার মাঝি, জাতিতে যথাক্রমে তারা হিন্দু ও মুসলমান। তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে সমকালীন দাঙ্গার নানা ছবি। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলাফল যে কী ভয়ানক হতে পারে সেই বিষয়টি গল্পে কাহিনির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে—

"শহরে ১৪৪ধারা, আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই, দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দলচোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারের আশ্রয় করে।

লুঠেরারা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলেছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী গাড়ি। তারা গুলি ছুড়ছে দিক্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।"[১৩]

এছাড়াও আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'প্রাণ-পিপাস' গল্পে এক গরিব পতিতা ও অভাবী যুবকের জীবন যন্ত্রণার কথা, আর 'ঈশানে মেঘ' গল্পে মানুষের স্বার্থপর জটিল মানসিকতা ভূপতিচরণের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে গল্পে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি, 'মরশুমের একদিন' গল্পগ্রন্থের ছোটগল্প গুলিতে সমরেশ বসু আমাদের পরিচিত জনজীবনের বহুবিধ দিক তুলে ধরেছেন। জীবন বীভৎস, জীবন অশান্ত, জীবন ক্লিন্ন, কিন্তু সেই সঙ্গে জীবন দুর্মর এবং অপরাজেয় উল্লেখ্য, গল্পগুলিতে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা 'পকেটমার' গল্পে গৌরমোহনের পরিবার, 'শেষ মেলায়' গল্পে মোহনের জীবন, 'বিষের ঝাড়' গল্পে হারাধনের পরিবার, 'কাজ নেই' গল্পে ফটিকচাঁদ-এর কথা উল্লেখ করতে পারি। আবার গল্পে শ্রমিকজীবন ('জলসা', 'মরশুমের একদিন'), উদ্বাস্তুদের জীবন ('গন্তব্য') সংগ্রামের কথা এসেছে। এছাড়াও

সমকালীন সময় তাঁর ছোটগল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা তাঁর 'আদাব' গল্পটির কথা বিশেষভাবে বলতে পারি। আসলে লেখক ব্যক্তিজীবনে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মরশুমের একদিন'-এ সেই বিচিত্র শ্রেণির মানুষের জীবন কথায় সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে।

**উল্লেখপঞ্জি:**


১. সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্য, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকা, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা, ৫৫ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ১৪ মে ১৯৮৮, পৃ. ২৫।
২. তদেব, পৃ. ২৮।
৩. সমরেশ বসু, প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকা, ৫৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ২২ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৮৬।
৪. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী, ১৯৫৭।
৫. সমরেশ বসু, শেষ মেলায়, মরশুমের একদিন, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ১৯৫২, পৃ. ২২।
৬. তদেব, পৃ. ১৯।
৭. সমরেশ বসু, গন্তব্য, পূর্বোক্ত 'মরশুমের একদিন', পৃ. ৪৪।
৮. তদেব, পৃ. ৪৭।
৯. বিজলি সরকার, সমরেশ বসুর ছোটগল্প: পর্ব-পর্বান্তর, সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও বিজলি সরকার সম্পাদিত সমরেশ বসু: স্মরণ-সমীক্ষণ, চয়নিকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৪৪৬।
১০. সমরেশ বসু, কাজ নেই, পূর্বোক্ত 'মরশুমের একদিন', পৃ. ১০৪।
১১. সমরেশ বসু, জোয়ার ভাটা, পূর্বোক্ত 'মরশুমের একদিন', পৃ. ১৩২।
১২. তদেব, পৃ. ১৩৫-৩৬।
১৩. সমরেশ বসু, আদাব, পূর্বোক্ত 'মরশুমের একদিন', পৃ. ১৬৭।
১৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু: ব্যক্তি ও লেখক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সমরেশ বসু রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দশম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃ. ৯।


**সহায়ক গ্রন্থ :**


১. সমরেশ বসু-র গল্পসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৭৮।
২. নিতাই বসু, কালকূট সমরেশ, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
৩. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু: সময়ের চিহ্ন, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৯৭।

# সমরেশ বসুর 'আলোয় ফেরা' : অন্ধকার পিয়াসী এক 'আমি'-র গল্প

শ্রীনাথ মাইতি

সমরেশ বসু ছিলেন জীবন ও শিল্পের কথাকার। তাঁর কথাশিল্পের মূল অন্বিষ্ট বিচিত্র জীবন। জীবনের এই বহুমাত্রিক অন্বেষণ অভিজ্ঞতার জারকরসে জারিত হয়ে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। বাস্তব জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে মায়ের কাছে শোনা ব্রতকথা তাঁর সাহিত্যিক মননকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে সমরেশ বসুর মন্তব্য, "সেইসব ব্রতকথা ও কাহিনী শৈশবের হৃদয় ও মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত, এবং তখনই, প্রেরণা বোধ হত, যার ভাবনা চিন্তার ধরনটা তখন ছিল একেবারেই আলাদা, অন্য বন্ধুদের শোনাতে হবে সেই কাহিনী। আর শোনাতে গেলেই, কাহিনীর কোথাও কিঞ্চিৎ রঙ বদলিয়ে যেত, বুঝতে পারি, শৈশবের সেই কোমলতায় আবির্ভূত হয়েছে কঠিনতা, টোল খেয়েছে, দাগ পড়েছে। অভ্যন্তরে জট পাকিয়েছে বিবিধ বহুতর জটিলতা। তথাপি মনে হয় এখনও অবিরাম ছুটে ছুটে যাই শৈশবে, রসের সন্ধানে সেই মূলে।"[১] এই বোধ তাঁর সমগ্র সাহিত্য জীবনের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। সমকালীন লেখকগোষ্ঠী থেকে সমরেশ বসুর বিশিষ্টতা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন, 'অন্য সমকালীন লেখকেরা লেখার জন্য জীবনকে খুঁজেছেন। সমরেশ সেখানে জীবন দিয়ে জীবনকে খুঁজেছেন। তাঁর অস্তিস্ত্বের সবটুকু, বলা ভাল তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল জীবনকে খুঁজে ফেরা।'[২] ঠিক এইভাবেই 'আলোয় ফেরা' গল্পের গোকুলচন্দ্রও জীবনকে খুঁজেছেন অন্ধকারের মধ্যে যে অন্ধকার 'আলো'-র অনুসারী। এই অন্ধকার থেকেই জন্ম নিয়েছে এক অন্ধকার পিয়াসী 'আমি'। তাই গোকুলচন্দ্র শেষ পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়েই আলো-তে প্রত্যাবর্তন করেন। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা বিচিত্র অন্ধকারের মধ্য থেকে উঠে আসা অন্ধকার পিয়াসী এক 'আমি'-র অন্বেষণের মাধ্যমে সমরেশ বসুর 'আলোয় ফেরা' গল্পটিকে নিরীক্ষণ করেছি।

'আলোয় ফেরা' গল্পটি আলোয় ফেরা গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প। 'ঢং ঢং ঢং...।' বাক্যটি দিয়ে গল্পের শুরু। একেবারে সূচনাতেই গল্প কথকের সঙ্গেই একজন 'তিনি'-র সঙ্গলাভ করি আমরা। 'চার, পাঁচ দশ-এগারো-বারো' এইভাবে সময় গণনা করতে লাগলেন তিনি। গল্পের সূচনা যে ঘণ্টাধ্বনিতে সেই ঘণ্টাধ্বনিকে কেন্দ্র করে আলো-অন্ধকারের আবহ নির্মাণের একটা প্রয়াস লক্ষিত হয়। অন্ধকারে থমকে রয়েছে আলোর উচ্ছ্বাস। এখানে 'আলো'-র সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ফেনিলোচ্ছল উচ্ছ্বাস, হাসি, স্রোতমুক্ত তরঙ্গ, একটি বিস্মিত আনন্দস্ফূট ধ্বনি প্রভৃতি শব্দসমূহ। অন্যদিকে চির আবদ্ধ, নির্বাক দেওয়াল, সীমাহীন স্তব্ধতা প্রভৃতি শব্দগুলির প্রয়োগ ঘটেছে অন্ধকারের পরিপূরক হিসেবে। আলো ও অন্ধকারের আবর্তনে যেন সময় স্তব্ধ হয়ে আছে।

এই আলো-অন্ধকারের আবর্তন সংঘটিত হচ্ছে গোকুলচন্দ্রের অন্তরে। এই গোকুলচন্দ্রই প্রথমে 'তিনি' নামে পরিচিতি লাভ করে। গোকুলচন্দ্র এই আর্বতন উপলব্ধি করছে নিঃশব্দে। বুকের ওপর দুহাত দিয়ে আবর্তনের এই গতি রোধ করার চেষ্টা করছে। ক্রমে হাত দুটি দিয়ে তিনি মুখ ও চোখ আবৃত করলেন। মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল। ওষুধের গন্ধ স্পষ্ট হয়ে এল তাঁর ঘ্রাণে। আর এই গন্ধের মাধ্যমে স্তব্ধ ভয়ের অনুভূতি ভাসমান চিত্রের মতো অনুভূত হল গোকুলচন্দ্রের মানসপটে। আর তারই সূত্র ধরে আত্মপ্রকাশ করল পঞ্চাশ বছর আগের গোকুলচন্দ্রের আট বছর বয়সের 'আমি'। এই 'আমি'-র মধ্য দিয়েই উপস্থাপিত হল হাসপাতালের প্রথম দিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ। এই হাসপাতালে গোকুল প্রথম এসেছিল তার বিধবা মায়ের সঙ্গে। বর্তমান গোকুলচন্দ্র থেকে যেন এই গোকুল ভিন্ন। গোকুলচন্দ্রকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে তার আট বছর বয়সের 'আমি' সত্তা স্মৃতির রেখা বেয়ে গোকুলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছোট্ট গোকুল হাসপাতালের আশেপাশের দৃশ্যমান পরিবেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে— হাসপাতালের বাড়িটার রং লাল, কলাফুলের রং হলদে আর আকাশের রং দিদির পূজার কাপড়ের মতো নীল কিনা তা তার মায়ের কাছ থেকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিল। তারপর চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য হাসপাতালের ঘরে ঢুকেছিল। টর্চ লাইটের আলোর ঝলক দিয়ে ডাক্তার তার চক্ষু পরীক্ষা করেছিল। আর এই আলোর চকিত ঝলক সরে যেতেই গোকুল বাড়ি ফিরে এসেছিল এবং চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। বাড়ি ফিরে এসে সে স্বপ্ন দেখেছিল।

আর মনে আছে, স্বপ্ন দেখছিল। পাশে স্যাকরাদের বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। মাঝারি বাতাস। ঘুড়িটার কোনোদিকে একটু কান্নিক নেই। সেই একেবারে নীল, রৌদ্রমাখা আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে। বিশ্বকর্মা পুজো বুঝি আসন্ন। লাটাই ধরে ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে গোকুল লাফিয়ে লাফিয়ে গাইছে, ঝিঙেফল কাঁকুড় কাঁকুড়, ও গেঁড়ি বউ মোনসা ঠাকুর।... গাইতে গাইতে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেছিল, রাত হয়ে গিয়েছে। ঘর অন্ধকার।[৩]

শিশুমনের ইচ্ছেগুলো কল্পনার রঙিন পাখায় ভর করে স্বপ্নের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। স্বপ্নের আলোমাখা এই অনুভূতি ছিল ক্ষণিকের, কেননা এরপরেই আসে অন্ধকার বাস্তবতার অবয়ব। অন্ধকারের তীব্রতা অনুভবের শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা এরপর থেকে তার সূচিত হয়েছিল।

ঘণ্টাধ্বনির শব্দে আমরা গোকুলচন্দ্রের কাছে ফিরে আসি। তাঁর অন্তরের মধ্যে আবর্তনের সেই তীব্রতা আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। পঞ্চাশ বছর আগেকার ভয়ংকর স্মৃতি তাঁকে আর হতাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করতে পাচ্ছে না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগের সেই শেষ আলোক কণা খুশির সুরে চোখের দুয়ার ভেঙে প্লাবিত হওয়ার আশায় উদগ্রীব হয়ে আছে। এই অবকাশে কথকের মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে আসে গোকুলচন্দ্রের মহান সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে

এক উজ্জ্বল পরিচিতি। ক্রমে কথক এই পরিচিতিকে বিস্তার দান করেছে যথাযথ প্রকরণ শিল্পের মাধ্যমে।

গোকুলচন্দ্র স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে পৌঁছতে চায় গোকুলের কাছে। অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া মাত্র তাকে সম্বোধন করে।

নিজেকেই সম্বোধন করে বললেন, গোকুল আবার, সেই পাতাঝরা সকাল ফিরে আসছে। আঃ! কী আশ্চর্য"! সেই পায়রা-ওড়া সকাল, কলাফুলফোটা সকাল তোমার চোখের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। কাল সে বেরিয়ে আসবে। এই গাঢ় অন্ধকার থেকে ভেসে উঠবে। তাই শুভেন আসছে![৪]

এই সম্বোধন হয়ে উঠে আত্মসম্বোধন। এই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে গোকুলচন্দ্র 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'-তে ফিরতে চেয়েছেন। এই ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাস তার অন্তরের কুঠুরিতে প্রবাহিত হতে হতে পৌঁছেছে তার 'আমি'-র কাছে। এই 'আমি'-র উত্তর প্রতিধ্বনিত হয় ওর ভিতরে 'হ্যাঁ, তাই শুভেন আসছে।' পরমুহূর্তেই 'স্পর্শ দিয়ে অনুভব-করা' শুভেন মূর্ত হয়ে ওঠে। সুইডেন ফেরত চক্ষু-বিশারদ ডাক্তার শুভেন। সঙ্গীতশিল্পী গোকুলচন্দ্রের আবাল্য ভক্ত। গোকুলচন্দ্র শুভেনের কাছে স্বপ্নের শিল্পী। এই শুভেন অনেক অন্ধকার রাত্রি গোকুলচন্দ্রের "হে ভাই অন্ধকার, তোমার অন্ধকারের শিখায় আমি দেখেছি পূর্ণ জ্যোতি" গান শুনে কাটিয়েছে। লক্ষণীয়, এই গানের প্রথম 'অন্ধকার' শব্দটি নিছকই অন্ধকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় 'অন্ধকার' শব্দটি অন্ধকারের অন্তর্নিহিত অন্ধকার-কে বুঝিয়েছে, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে 'পূর্ণ জ্যোতি'। 'আপনি দেখতে পাবেন।' শুভেনের এই কণ্ঠস্বর গোকুলের কাছে মনে হয়েছিল দৈববাণী'। আর এই সময়ই তার 'পঞ্চাশ বছরের গাঢ় অন্ধকারের যন্ত্রণা সেই মাত্র যেন ওঁকে প্রথম অস্থির করে তুলেছিল।' শুভেন সম্বন্ধিত এইসব দৃশ্য গোকুলচন্দ্র দেখছিলেন তাঁর 'অনুভূতির আলোয়'। যে শুভেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাঁকে আলোর জগতে ফিরিয়ে নিয়ে আনবে অর্থাৎ সে দেখতে পাবে। শুভেনের এই প্রতিশ্রুতি গোকুলচন্দ্রের অনুভূতিতে আঁচড় কেটেছিল। তাই গোকুলচন্দ্রের 'সর্বব্যাপী অন্ধকারের পটে একটি রোদে-ভাসা সকাল' প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল।

পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু সময়ের এই ঘণ্টাধ্বনি তাঁর কানে পৌঁছাল না। 'স্মৃতি-সায়রের ডুব-সাঁতারে উজানবাহী মীন' গোকুল জীবনের বিচিত্র অন্ধকার থেকে আলো নিঙড়ে নিয়ে তার অন্তঃস্থিত 'আমি'-কে আলোকোজ্জ্বল করে তুলছে। আলোক-স্নাত বিচিত্র পৃথিবী দেখার আশায় মশগুল।

আট বছরের গোকুলের অন্ধকারকে কেন্দ্র করে যে বিভীষিকা তৈরি হয়েছিল তার সূত্র ধরেই গোকুল আবার সেই সময়কার স্মৃতিতে ফিরে যায়। 'আমি অন্ধকারেই থাকি' দিদির গাওয়া এই গানটি গোকুলকে অস্পষ্ট অর্থবহ সুরের দোলা দিয়েছিল। যা তার ভবিষ্যতের

আলোময় জগৎ নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। দিদির সঙ্গেই গোকুল গান গান খেলা খেলত। মাঝে মাঝে দিদির কান্না গোকুলকে আলোড়িত করত। দিদি ও মায়ের স্নেহ এবং বেদনার অনুভবের মধ্য দিয়ে গোকুল আত্মভাবনায় ভাবিত হয়

সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাবার সেই যেন এক পরম সান্ত্বনা হয়ে উঠেছিল। পরম আশ্রয়। আর তারই ভিতর দিয়ে একটি সচেতনতা আসছিল, তার কোনও কথা শুনলে মা আর দিদির কষ্ট হয়। কান্না পায়। তাই মুখে নীরব হয়ে উঠছিল, কিন্তু মুখর হয়ে উঠছিল ভিতরটা। তাই দুঃসহ অন্ধকারের কান্নাটা লুকোতে শিখেছিল।[৫]

হারু লাহার সেই গানের আড্ডা থেকে মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা সেদিনের গোকুলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং বর্তমান গোকুলচন্দ্র মুখে হাত চাপা দিয়েছিল। স্মৃতিচারণের ভিতর দিয়ে আবার ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠে। মায়ের মৃত্যুর পরমুহূর্তে নিতাই স্যাকরার প্রশ্নে গোকুলের ভিতর একজন 'আমি' জাগরিত হয়। "সেই মুহূর্তে গোকুলের ভিতর কে যেন আপনি আপনি বলে উঠেছিল, মনে হয়, চিরদিন কেউ থাকে না।"[৬] অন্ধকার থেকে জাগ্রত এই 'আমি' হয়ে ওঠে গোকুলের সঙ্গী। জীবন হয়ে ওঠে এরকম "তাই সেই দুঃসহ অন্ধকার, যুগে যুগে অন্ধকারে লেগেছে উজান বাতাসের তাড়া। পাতার পর পাতা চলেছে খুলে অন্ধকারের ইতিবৃত্ত।"[৭] মা মারা যাওয়ার পর গোকুলের একবার মনে হয়েছিল সে যেন আর একবার চোখ হারিয়েছে। এই মনে হওয়া ভাবনা গোকুলের অন্তঃস্থিত 'আমি'-র। প্রথমবার চোখ হারানোর পর মাই ছিল গোকুলের বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে। আর সেই মা মারা যাওয়ার পর তাই গোকুলের মনে হয়েছে সে নতুন করে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। এরপর গোকুল হারু লাহার সংস্পর্শে এসে সঙ্গীত চর্চার অবকাশ পেয়েছিল। গানকে কেন্দ্র করে তাদের এই বন্ধন ছিল বয়স ও অন্ধত্বের সমস্ত বাধা বহির্ভূত। ক্রমে গানের জগতে গোকুলের প্রসার বাড়তে থাকে। আর্থিক অনটন মাঝে মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর সূত্র ধরেই একটা ঘটনা ঘটে যায়। তার জামাইবাবু একটি হারমোনিয়াম কিনে আনে তা শুধুমাত্র তার সঙ্গীতচর্চার অগ্রগতির জন্য নয়, এটাকে তার উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ হারমোনিয়াম গলায় নিয়ে ভিক্ষা করতে বলে। এই কথা গোকুলের দিদিকে ব্যথিত করে বেশি। আর এই আঘাত এসে পৌঁছেছিল গোকুলের অন্তরে, বহিঃপ্রকাশ ছিল না। ওই হারমোনিয়ামটা গোকুলের জীবনে একটা 'বিচিত্র রহস্যময় সঙ্কেতের মতো'।

গোকুলের অন্ধকারের ইতিবৃত্তে আর একটা মাইলস্টোন ছিল ইন্দ্রাণী থিয়েটারের লীলাবতী। এই লীলাকে তিনি গান শেখাতেন। অন্ধ হয়েও গোকুল টের পেয়েছিল লীলার মধ্যে আগুন এবং সহজ সাবলীলতা লুকিয়ে ছিল। লীলা একদিন গোকুলকে প্রশ্ন করেছিল মেয়েমানুষ সম্পর্কে। লীলার এই প্রশ্ন গোকুলের অন্তরে ঝড় তুলেছিল। তার মনের অবস্থা

তখন পুরুষেরা যে জন্যে মেয়েদের পিছনে ছোটে! যেন বুঝতে পারেননি গোকুল অথচ তাঁর চোখের, প্রাণের অন্ধকার মধ্যে যেন একটা বিশাল সরীসৃপ চিরনিদ্রা থেকে সেই প্রথম সহসা পাক দিয়ে আকুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। সেই প্রথম, তবু নারী-পুরুষের সেই সম্পর্কটা যেন ঠিক বুঝতে পারেন নি। অথচ লীলার কথায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছিলেন।[৮]

গোকুলের সঙ্গে কথাসূত্রে একদিন লীলাই গোকুলের একটা হাত টেনে তার সারা গায়ে বুলিয়ে দেয়। গোকুল লীলার শরীরের স্পর্শসৌভাগ্য লাভ করে। গোকুলের অন্ধকার পিয়াসী 'আমি'-র বিবর্তন সূচিত হয় "গোকুলের দুঃসহ অন্ধকার যেন তীব্র যন্ত্রণাতেই কেঁপে উঠেছিল। আর সেই যন্ত্রণার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব শিহরন। প্রায় চুপিচুপি বলেছিলেন, তুমি সুন্দর!"[৯] 'তুমি সুন্দর!' এই বাক্যটি তাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। লীলা একদিন গোকুলকে ইন্দ্রাণী থিয়েটারে তার আলাদা ঘরে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। গোকুল যায়নি সেদিন। ফিরিয়ে দিয়েছিল লীলাকে। পরের বার লীলার বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ গোকুল উপেক্ষা করতে পারেনি। লীলার 'আমাকে আপনি ভালোবাসেন না?' বলতে বলতে ঠোঁট স্পর্শ করেছিল গোকুলের চিবুকে। আর তাতেই গোকুলের মধ্যস্থিত অন্ধকার আলোড়িত হয়; গোকুলের মনে হয়েছিল, তাঁর অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ একটা ওলটপালট হয়ে গেল। তিনি যেন দেখছিলেন, দুটো কালো পাখা ঝাপট খেয়ে কাঁপছে। কোনো রকমে অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিলেন, 'যাব, যাব'।[১০]

'যাব, যাব'—এই উচ্চারণ তাঁর অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠে আসে। লীলার বিলাসকক্ষেই সেদিন অন্ধকারের যাত্রা নির্দেশিত হয়েছিল। শুরু হয়েছিল লীলার বাড়িতে যাতায়াত। এর মধ্যেই একদিন 'যে-অন্ধকার লীলার বাড়ি যাত্রা নির্দেশ করেছিল, সেই অন্ধকার থেকেই একটি প্রতিবাদ পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তাঁর গান উচ্ছ্বসিত গলায় ভর করছিল। মাঝে মাঝে নীরব হয়ে যেতেন।"[১১] জাগ্রত হয়েছিল তাঁর অন্ধকার পিয়াসী 'আমি'। এই 'অন্ধকার' কেবলমাত্র অন্ধকার নয়, বহু বিচিত্র অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে হয়ে উঠেছিল আলো-র অনুসারী।

ক্রমে গোকুলের কাছে স্পষ্ট হয় তার বর্তমান অবস্থার স্বরূপ। একদিকে লীলাকে ছেড়ে থাকতে পারছে না, অন্য দিকে ওই পরিবেশকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। এরকম অবস্থায় একদিন—

তবে সন্ধ্যা হলে, তাঁর অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা স্পর্শহীন শক্তি তাঁকে ঠেলে নিয়ে যেত সেখানে। থমকে গেলে, তাঁর পায়ে সে আঘাত করে ছুটিয়ে নিয়ে যেত। আর, তাঁর সামনেই লীলা অপরের আলিঙ্গনে রঙ্গিণী হয়ে উঠত। টের পেতেন তিনি। শুনতেন, লীলার আপত্তি শুনে পুরুষের মত্ত স্বর গুঙিয়ে উঠছে, আরে বাপু, আর যাই হোক, কানা তো। দেখতে তো পাচ্ছে না।[১২]

অবশেষে সেই চরম অবমাননার দিনটি এসেছিল। কয়েকজন মিলে তাঁকে লীলার উঠোন বাড়িতে চিত করে শুইয়ে তাঁর সারা শরীরে মদ ঢেলে দিয়েছিল। আর তারপরেই তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। চারিদিকে পড়েছিল উল্লসিত হাততালি।

এখানেই এই দৃশ্যের ক্ষণিক বিরতি। কিন্তু এবার ঘণ্টাধ্বনি নয়। বাড়ির নীচে কিসের শব্দে স্মৃতিচারণার স্রোত থমকে গেল। বর্তমানে পৌঁছে দেখে শালিক-চড়ুইদের জটলা কানে আসে। কিন্তু অন্ধকারের সেই আবর্ত এখনো শেষ হয়নি। আবার তাঁকে পৌঁছাতে হয় স্মৃতি সায়রে। পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে তার সূত্রপাত হয়। সেই অবমাননার দিনের পর গোকুল চলে গিয়েছিলেন বম্বে, সেখান থেকে চিত্র জগতের নিমন্ত্রণ এসেছিল। কিছুদিন পর সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। মাঝে মাঝে 'তাঁর অন্ধকারের মধ্যে কী এক সুর যেন ধ্বনিত হচ্ছে। সেই অস্পষ্ট সুর আর কথা শোনবার জন্যে তিনি দিনের পর দিন চুপ করে বসে থাকতেন।'[১৩] আবার লীলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কালের কালাজ্বরে লীলার চেহারা তখন কালো কঙ্কালের মতো। খবর শুনে গোকুল দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। এবারেও লীলা গোকুলের হাত নিয়ে তার গায়ে-মুখে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে বলেছিল, 'দেখ, গোকুলবাবু আমাকে দেখ, আমাকে দেখ।' এই দৃশ্য গোকুলের অন্তঃকরণে পৌঁছলে 'গোকুলের সর্বব্যাপী অন্ধকার লবণাক্ত জলে টলমল করে উঠেছিল।' এবং একই সঙ্গে তার অন্ধকার পিয়াসী 'আমি' বলে উঠেছিল, 'সব দেখেছি লীলা, সব।'

আবার স্মৃতি থেকে প্রত্যাবর্তন। এবার সুগতার 'মামা! মামা!' ডাক শুনে চমকে উঠছিলেন গোকুলচন্দ্র। অবশেষে এল সেই দিন, গোকুলের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন। আবার তিনি দৃষ্টি ফিরে পাবেন। কিন্তু এরকম দিনে গোকুলের অনুভূতি—

"শুভেনের গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন গোকুল, এই চোখের দরজা খুলে আমি আর কী দেখব বল। আমার যেটুকু, তা যে আমার সব দেখা হয়েছে। আমার অন্ধকারে যে সব দেখেছি।"[১৪]

বৃদ্ধা দিদির ভাঙা ভাঙা গলায় আবার সেই গানের পুনরাবৃত্তি :

'আমি অন্ধকারেই থাকি
তুমি আঁধার রাতেই এসো।'

এই গানের অর্থ সেদিন আট বছরের ছোট্ট গোকুল বুঝতে পারেনি, কিন্তু তার মনে একটা অনুরণন তুলেছিল। আজ তাঁর কাছে এই গানের প্রতিটি শব্দ জীবন ও অনুভূতির আলোর স্পর্শে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। সমাপ্ত হল এক অন্ধকার পিয়াসী 'আমি'-র গল্প। এই অন্ধকার বিচিত্র অন্ধকার থেকে বিবর্তিত এক কণা মাত্র, যা অন্ধকারকে আত্মস্থ করে বা অন্ধকার থেকে সমিধ সংগ্রহ করে আলোর আধার হয়ে উঠেছিল, যা দিয়ে "গোকুলচন্দ্র জগতের সব আলো দেখতে পেয়েছিলেন। আরো দেখতে পেয়েছিলেন 'গোকুল আবার

চুপিচুপি গলায় বললেন, দেখছি, দেখতে পাচ্ছি শুভেন। সাদা-লাল-নীল ঘাসফুল, তাতে শিশির পড়েছে, রোদে চিকচিক করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীতে কত ঘাসফুল।"[১৫] এভাবেই সঙ্ঘটিত হল তাঁর আলোয় ফেরা।

নিতাই বসু এই গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—'আলোয় ফেরা' গল্পেও গোকুলচন্দ্রকে দিয়ে লেখক এক লহমায় জীবনের সার সত্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন। গোকুলচন্দ্র অন্ধ হলেও সংগীত জগতে প্রতিষ্ঠার হাত ধরে খ্যাতি, যশ, অর্থ, নারী অর্থাৎ সবকিছুই পেয়েছেন। কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে জনৈক খ্যাতনামা চক্ষু-চিকিৎসকের পরামর্শে যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার সম্ভাবনা হল, তিনি সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, 'এই সামান্য চোখের পর্দা সরিয়ে কিছু দেখবার আর দিন নেই।' এইসব ছোটগল্প পড়তে গিয়ে আমরা দেখি সমরেশের ব্যক্তিত্বের একটা পরিশ্রুত রূপ, লাভ করি তাঁর চরিত্র ও মানসিকতার-অনুসারী এক অপূর্ব সংবেদনা, সেটা তাঁর সত্তারই প্রতীক। গল্পের স্রষ্টা হিসেবে সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অনায়াস দক্ষতায় তিনি নিজেকে অভিব্যক্ত ও সম্প্রসারিত করেছেন।[১৬]

গল্প কথকের মুখনিঃসৃত এই গল্পে সময় ও জীবনের এবং সেই সঙ্গে আলো ও অন্ধকারের আবর্তন গল্পটিকে যথাযথ অবয়ব দান করেছে। কথনরীতির স্বকীয়তা বর্তমান থেকে অতীতে যাওয়ার পথটিকে সুগম করে তুলেছে। সংবেদনশীল এক আলোময় অনুভূতির সজীবতায় গল্পটি মুখর হয়ে উঠেছে। শিল্পিত হয়েছে অন্ধকার পিয়াসী এক 'আমি'-র গল্প।

**উল্লেখপঞ্জি :**


১. সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্যে, গল্প সংগ্রহ ১, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭৮, পৃ. ২।
২. সমরেশ বসু, জীবন ও শিল্পের সঙ্গে পাঞ্জা, সমরেশ বসু রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, সম্পাদনা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ৯।
৩. সমরেশ বসু, সমরেশ বসু রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, সম্পাদনা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১৭, পৃ. ৭৪৯।
৪. তদেব।
৫. তদেব, পৃ. ৭৫৪।
৬. তদেব, পৃ. ৭৫৬।
৭. তদেব।
৮. তদেব, পৃ. ৭৬০।
৯. তদেব, পৃ. ৭৬১।
১০. তদেব, পৃ. ৭৬২।
১১. তদেব, পৃ. ৭৬৩।

১২. তদেব।
১৩. তদেব, পৃ. ৭৬৪।
১৪. তদেব, পৃ. ৭৬৬।
১৫. তদেব।
১৬. সমরেশ বসু, সমরেশ বসু গল্প সমগ্র, মৌসুমী প্রকাশনী, ১এ, কলেজ রো, কোলকাতা-৭০০০০৯, পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০২২, পৃ. ২০।

**সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা :**

১. সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও বিজলি সরকার (সম্পাদনা), সমরেশ বসু : স্মরণ- সমীক্ষণ, চয়নিকা, ৪৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।
২. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৯।
৩. নিতাই বসু, কথাশিল্পীর অ্যালবাম, অভিজাত প্রকাশনী, কলকাতা ৩৪, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
৪. সাগরময় ঘোষ (সম্পাদক), দেশ, ৫৫ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, সমরেশ বসু স্মরণে, ৩১ বৈশাখ ১৩৯৫/ ১৪ মে ১৯৮৮।

# সমরেশ বসুর গল্পে রাজনৈতিক প্রত্যয় : সাম্যবাদ

মানিক বিশ্বাস

আধুনিক কালের বিতর্কিত এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে যে ত্রয়ী বন্দোপাধ্যায় এসেছিলেন তাঁরা বাংলা গল্প ও উপন্যাসকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ভাবনার বাইরে এক নবতর শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছিলেন। তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিক এই ত্রয়ী বন্দোপাধ্যায়কে অতিক্রম করে যিনি পরবর্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্যে চালকের আসনে বসে সাহিত্যকে পরিচালিত করেছিলেন তিনি কালকূট। ত্রয়ী বন্দোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরিরূপে তিনি মানুষের কথাকে আরও বেশি করে পাঠকের সামনে নিয়ে এলেন। সমরেশ বসু মূলত গল্প ও উপন্যাসেই তাঁর সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের ভাষা, জীবনবোধ, ও সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থাকার ভাবনা তাঁকে প্রথম সারির লেখকের মর্যাদা দিয়েছে। সমরেশ বসুর গল্প ও উপন্যাসে উঠে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানী বোমাতঙ্ক, ভারতছাড়ো আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতালাভ, সাম্যবাদ বা বামপন্থী চেতনার মতো বিষয়। এই সবের পাশাপাশি সমরেশ বসুর লেখাতে যে বিষয়টি সব থেকে বেশি উঠে এসেছে তা হল উদ্বাস্তুদের সমস্যা। এবং এই সমস্যা থেকে উত্তরণের হাতিয়ার রূপে বামপন্থা ভাবনার প্রকাশ। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির পথ হিসাবে বামপন্থী চেতনার প্রথম প্রকাশ পায় মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচে কে বাঁচে', 'হারানের নাত জামাই'। প্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়', মনোজ বসুর 'কন্টোলের লাইন' কিংবা সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' ইত্যাদি রচনাতে। এই সমকালীন সময়ে সমরেশ বসু সৃষ্টি করলেন তাঁর একের পর এক সাম্যবাদী ভাবনা বা বামপন্থী চেতনার গল্প যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'প্রতিরোধ', 'জলসা', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'কিমলিস', 'বিবেক', 'পাতিহাঁস', 'স্বধর্ম' প্রভৃতি গল্প। সমরেশ বসুর ছোটগল্পের কথা বলতে গিয়ে ড. শ্রী কুমার বন্ধোপাধ্যায় বলেছেন— "ছোটগল্প লেখকের আবিষ্কারের চক্ষু থাকা চাই। তিনি জীবনের এমন কিছু খণ্ডাংশ নির্বাচন করিবেন যাহারা সাধারণত আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। যাহারা যুগপৎ প্রত্যাশিত ও রস-সমৃদ্ধ। সমরেশ বসুর অধিকাংশ গল্পের উপরেই এই অসাধারণত্বের ছাপ লক্ষিত হয়।"[১]

লেখক সমরেশ বসু ব্যক্তিজীবনে কমিউনিস্ট ছিলেন। বামপন্থী ভাবনা না এলেও যে গল্পটিতে সরাররি এসেছে তা হল সমরেশ বসুর 'জলসা'। এই গল্পের মধ্যে লেখক শ্রমিকদের উপর মালিক পক্ষের অত্যাচারের বর্ণনাই শুধু করেননি, দেখিয়েছেন শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার ঘটনাকেও। গল্পে দেখা যায় কারখানার ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা একত্রিত হয়ে মালিক ও পুলিশকে আক্রমণ করে। তার পরেই দেখা যায় প্রতিবাদ দমনের নিষ্ঠুর নীতি—

"রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই নিঃশব্দে একটা কালোগাড়ি এসে দাঁড়াল লাইনের

সামনে। তারপর বেছে বেছে লোক ওঠানো হতে লাগল তার মধ্যে"। ('আদাব',সমরেশ বসু)

অত্যাচারিত সংগ্রামী মানুষগুলিকে যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যায় সেই সময় মঞ্চে আয়োজিত জলসায় 'রঘুপতি রাজা রাম' গান গেয়ে ধর্মের হুঙ্কার ছেড়ে দর্শকদেরকে নিশ্চুপ রাখা হয়। এই সময় লেখক দেখিয়েছেন বুর্জোয়া মালিক প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে তার শ্রমিকদের উপর কীভাবে অত্যাচার চালায়। জলসাকে সামনে রেখে মালিক কীভাবে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কাজ করে। এর নিম্নচিত ঘটনার বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। গর্জে ওঠে সরমা, চন্দ্রিকা, স্বৈরিনী, হীরালালের মতো শ্রমিকেরা। এই প্রতিবাদের ভাষাতেই প্রতিফলিত হতে থাকে বামপন্থী আন্দোলনের বীজ। তবে বুর্জোয়া মালিক পক্ষের শোষণে তা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যায়। তবে এই গল্পে যেভাবে শ্রমিকদের প্রতিবাদের স্বর গর্জে উঠেছিল তা যে ক্ষণস্থায়ী নয় তার প্রমাণ মেলে লেখকের পরবর্তী গল্পগুলিতে।

'প্রতিরোধ' এই প্রতিবাদী ভাবনারই আরেকটি গল্প। এখানে চাষিরা সংঘবদ্ধ হয়ে কী করে নিজেদের গোলায় ধান তুলল তার ছবি রয়েছে। যখন জোতদার গোষ্ঠী দরিদ্র অসহায় চাষীদের ওপর অত্যাচার চালিয়েও তাদের মাথা নীচু করতে পারে না তখন তারা হাতিয়ার হিসাবে বেছে নেয় নির্মম হত্যালীলার। কিন্তু চাষীদের সংগঠিতরূপ প্রাণপণে জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়। জোতদারদের অত্যাচারে অত্যাচারিত চাষিরা তাদের প্রতিবাদে—প্রতিরোধে এততাই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল যে এক কৃষকের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর মৃত্যু হলেও ধান তুলতে দেয়নি জোতদারদের গোলায়। 'প্রতিরোধ' গল্পে মনাই একজন ভাগচাষী, আকালের সময় সে পীতাম্বরের কাছ থেকে বীজ ধান নিয়ে তারই জমিতে ভাগচাষ করছে, সেই কারণে তার মনে আনন্দ আছে। কিন্তু সুবলের গলায় আকালের গান তখনও পুরনো ক্ষতকে জাগিয়ে তোলে। সুবলের গান সমকালীন সময়ের সেই জীবন্ত ইতিহাসেরই প্রমাণ দেয়—

"রহিম চাষী মনাই চাষীর ক্ষয় ধরে গো হাড়ে
আড়তদার রঘুসাউ গুদামে বইয়া চাউলের পোকা ঝাড়ে।
ও-ভাই চাউলের বস্তায় পচানি ধরেছে;
সোনা মিয়ার আড়তে ভাই বস্তা নাহি ধরে,
ও ভাই- কলিরাজা মরণ বাড় বেড়েছে"। ('প্রতিরোধ', সমরেশ বসু)

'প্রতিরোধ' সম্পূর্ণ রূপে এক কৃষক বিদ্রোহের কাহিনি। মাটির সন্তানদের কাছ থেকে লক্ষ্মী লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর গল্প। কিন্তু নারী ও ভূমি, জননী ও ধরিত্রী এখানে সবটাই একাকার হয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার কথা তুলে ধরেছে। আদিম পৃথিবী ছিল মাতৃতান্ত্রিক, মায়ের পূজারী। সুবলের কাছে সন্তানহীনা রাধার কান্না ছাপিয়ে মনাইয়ের চাপা উত্তেজনার সুরটাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আজ ফসল কাটার মরসুম, কাস্তেতে শান দিতে হবে

এবার, নিজেদের দাবি বুঝে নিতে মাঠে নামছে চাষার দল। এতকাল রোদে- জলে- শ্রমে-ফলানো ফসল ওরা তুলে দিয়ে এসেছে মহাজন পীতাম্বর সা'র গোলায়। এবার তেভাগার ডাক পৌঁছেছে তাদের কানে। এখন আর তারা ফসল দেবে না। লড়াই করবে, প্রয়োজনে প্রাণও দেবে। সুবল গান ধরে — "আমার খুনের দানা কাইটা লমু মানি না হুকুমদারি কলিজার খুনের পর দায়-প্রাণ বাচামু সত্য যুগের হকদারি।" লেখক সমরেশ বসু সেদিনের এই খেতে না পাওয়া কৃষকদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মনাই, সুবলকে জানিয়েছিল জোতদারের ঘরে এবার অর্ধেক ফসল তুলে দিয়ে আসবে না। তিন ভাগের দু'ভাগ তারা নেবে। এটা হকের দাবী — তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। এই হকের দাবী তারা এও সহজে ছেড়ে দেবে না। এই ভাবনাই তো বামপন্থী চেতনার সুর।

বামপন্থী চেতনার বীজ আরও বেশী দেখা যায় 'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পে। এই গল্পের বিষয় এমনই মর্মান্তিক যেখানে জোতদারদের অত্যচারে ছেলের মৃত্যু ঘটলেও বাবা ছেলের মৃতদেহ লুকিয়ে রাখে। নবান্নের সময় পৌষ সংক্রান্তির দিন ছেলের মৃতদেহ দেখায় চাষিদের। চাষিরা একজোট হয়ে সংকল্প করে, প্রাণ দেবে তবুও জোতদারদের ধান কিছুতেই দেবে না। মানুষ ক্রমশ সচেতন হচ্ছে বুঝে নিতে শিখছে তাদের হকের দাবী। এই অধিকার বুঝে নিতে নিজের বা পরিবারের প্রাণ গেলেও তারা আন্দোলন থেকে সরে আসছে না। জোতদারদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আরেকটি একটি গল্প 'সিদ্ধান্ত'। এখানে লেখক দেখিয়েছিলেন বাবা মায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকার জন্য ছেলে দলীয় বন্ধুদের সাহায্যে পিতৃহত্যা (প্রয়োজনে মাতৃহত্যা)-র সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটানোর পরিবর্তে ছেলে নিজেকেই শেষ করে দেওয়ার চিন্তা করে। হিন্দু ও মুসলমান রায়টের সমকালীন সময়ের সমরেশ বসুর গল্প 'জয়নাল'। হিন্দু-মুসলমান দু'টি ধর্মের দুই কিশোরের বন্ধুত্ব দিয়ে শুরু হয় গল্প। গল্পটির মূল বিষয় দাঙ্গা। মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে আটকা পড়ে হিন্দু কিশোর মধু। ক্রমশ মধুর মনে অবিশ্বাস, সন্দেহ, পলায়নী মনোবৃত্তি প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে মুসলমান বন্ধু জয়নাল তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে এই ভরসায় জয়নাল নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হিন্দু বন্ধু মধুকে নিয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু সে নিজেই হিন্দু পাড়ায় পুলিশের গুলিতে কার্টু এলাকায় প্রাণ হারায়। এখানে লেখক এক অসাধারণ মানবতার নজির গড়লেন। এই ঘটনা আন্দোলনকারীদের আরও বেশি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়কে কাছাকাছি নিয়ে এলো। বামপন্থী আদর্শের বীজ আরও একবার ধর্মের মেরুকরণকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সবাইকে একই ছাতার নীচে নিয়ে এলো। এখানেই গল্পকারের সার্থকতা।

রাশিয়ায়তে যে বিপ্লব ঘটেছিল তার পর পরই সাম্যবাদ ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীদের মগজধোলাই শুরু করে। ১৯২১-২২ সালে ভারতবর্ষে সাম্যবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদের মূল ভিত্তি ছিল শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শোষণ। সাম্যবাদের মূলে রয়েছে শ্রেণী-সংগ্রাম।

সাম্যবাদের প্রধান লক্ষ্য হল সমাজের শ্রেণীভেদকে দূর করা। লেখক সমরেশ বসু সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। কমিউনিজম সেই সংগ্রামেরই চিহ্ন হয়ে প্রথম এগিয়ে আসে। বুদ্ধিজীবী থেকে শ্রমজীবী সব মানুষের মধ্যেই এই কমিউনিজম চেতনা আনতে কয়েক দশক লেগে যায়। যদিও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে এক দশকের মধ্যেই কমিউনিস্ট ভাবনা চলে আসে। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থক কমিউনিস্ট মতাদর্শের ভাবনা তাঁর লেখাতে দেখাতে পারলেন না। সেদিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁর গল্প উপন্যাসে শ্রেণী-বৈষম্য, শাসন-শোষণ, সংগ্রামের ছবি সার্থকভাবে সামনে এলো। আর সমরেশ বসু তাঁর গল্পে নিজের অভিজ্ঞতাকে জীবনের মূল সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। একই সঙ্গে তিনি সমাজের নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ অশিক্ষিত বস্তিবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন সাম্যবাদ ও বামপন্থী ভাবনা। শৈলীর বিচারে তা অসাধারণত্ব লাভ করেছে। এই সময় সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীবৈষম্য, শাসন-শোষণ, অত্যাচার থাকা সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষেরা একসাথে সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে শুরু করল। সাম্যবাদ সেই শ্রমজীবী শোষিত মানুষদের মধ্যে একসাথে লড়াই করার প্রেরণা দিল।

'কিমলিস' গল্পের বেচনের মধ্যে সমরেশ বসু শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ লড়াইকে শিল্পের রূপ দিয়েছেন। সমরেশ বসুর প্রথম জীবন শিল্পাঞ্চলে কেটেছিল বলেই তিনি কারখানা ও শ্রমিকদের অনেক কাছ থেকে দেখে দেখেছেন। তাই তাঁর বহু ছোটগল্পে শ্রমিকদের জীবনের বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। তিনি এমনভাবে বস্তিবাসীদের রোজনামচা ফুটিয়ে তুলেছেন যা অত্যাচারিত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষগুলির বাস্তব জীবনকে তুলে ধরে। গল্পের নায়ক বেচন তার হাত ধরে রাশিয়া থেকে শোষক-শোষিতদের তত্ত্ব আসে বস্তির মানুষদের কাছে। বিদেশ থেকে আনা এই তত্ত্ব বস্তিবাসী এদেশীয় মানুষের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে যায়। বিদেশী পোশাক-আশাকে, চলাফেরায় অভ্যস্ত বেচনকে বস্তিবাসী অবাক চোখে দেখে। বেচনের সম্পর্কের সূত্র ধরে গল্পে এসেছে বাবা বনোয়ারি, মা রামদেই এবং স্ত্রী ঝুনিয়া। সম্পূর্ণ গল্পের কাহিনি বেচনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। বেচন কারখানার মালিকের ষড়যন্ত্রে দেড় বছরের বেশী সময় কলকাতায় হাজত বাস করে। সেখান থেকে কমিউনিজমের শিক্ষা নিয়ে ফিরে আসে বস্তিতে। জেলে মার্কস-লেলিনের বই পড়ে মজদুরদের অধিকারের কথা জানতে পারে সে। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে সে প্রথম প্রতিবাদ করে বাড়িওয়ালা কালিকা প্রসাদের সঙ্গে।

জেল ফেরৎ বেচন তার বন্ধুর কাছে কারখানার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারে। শ্রমিকদের ছাঁটাই, চার্জসীট, ওয়ার্নিং ইত্যাদির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগঠিত করে এবং প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে শ্রমিকের মধ্যে শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণী ভাগ সম্পর্কে সচেতনতা জাগিয়ে তেলে। বেচন জেলে বন্দি থাকাকালীন শিক্ষিত কমিউনিস্ট বাবুর কাছ থেকে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথাও যেমন শিখেছে তেমনি লেখাপড়াও শিখেছে। বেচনের

ট্রাঙ্কে যে তিনখানা বই রয়েছে সেগুলি হল- কার্লমাকর্সের 'কমিউনিজম', 'লেনিনের মাকর্সবাদী শিক্ষা' ও তৃতীয়টি হল রামনরেশ গুপ্ত রচিত 'ভুখা মজদুর'। বেচন গল্পে এমন একটি চরিত্র যে তার স্ত্রী ঝুনিয়াকে নিজের জীবনের সংকল্পের কথা বলে তাকে তার কর্মসঙ্গিনী করে নিতে চায়। একইভাবে কারখানার শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ কমানোয়, রেশনের খারাপ মানের ও বেশী দাম নিয়ে অসন্তুষ্টির সাথে যোগ হয়েছিল ম্যানেজারের কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া, হরতাল, ম্যানেজারকে ঘেরাও ইত্যাদি আন্দোলনে নিজেকে সামনে নিয়ে আসে। ফলাফল শ্রমিকদের দাবী কর্তৃপক্ষের মেনে নেওয়া। কর্মীরা আবার কাজে যোগ দেয়। সেই সময় মূল কর্মকান্ডের নেতা বেচনকে একা ডেকে পাঠায় ম্যানেজার বাবু। সেখানে উপস্থিত দারোগাবাবু বেচনকে চালান করে দেন কোলকাতার জেলখানায়। বেচন হয়ে যায় জেলবন্দী শ্রমিক। জেলখানার পুলিশি অত্যাচারের জবাবে বেচনের নির্ভীকতা প্রকাশ করে, আসল 'কিমলিস' হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত। আহত বেচনের জ্ঞান ফিরে এলে তার বাবা বলে ওঠে-

"হামকো তুমহারা সাথ জোড় লেও। উসকো কেয়া বোলতা, হাঁমতো কিমলিস কে বাপ বন গয়া!' আরে রাম রাম।" ('কিমলিস', সমরেশ বসু)

এ যেন সন্তানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার আদর্শকে গ্রহণ করা। এই ঐতিহাসিক সত্যকে সমরেশ বসু বাংলাদেশের বস্তিবাসীদের জীবনের সত্যতে পরিণত করেছিলেন। সাধারণ এক বস্তিবাসী তরুণের সাম্যবাদী চেতনা সত্ত্বার জাগরণ যেমন লেখক গল্পটিতে তুলে ধরেছেন তেমনি শ্রমজীবী মানুষের সামগ্রিক জাগরণকেও এক অন্যভাষা দিয়েছেন। 'কিমলিস' শব্দটি কমিউনিস্ট শব্দেরই অপভ্রংশ। অশিক্ষিত শ্রমিকদের মুখে এই কমিউনিস্ট শব্দটাই 'কিমলিস' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই গল্পটিই বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণা হয়ে ওঠে।

সমরেশ বসু তাঁর রচনাতে দেখিয়েছিলেন, কমিউনিজম শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাই নয় তা শ্রমিকের জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিবাদী চেতনার নামও। শাসকের সন্দেহ হলে কাউকে ধরে তার মুখ থেকে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে চলত অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন। 'স্বীকারোক্তি' এই রকমই একটি গল্প। গল্পটির শুরু আকস্মিকভাবে। 'অনল' কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। কিন্তু পার্টির বিশেষ কিছু কিছু কাজে সে আপত্তি জানায়। বিশেষ করে পার্টির অ্যাকশন কমিটির আচরণের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ প্রকাশ করে। অ্যাকশন কমিটি ধ্রুবকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করেছে। ধ্রুবও কয়েকটি ব্যাপারে পার্টির কাজকর্মের পদ্ধতির কিছুটা সমালোচনা করেছিল। পার্টির কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সমালোচনা সহ্য করে না। পুলিশ ধ্রুবকে খুঁজে ফিরছে কারণ ধ্রুব আন্ডার গ্রাউন্ড কর্মী। এই অবস্থায় ধ্রুবকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে সে যেন আন্ডার গ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে পড়ে। এর পেছনে কারণ ছিল যদি সে আন্ডার গ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে পড়ে তাহলে পুলিশ তাকে ধরতে পারবে এবং নানা অত্যাচার নিপীড়নে জর্জরিত করবে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য।

'বিবেক' গল্পের নায়ক বিভূতি বাংলার মাঝারি 'কুলাক' বংশের সন্তান। বিভূতি ছাত্রাবস্থা থেকেই কমিউনিস্ট। বিভূতির গ্রামের বাড়িতে ভগবান বা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। রাজনৈতিক জীবন বিভূতি শুরু করেছিল কমিউনিস্ট হিসেবে। বিভূতির মুখে তখন দুটো স্লোগান— জনগণতন্ত্র এবং জাতীয় গণতন্ত্র। তারপরে নির্বাচন ও প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠন। বিভূতির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়ায় গ্রাম, জেলা-শহর, আর কলকাতা, কিন্তু বিভূতির মনের মধ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের পতন নতুন করে আবার দ্বিধা ও সংশয় নিয়ে আসে। হতাশাগ্রস্ত বিভূতি ঝুঁকে পড়ে নকশাল আন্দোলনের প্রতি। নকশাল আন্দোলনের ভুল রাজনীতির শিকার হয় —

"অতি ব্যবহৃত, ক্ষয়প্রাপ্ত ধারালো কাস্তের মতো।" ('বিবেক',সমরেশ বসু)

একসময়ের বিপ্লবী শ্রমিক নেতা বুর্জোয়ায় পরিণত হয়ে কীভাবে ভোল পাল্টায় তারই গল্প হল 'পাতিহাঁস'। সমরেশ বসু 'পাতিহাঁস' গল্পটিতে নিরাপরাধ গোপালকে মারার অপরাধ বোধ রয়েছে বিভূতির মধ্যে। বিবেক যেন উঁকি মারে বিভূতির মনে। বিবেকের তাড়নায় গোপালের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চায় বিভূতি। শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধপল্লীতে দেখা মেলে গোপালের স্ত্রীর অর্থাৎ কুসুমের। বাচ্চা দুটিকে বাঁচানোর জন্য অন্য কোন রাস্তা যে কুসুমের সামনে খোলা ছিল না সেটা বিভূতি বুঝতে পারে। বিভূতির মনে পড়ে যায় সে কীভাবে গোপালকে হত্যা করেছিল সেই দৃশ্যটির কথা। গোপালের প্রসঙ্গে বিভূতির চোখের সামনে ভেসে ওঠে—

"গলা কাটা ফেরিওয়ালাটা শাল গাছের গোড়ায় ছিটকে পড়ল। রক্তাক্ত ছুরিটা ওর নিজের হাতে। মাথার বেতের গোল চুপড়িটা আর কাঁধে ঝোলানো সেপ্টিপিন, চুলের ফিতের ব্রাকেটটাও দুপাশে পড়েছিল। সিঁদুর, আলতা, সস্তা সাবান, স্নো, পাউডার, গোল চৌকো ছোটো ছোটো আয়না, লক্ষ্মীর পাঁচালী, বাঁধানো দেব-দেবীর ছবি, এমনকি খানকয়েক সিনেমার চটি ম্যাগাজিনও ...। জ্যোতি বলছিল, আর সেই ছবিটা বিভূতির চোখের সামনে ভাসছিল, একটা খতমের ছবি।" ('পাতিহাঁস', সমরেশ বসু)

লক্ষ্য করবার বিষয় লক্ষ্মীর পাঁচালী, দেব-দেবীর ছবি এসবই আমাদের সনাতন বিশ্বাসের প্রতীক। বিবেকের দংশনে গোপালকে যে ভুল করে মারা হয়েছিল তা স্বীকার করে বিভূতি। নিষিদ্ধপল্লীতে গোপালের বিধবা স্ত্রী কুসুমের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে বিভূতি কলকাতার রাজ্য কমিটির সভায় যোগ দিয়েছিল। সেই সভায় সমস্ত বামপন্থী পার্টিগুলোর মধ্যে ঐক্য সাধন, গ্রামে ও শহরে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বিভূতির মনের মধ্যে দাগ কাটে না। বিভূতি আস্থা হারিয়েছে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রতি তা বোঝা যায়। এখন বিভূতি অন্য এক সত্যের সন্ধানের পথিক। বিভূতির যেমন রাজনৈতিক সত্তা বিচলিত তেমনি লেখক সমরেশ বসুর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হয়েছিল। এই সময়ের পর থেকে লেখক ক্রমশ বামপন্থা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন।

সমরেশ বসুর জীবনে 'ফটিচার' এমন একটি গল্প যেখানে শ্রমিক জাগরণের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। রাজনীতি লেখকের জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল যে তাকে বাদ দেওয়ার কথা তিনি কখনও ভাবতে পারেননি। উপরন্তু রাজনীতির উর্দ্ধে মানুষের ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য। সমরেশ বসু পঞ্চাশের দশকে লিখেছেন 'ফটিচার' গল্পটি। এই গল্পে তিনি সরাসরি বামপন্থী আদর্শের ভাবনাকে দেখিয়েছেন শ্রমিক জাগরণের মধ্যে দিয়ে। রতন কয়েকটি রিক্সার মালিক। তার ভাড়াটে রিক্সা চালকদের কাছে বক্তৃতা করে একদিন মজদুররাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। মালিকদের বিরুদ্ধে কীভাবে একসাথে শ্রমিকরা জেগে উঠবে সেকথা আবেগের গলায় শোনায়, অথচ নিজে প্রত্যেক রাতে রিক্সা চালকদের কাছ থেকে খুব কড়াভাবে নিজের হিসাব বুঝে নেয়। দরিদ্র মানুষগুলোর কোনও অজুহাতই সে শোনে না। শেষ অবধি একদিন রিক্সা চালকের দল রতনেরই দেখানো পথে গিয়ে রতনের বিরুদ্ধেই স্ট্রাইক করে বসে। অবশেষে রতনকে রিক্সার ভাড়া মুকুব করতে হয়। কীভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে হয় তার বাস্তবোচিত উধাহরণ হল 'ফটিচার' গল্প।

'স্বধর্ম' হল সত্তর আশির দশকে রচিত লেখকের পরিণত মনের আরেকটি প্রতিবাদী গল্প। এখানে পার্টি বনাম ব্যক্তি নয়, পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্বের কথা লেখক বলেছেন। এক সময়ের মেধাবী, তার্কিক, একনিষ্ঠ পার্টিকর্মী লোকনাথ নীচুতলার মানুষদের তথা শ্রমিকদের জন্য শুধু বুলি আউড়ে নয়, বাস্তবে কিছু করে দেখাতে চেয়েছিল। এই কাজ করতে গিয়ে স্ত্রী বিম্বা এবং অন্যান্য পার্টি বন্ধুদের কাছে বার বার তিরস্কৃত হয়েছে। তার মনে হয়েছে আত্মায় বিশ্বাস, শ্রাদ্ধ, পিন্ডদান এবং অন্যান্য আচারের উপর বিশ্বাস নিজের স্ববিরোধিতাকে প্রমাণ করে। তাই পার্টিতে তার থাকা উচিত না। স্ত্রী এবং দল ত্যাগের পর তার সমস্ত কাজই পার্টির বন্ধুদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়। লোকনাথ গয়ায় যায় মায়ের পিন্ড দিতে, মাথা মোড়ায় আবার ডোমদের শবযাত্রায় অংশও নেয়। রাস্তা জুড়ে লম্বা রাজনৈতিক মিছিলে রুগীর গাড়ি আটকে গেলে লোকনাথ প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খায়। গরিব দুঃখী তার কাছে এসে বিপদে সাহায্য চায় বলে পাড়ার মাথারা তাকে অপছন্দ করে। কিন্তু দিনের আলোয় একটি ১৬ বছরের মেয়ে যখন ধর্ষিত হয় তখন কেউ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না। লোকনাথ মেয়েটিকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়। এই গল্পে লেখক সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ধরার চেষ্টা করেছেন।

'শহীদের মা' লেখকের জীবনের এমন একটি গল্প যেখানে বামপন্থী চেতনা সেই ভাবে আসেনি; কিন্তু গল্পটিতে লেখক বিমলা ও হরপ্রসাদের পরিবারটিকে সম্পূর্ণভাবে সমকালীন রাজনীতিতে বিশ্বাসী পরিবার হিসাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পের কাহিনি প্রসঙ্গে সতীনাথ ভাদুরীর 'জাগরী' উপন্যাসে বিলু-নিলুর পরিবারকে যেমন রাষ্ট্রীয় পরিবার বলা হয় তেমনি হরপ্রসাদের পরিবারের গুরুত্ব। এই গল্প প্রসঙ্গে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শোকমিছিল',

সৌরি ঘটকের 'কমিউনিস্ট পরিবার' বা সমরেশ বসুর 'তিন পুরুষ' উপন্যাসের রাজনৈতিক পরিবারের কথাও বলা যেতে পারে। 'শহীদের মা' গল্পকে কোনওভাবেই সমসাময়িক রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে আলাদা করা যায় না বলেই এই আলোচনাতে গল্পটি স্থান পেয়েছে। সমরেশ বসুর বেশিরভাগ গল্পের মূল আধার শ্রমিক জীবন সংলগ্ন মানুষদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা। লেখক বহুদিন যাবত একটি বিশেষ শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এর ফলে শ্রমিকদের খুব কাছে থেকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এই শ্রমিক অসন্তোষ-এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় সমরেশ বসুর 'রং' গল্পটিতে। বনোয়ারি এই গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র। তার শরীরের লাল রক্ত কীভাবে উচ্চপদস্থ অফিসারদের সামনে পার্টির 'রং' হয়ে যায় তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে এখানে।। শ্রমিকদের নিদারুণ বঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনি ফুটে উঠেছে 'রং' গল্পটিতে। এই ধারার আর একটি গল্প 'পাড়ি'। গল্পটিতে লেখকের রাজনৈতিক চেতনা, শ্রমিক আন্দোলন, মার্কসীয় চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। একই সঙ্গে সর্বহারা বস্তিবাসীদের কথা বলতে গিয়ে সাম্যবাদী তত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন গল্পটিতে।

সচেতন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং কঠিন সংগ্রামী জীবন- যাপনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সমৃদ্ধ তীক্ষ্ণ জীবনবোধের সংগ্রামী ছবির এক পরিপূর্ণ রূপকে তিনি ধরতে চেয়েছেন তার কিছু গল্পে । সেই গল্পগুলিতেই উঠে এসেছে তাঁর জীবনের কঠিন সত্য। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের অভাব অভিযোগ, অসহায়তা, খিদের জ্বালা একই সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর শোষণ নিপীড়নের বিষয় বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। মার্কসীয় চিন্তা, চেতনা ও দর্শনে বিশ্বাসী সমরেশ বসু শ্রমজীবী মানুষের কথা বলতেই মিশে গেছেন তাদের জীবন চর্যার সঙ্গে। অনুভব করেছেন তাদের দুঃখ, কষ্ট, প্রতিকূল জীবনের সংগ্রামকে। তাই তাঁর গল্পে বার বার উঠে এসেছে সে জীবনের প্রতিবাদী ও সাম্যবাদী ভাবনা। সেই সাম্যবাদী বা বামপন্থী সত্ত্বার প্রকাশ পায় 'প্রতিরোধ' গল্পের সুবল, মনাই, 'কিমলিস' গল্পের বেচন অথবা 'স্বধর্ম' গল্পের লোকনাথ চরিত্রে। তাইতো সমরেশ বসু সহজেই নতুন নেতাদের কথা বলে দিলেন অকপট ভঙ্গীতে—

" আগের দিনের কথা ভুলে যাও। সশস্ত্র বিপ্লব, পুলিশের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াই আর নিজের জান কবুল করার জন্য সবাই প্রস্তুত হও।"[২]

**তথ্যসূত্র :**

১। 'গল্পচর্চা'। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পাদনা)। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা।দ্বিতীয় সংস্করণ।২০১৪। পৃষ্ঠা- ১০১৭।

২। "প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি"-সমরেশ বসু। 'নিজেকে জানার জন্যে' (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র) (সম্পাদনা) ঝুমা রায়চৌধুরী। পূর্বাশা। কলকাতা। জানুয়ারি ২০১৩।পৃষ্ঠা- ১২৯।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :**


১। 'গল্পচর্চা'। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পাদনা)। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা।দ্বিতীয় সংস্করণ।২০১৪।

২। "প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি"-সমরেশ বসু। 'নিজেকে জানার জন্যে' (প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমগ্র) (সম্পাদনা)।ঝুমা রায়চৌধুরী। পূর্বাশা। কলকাতা। জানুয়ারি ২০১৩।

৩। "বাংলা উপন্যাসের কালান্তর"। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং।কলকাতা। পঞ্চম সংস্করণ। নভেম্বর, ২০০৩।

৪। "কালের প্রতিমা"। অরুণ মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং।কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ। নভেম্বর, ২০০৪।

৫। "সমরেশ বসু রচনাবলী"(প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড)।সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) আনন্দ পাবলিশিং। কলকাতা। ১৯৯৭।

৬। "কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ণ" ( ১,২ খন্ড)। ড. ঝুমা রায়চৌধুরী (সম্পাদিত )। পূর্বাশা। কলকাতা। ২০০৭।

৭। "শব্দ 'সাহিত্য পত্রিকা। সাধনা বড়ুয়া (সম্পাদিত), সমরেশ বসু বিশেষ সংখ্যা। ২০০৮।

৮। "সমরেশ বসু গল্পসমগ্র-১"। ড. নিতাই বসু (সম্পাদিত)। মৌসুমী প্রকাশনী। কলকাতা। ১৯৯০।

৯। "সমরেশ বসু গল্পসমগ্র-২"। ড. নিতাই বসু (সম্পাদিত)। মৌসুমী প্রকাশনী। কলকাতা। ১৪০১।

১০। "সমরেশ বসু রচনাবলী" (১,২)। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)।আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা। ১৯৯৭।

# সমরেশ বসুর গল্প: "আঘাত বিদীর্ণ সিক্ত শত ক্ষত মুখ"

**উজ্জ্বল প্রামাণিক**

বিশ শতকের চল্লিশের দশকটা ছিল ক্রান্তিকালীন দশক। জাপানি বোমার আতঙ্ক আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণডঙ্কা অন্ধকারকে করে তুলেছিল গাঢ় থেকে গাঢ়তর। সেই সঙ্গে মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যায় ভারতবাসীর জীবন হয়ে উঠেছিল বিষময়। এমনই এক সংকট মুহূর্তে ক্ষীণ আলোর প্রত্যাশা নিয়ে শৈশব থেকে কৈশোর পার করে যুবক হচ্ছিল একদল। সাদা পাতার উপর লাল অক্ষরে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছিল যাঁরা সমরেশ বসু তাঁদের মধ্যে একজন। ১৯৪৪-৪৫ সাল, তিনি নাম লেখালেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। সেই সঙ্গে পেয়ে গেলেন মার্কসীয় তত্ত্ববিশ্বে প্রবেশের চাবিকাঠি। জ্ঞান অন্বেষণের সুযোগ। 'উদয়ণ' লাইব্রেরির সুবাদে মানিক-বিভূতি-তারাশঙ্করের পাশে পেয়ে গেলেন ম্যাকসিম গোর্কি-দস্তোভস্কি-এহরেনবুর্গর লেখা। তখন কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করত রাশিয়া। যে কারণে তাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সম্পর্ক মধুর হয়নি। ১৯৪৮ সাল, যোশির জায়গায় সাধারণ সম্পাদক হলেন বি. টি রণদিভে। তাঁদের চরমপন্থী নীতির বিরুদ্ধে শুরু হল উগ্র আন্দোলন। আওয়াজ উঠল, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হলে দলে দলে পার্টি কর্মীরা জেলে গেলেন। সমরেশও গ্রেপ্তার হলেন এসময়। জেলে থাককালীন তাঁর বোধোদয় হল। বুঝতে পারলেন রাজনীতি আর সাহিত্যসৃজন দুটি আলাদা জিনিস। রাজনীতি দ্বারা সাহিত্য প্রভাবিত হলেও তা কখনই নিয়ন্ত্রক নয়। সমাজ, দেশের নিপীড়িত মানুষের সুখ-দুঃখ, বেদনা, বেঁচে থাকার প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামই সাহিত্যের মূল নীতি হয়ে ওঠা উচিত। তাঁর কথায়, "সাহিত্যের যা কিছু দায়, সে তো জীবনের কাছে। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়ো। এ সত্যের জন্য সাহিত্যকে গভীর অনুশীলন করতে হয় না, তা সততই অতি জীবন্ত।"

রাজনৈতিক ফতোয়া জারি নয়, সাহিত্যসৃজনের জন্য প্রয়োজন লেখকের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পদৃষ্টির। শিল্প সাহিত্যের প্রতি পার্টির হস্তক্ষেপের ব্যাপারে তিনি বারবার বিরোধী অবস্থানে ছিলেন। চোখের সামনে দেখেছেন রাজনৈতিক গুরু সত্যপ্রসন্নকে দুর্ঘটনার দোহাই দিয়ে মেরে ফেলতে। নিজেও ভিন্নভাবে সেই চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। তবু পার্টির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অবিরত। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পার্টির অনেক মহানুভব ব্যক্তিত্বের কথা কখনও ভুলতে পারেননি তিনি। নানান কারণে তাঁর সঙ্গে পার্টির দূরত্বটা বেড়েছে। ছন্নছাড়া এই জীবনে অর্থকষ্টও কম পাননি তিনি। স্ত্রী গৌরী দেবীকে চার সন্তানকে মানুষ করতে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় কিছু সাহায্য করেছিলেন তাঁদের। তবু, এতরকম দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও সমরেশ কিন্তু লেখা থামাননি। গল্প লেখা শুরু একেবারেই গোড়া থেকেই। ১৯৪৫-৪৬ সালে হাতের লেখা পত্রিকা 'উদয়ণ' এর জন্য সাম্প্রদায়িকতা

বিরোধী গল্প লিখেছিলেন 'আদাব'। দেশ তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত। কংগ্রেস ও মুসলিমলিগের বিরুদ্ধে লেখা এ গল্প সেদিন ছেপেছিল বামপন্থী সাহিত্য পত্রিকা 'পরিচয়'। তিনি এই গল্পের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যাঁদের জন্য এই জাতিবিদ্বেষ, ধর্মসংঘাত তাঁদের প্রতি রইল জেহাদ ঘোষনা। আবার কমিউনিস্ট পার্টি যখন সর্বহারাদের জন্য কথা বলে তখন তিনি দীক্ষিত ক্যাডার, একইসঙ্গে পার্টি আদর্শচ্যুত হলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনো স্ববিরোধের অবস্থানে দাঁড়াননি।

রবীন্দ্রনাথের পরেও তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতিভূষণ বাংলা ছোটগল্পকে অনেখানি এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁদের হাত ধরেই জগদীশ গুপ্ত, সুবোধ ঘোষ ছোটগল্পে নিজস্ব মাত্রা যোগ করলেন। তাঁদেরই উত্তরসূরী এলেন সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ একঝাঁক তরুণ। উপন্যাসের মতোই ছোটগল্প রচনায় সমরেশ অসাধারণ জীবনশিল্পী। প্রায় দু'শ-র বেশি ছোটগল্পের অধিকাংশ গল্পেই উচ্চারিত হয়েছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আর্তনাদ। একজন রাজনৈতিক সচেতন লেখক হয়েও তাঁর কাছে সংঘসত্য নয় জীবনসত্য হয়ে উঠেছিল চলতি পথের দিশারী। জীবনকে আরও বেশি জানার জন্য, বোঝার জন্য তাঁর অক্ষরসাধনা। কখনো শ্রমিক হয়ে আবার কখনো কাঁধে ঝোলা নিয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন চব্বিশপরগণার চটকলে বা জল-মাটি-কাদা বস্তি গঙ্গার পাড়ে। ধোঁয়া, কুয়াশার ধূসরতার মতো অস্বচ্ছ, অপরিচ্ছন্নতার ভেতর থকে সংগ্রহ করেছেন জীবনের গভীর প্রত্যয়।

'অকাল বৃষ্টি' পরিচিত সমাজজীবনের বাইরে দুই শ্মশানকর্মী সিধু ডোম আর মৃত্যু রেজিস্টার ভূতেশ হালদারের গল্প। ভূতেশ যদি চিত্রগুপ্ত হয়, সিধু তাহলে যাক্ষাৎ যম। বিচিত্র টানাপোড়েনে আর মড়া পোড়ানোর ব্যস্ততায় তাদের শ্মশানজীবন কেটে যাচ্ছিল একরকম। এমন সময় 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে উপস্থিত হয় একটা মেয়ে মানুষ। তাড়ি আর গাঁজার ঘাটতি জীবন অন্য আরেকটা একটা জীব! সমস্যা একটু হল বটে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মেয়েটি তাদের একজন কর্মী হয়ে উঠে। সিধু আর ভূতেশের অনুপস্থিতে সেই শ্মশানকে আগলে রাখে। মেয়েটিকে দেখে ভূতেশের গায়ে জ্বালা ধরলেও মনে পড়ে তার অপ্সরীর মতো বউ আর কন্দর্পের মতো ছেলের কথা। তাদের এত অবহেলা দেখে মেয়েটিও একদিন অভিমান করে বলে, "শ্মশানে মশানে থেকে তোমাদের খালি এক কথা। পুড়তেই শিখেছ খালি। আমাকে পুড়াবার জন্যই বুঝি হাঁ করে আছো তোমরা। চিতা ধুয়ে তবে গঙ্গা জলের ছিটা দাও কেন?"[২]

আস্তে আস্তে ভালোবাসা জমতে শুরু করল যখন, তখনই মেয়েটি ওলাওঠায় মারা গেল। সিধু আর ভূতেশের মতো আকাশের মুখ ভার। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানি। সিধু বিছিয়ে দিয়েছে কাঠের শয্যা। এই প্রথম তাদের মন চাইছে না চিতা জ্বালতে। ভূতেশ তার খাতায় নাম লিখল 'সুচেতনা', 'সু মানে সুন্দর আর চেতনা মানে চোখ যার।"[৩] মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মেয়েটি নাড়িয়ে দিয়ে গেল নিষ্ঠুর শ্মশানবাসীদের হৃদয়।

"আজ আর মাঝখানে তাদের কেউ নেই। কেউ নেই অন্ধকারে বঙ্কিম চোখে আলো ফুটিয়ে, শরীরের রেখায় প্রাণ ভোলানো রূপের লহর তুলে গুণগুণিয়ে ওঠবার, 'হায় আমার মনের ছায়া তোমার চ'কেতে।"[৪]

পাঠকের মনে হতেই পারে গল্পের শেষটা কেমন যেন! এটা একটা দারুণ প্রেমের গল্পও হতে পারত! কেন হল না? কারণ রূঢ় বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে ভূতেশ বলল "জানলি সিধে, শ্মশানটা শালা সত্যি শ্মশান হয়ে গেছে।"[৫] এই কঠিন সত্যটা অকপটে বলার মধ্যে দিয়েই গল্পের ইতি টানা হয়েছে।

'এসমালগার' চাল পাচারে দক্ষ স্মাগলার তেরো বছরের গোরা চাঁদের গল্প। একদিন স্মাগলিং করতে গিয়ে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ তাকে নগ্ন করে নির্মমভাবে মারার আগে শেষ বারের মতো জিজ্ঞাসা করে 'আর কোন দিনও করবি?' গোরার মুখে কোন কথা বের হয় না কারণ তার চোখে ভাসছে "ঘরে ঘুমন্ত পুতুল, রুগ্ন একটা মানুষ, আর বাইরের অন্ধকারের বোবা মায়ের অপরিসীম প্রতীক্ষা।"[৬] চালের চোরা চালান করতে গিয়ে বহুবার তাকে মার খেতে হয়েছে। এমনকি তাকে একবার ট্রেন থেকেঐ ঝাঁপ দিতে হয়েছে। একমাস পরে যখন হাসপাতাল থেকে ফিরল তখন তার গায়ে মাথায় অনেকগুলো আঘাতের চিহ্ন। সংসারে সে একমাত্র রোজগেরে। বাবা থেকেও না থাকা। মা পাঁচ সন্তানের জন্ম দিয়েও আবারও গর্ভবতী। সুবলা এসমালগারিনী গোরার বান্ধবী। গোরা তাকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলে ডাকে। বিষ্ণুপ্রিয়াও তাকে প্রশ্রয় দেয়। এত বিচিত্রতার মধ্যো গোরা ভাবে, ঘরে আছে রুগ্ন বাবা আর গুটিকতক ভাই বোন। লেখকের কথায়- "ও এ যুগের হেড অফ দি ফ্যামেলি। একটা মস্ত পরিবারকে পালন করে।"[৭] গল্পটি শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে অবহেলিত, পীড়িত, লাঞ্ছিত কিশোর মানবতার গল্প। চাল চোরাচালানকারী ছেলেটির মানবিকতা দায়িত্ববোধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের থেকে অনেক বেশি। এই তীক্ষ্ম শ্লেষটি গল্পের দাবিকে আরও প্রকট করে তোলে।

সমরেশ বারবার প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে গিয়ে মানবিক অনুভতির গল্প বলেছেন। তাঁর কাছে চিরকালের বেদনা জাগিয়েছিল শিশু শ্রমিক। এই পৃথিবীটা সব শিশুর কাছে সুন্দর হোক এটা তিনি মনে প্রাণে চাইতেন। এখানে তিনি একেবারেই আপোষহীন। শিশু বা কিশোর বয়সীরা এই সমাজব্যবস্থার পোষিত, লাঞ্ছিত ও অস্মানিত হচ্ছে — এই নিয়েও তিনি কলম ধরেছেন। 'পশারিণী' তেমনি একটি গল্প। পুষ্পলতা নামে একটি ছোট্ট মেয়ের হকারজীবনের গল্প। পুরানো হকারা তাকে বসার জায়গা দেয় না। প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। ভেবে সে এসেছে তাদের পেটে লাঠি মারতে। এখানেও তাকে লড়াই করতে হয় হকারজীবনে টিকে থাকার জন্য। এমন সময় পুলিশ লাইসেন্স ছাড়া হকারি করার জন্য তাকে ধরে নিয়ে যায় অন্য হকারদের সঙ্গে। জেল থেকে ফিরে এসে পুষ্পা তাদের ভালোবাসা আদায় করে। এভাবেই শ্রমজীবী পুরুষদের পাশে একজন মহিলাও শ্রমজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়।

'লড়াই' মাছমারাদের কঠিন লড়াইয়ের কাহিনি। পাঙাস মাছ মারা একটি কঠিন কাজ। এই মাছ আকৃতিতে বিশাল, বিরাট তার শক্তি। জোয়ারের টানে তারা সমুদ্র থেকে এসে ঢোকে গোলপাতা- গেমো-ওড়াচাকা-কেওড়ার বনে। গাছ ভর্তি ফল। সেই ফল খেতে আসে পাঙাসের দল। মাছমারারা বিশেষ কায়দায় জালে জড়িয়ে ফেলে সে মাছকে। বদিও সেদিন বিশাল মুগুর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাঁঙাসের দলে। ভয়ঙ্কর লড়াই হয়েছিল পাঁঙাসে মানুষে। বদি ও নিতাইয়ের মতো মানুষগুলোর মতোই পাঙাসগুলোর পেটেও অসম্ভব খিদে। পৃথিবীতে সকল জীবের লড়াই আসলে খিদের জন্য। নিতাই মালো সাইমারার জঙ্গলে পেটের দায়ে পাঙাস মারতে গিয়ে মরেছে। মা মরা ছেলে বদিও বাপের মতো লড়তে শিখেছে। রক্তে তার লড়াইয়ের দীক্ষা। পেটের অসম্ভব ক্ষুধা ঘোচানোর জন্য পাঁঙাসের সঙ্গে লড়ে যায়। সে পাঙাস যেন তাদের নিয়তি। বাপের মতোই এই নিয়তির কাছে হার মানতে হয় বদিকে। পাঁঙাসের কাঁটা বিঁধে মারা যায়। তবুও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সে লড়ে গিয়েছিল,

"ও শেষবারের জন্য মুক্তির চেষ্টা করল। পারল না। আর সেই কথাগুলি ওর মনে পড়তে লাগল। আমরা দু-জনেই লড়ি। আমরা দু-জনেই মরি। আগে আর পরে, বুইলে বাবা।"[৮]

নিয়তির মার কেউ আটাকাতে পারে না। তবু মানুষকে লড়ে যেতে হয়। এক আশ্চর্য প্রতীকী গল্প হয়ে ওঠে।

বেঁচে থাকার ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে বিমূঢ় করে দেবার মতো গল্প 'পাড়ি'। অর্থনৈতিক সংকট মানুষকে জীবনের শেষপ্রান্তে টেনে আনে যেখানে প্রতিনিয়তই মৃত্যু কল্লোল শোনা যায়। গল্পে উপস্থিত হয়েছে ভিনদেশীয় ক্ষুধার্থ দুই নট দম্পতি। এক শুয়োর কারবারি তাদের গঙ্গা পাড়ে আবিষ্কার করে। মাত্র ঊনত্রিশ টাকার বিনিময়ে ঊনত্রিশটি শুয়োরকে গঙ্গা পার করে দেওয়ার কাজ পায় এই দম্পতি। আষাঢ়ের ভয়ঙ্কর গঙ্গা। জোয়ারের বেলা। নেই কোন নৌকা। যুবক যুবতি দুজনেই পশুগুলোকে গঙ্গা পার করে দেওয়ার জন্য নেমে পরে জলে। পার করার সময় সামনে বড় ঘূর্ণি, যেন মানুষ পশু সকলকেই গিলে খাবে। পুরুষটি ঘূর্ণির কাছে চলে যায় পশুগুলোকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটিও মরিয়া হয়ে ওঠে পুরুষটিকে বাঁচাতে। সেও চায় তার কাছে যেতে, কিন্তু পারে না। এত প্রতিকূলতা, জীবন-মৃত্যুর টানাপোড়েন সত্ত্বেও তারা অবলা প্রাণীগুলির নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল "ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে দুজনেই। অনেকক্ষণ ভুলে গেছে। পার হতে হবে শুয়োরগুলিকে নিয়ে, সেইটেই একমাত্র কথা, একমাত্র ভাবনা।"[৯]

আকাশে বজ্রবিদ্যুৎ, নদীতে ভয়ঙ্কর স্রোতের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে ওই নট দম্পতি জানোয়ারগুলিকে অনুকূল স্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছে। মেয়েটির চোখে জল, কারণ নদীর স্রোত তার লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকু কেড়ে নিয়েছে। পুরুষটি তাকে সান্ত্বনা দেয়, সোহাগ করে, "তারপরে দুজনে রক্তে রক্তে যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।"[১০] লড়াইয়ের শেষে তার প্রথমে পেটের ক্ষিদে তারপর শরীরের ক্ষিদে মেটায়। ভরা পেটে আলিঙ্গনে বাঁধা নটদম্পতি ঘুমায়। গল্পের শেষটা পড়ে মনে হবে হাজার প্রতিকূলতা দম্পতিকে বিচ্ছিন্ন করতে

পারেনি। কিন্তু সারকথা 'লড়াই' —পাড়ি দেবেই। বারবার পাড়ি দেবে। দু'জনে মিলেই পাড়ি দেবে।

'ষষ্ঠ ঋতু' গল্পটি একটি পতিতা নারীর কর্দমক্ত জীবন থেকে পবিত্রতায় উত্তরণ। সমাজ তাদের বিচ্ছিন্ন পল্লীতে আশ্রয় দিয়েছে, নিষিদ্ধ করেছে ভদ্র সমাজ থেকে। লেখক তাদেরকেই পরম যত্নে আশ্রয় দিয়েছেন গল্পে। গল্পটিতে পতিতাপল্লী মালীপাড়ার কৃষ্ণাভামিনী আর রিকশাওয়ালার জীবনের কথা উঠে এসেছে। আদি রসে ভরপুর এই নারী শুধু ছলাকলাতেই দক্ষ নয় কীর্তনগানের আধ্যাত্মমার্গের শিল্পী। নবদ্বীপের রসিকজনও তার পদাবলী কীর্তনে মোহিত হয়ে হরিবাসরে করতালি দেন। রিকশাওয়ালা গগন তার প্রশ্রয়টুকু পাওয়ার আশায় ঘর ছেড়েছে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাভামিনীর রূপ যৌবন কমতে থাকে। ভাটা পড়ে গানের গলায়। এখন আর বাবুদের ডাক আসে না। এখন তার একমাত্র সম্বল রাধা। যাকে সে গড়েপিঠে বড় করেছে। সেই রাধাও একদিন বাবু পেয়ে পালিয়ে গেল তাকে ছেড়ে। জীবনের পড়ন্তবেলায় কৃষ্ণভামিনী আজ বড্ড একা। তার আজ গগনকে কাছে পেলেও মন্দ হয় না! গগনেরও তাকে দরকার। রিকশাচালকের পোষাক ছেড়ে সে এসেছে পরিচ্ছন্ন হয়ে। বহু সাধনার পর মিলনের লগ্ন আসে। বাসরসজ্জা রচিত হয়। প্রেমিক পুরুষটি আগমনে মন প্রাণ উতলা হয়ে ওঠে। কৃষ্ণাভামিনী তাকে কাছে টেনে নিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু গগনের আজ সে ইচ্ছাটুকু বিলীন।

"কেষ্টভামিনী, ওইটার জন্য তোমার কাছে আসিনি। তোমার কাছে থেকে বাজাব এই চেয়েছি এতকাল ধরে।"[১১]

খোল নামায় গগন, বিস্মিত কৃষ্ণাভামিনী জলভরা চোখে হারমোনিয়ামে বসে। খোলে তাল ওঠে। "পঞ্চম ঋতু পেরিয়ে ষষ্ঠঋতুতে বাতাস লাগল।" এক পবিত্র প্রেমে মুগ্ধ হয় পাঠক চিত্ত।

'পাপপুণ্য' গল্পটিতে এক পিতার নিজের ব্যাভিচারের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। পিতা পুত্রীর ব্যাভিচারের ফল হিসাবে কন্যা আত্মহত্যা করে। পিতা কন্যার দেহ নিয়ে চলে শ্মশানে, দেখে যেন মনে হয় পাপের বোঝা বহন করছে সে। তারপর কন্যার চিতায় নিজে আত্মহনন করে। সমাজের দরিদ্র মানুষের মধ্যেও যে সংস্কারও মূল্যবোধ রয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই গল্পটি। গদাইয়ের বিবাহবিচ্ছিন্না মেয়ে বিন্দুকে বিয়ে করতে চায় কেতু। গল্পের শুরুতে দেখা যায় যে, সেই বিন্দু গলায় দড়ি দিয়েছে। মহা শ্মশানে গদাই আর কেতু শব নিয়ে চলেছে। অন্ধকার, শ্মশান, ছয় শকুন, গাছপালা, শৃগালের চিৎকার এবং ফুলে ওঠা শব সমস্ত যেন অনুভবের বিষয় হয়ে ওঠে। লেখকও কেতুর মতো এই আত্মহত্যার কারণ বুঝতে পারে না- 'কিছু বুঁইতে পারলাম না।" কিন্তু গদাই জানে। কারণ- 'পাপ চাপা থাকে না।' কেতু গদাইকে শ্বশুরের মতো দেখে বলে বাবা ডাকতে গেলে বারণ করে গদাই। কারণ গদাই নিজেকে বাবা বলার যোগ্য মনে করে না। অনেক রাতে মদ খেয়ে গদাই পচার কাছে গিয়েছিল। গদাই

জানত না সেখানে বিন্দু রয়েছে পচার বদলে। অন্ধকারের মধ্যে বাবা মেয়ে কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। সঙ্গমের পর গদাই যখন 'কালা মুখে' পচীর নাম ধরে ডাকে তখন বিন্দু বলে উঠে — 'অই গো, তুমি বাপ।' এরপরই বাবা আর মেয়ে নিজেদের ব্যাভিচারের প্রায়শ্চিত্ত করে। বিন্দু আত্মহত্যা করে আর গদাই শব টেনে চলে যেন পাপের বোঝা বহন করছে।

'সুচাঁদের বারোমাস্যা' আসলে সুচাঁদ নামে একটি চরিত্রের বারোমাস বেঁচে থাকার গল্প। সে বহুরূপী সঙ সেজে বিভিন্ন যাত্রা দলে অভিনয় করে। এক মেলা থেকে আরেক মেলায়। কখনো সাজে মা কালী, আবার কখনো পেটের মধ্যে কুকুর ডাকে। বাবু, মহাজনেরা তাকে স্নেহ করে ডাকেন "হারামজাদা"। সুচাঁদও হেসে জবাব দেয় 'আমি আপনেগো হারামজাদা'। এ যেন তার এক সম্মান পাওয়া। জীবিকার জন্য তাকে কখনো মুন্সিগঞ্জ কখনো নারানগঞ্জ, কখনো বজ্রহাট যেতে হয়। জীবিকার সন্ধানে মেঘনা নদীর স্রোতের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই সঙ্গী হিসাবে পায়, একটা শিয়াল যে ভেলায় ভেসে যাচ্ছে। এখানে মানুষ এবং পশুর অন্তরঙ্গ সহাবস্থান শুধু নয় দুজনের স্বাভাবিক জীবন ছন্দও যেন একসাথে এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত শিয়ালটির শোচনীয় মৃত্যু হয়। আর সুচাঁদ শেয়ালটাকে উদ্দেশ্য করে বলে — "হালায় সঙ, মর, তোর লেইগ্যা কেউ কান্দব না, কেউ না"[১২] এই একই কথা তার নিজের ক্ষেত্রেও খাটে — তবু তার চলা থামে না বারোমাস এভাবেই এগিয়ে চলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে ব্যক্তি সংকট প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়েছিল। পাঁচের দশকে সমরেশ দেখলেন ব্যক্তির বিপন্ন অভিজ্ঞান। কমিউনিস্ট পার্টি মতাদর্শ ও নেতৃত্বের মধ্যে বৈপরীত্য ভাব। এই বদলটা লেখক তুলে ধরেছেন ১৯৬২ সালে 'স্বীকারোক্তি' গল্পে। গল্পে বলা ছিল, "১৯৪৯ সালে বে-আইনি ঘোষিত এক রাজনৈতিক পার্টির একজন সদস্যের বন্দী অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত।"[১৩] গল্পের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তত্ত্বের সঙ্গে ব্যক্তির ক্ষমতা দখলের লড়াই প্রবল হয়ে উঠেছে। মিহির বড়ো নেতা বলে সামান্য মতান্তরে একজন সৎ পার্টিকর্মীকে ফাঁসাতে উদ্যত হয়। গল্পকথক কঠিন শাস্তির থেকে ধ্রুবকে রক্ষা করতে নিজের কাছে আশ্রয় দেয়। এ মিথ্যাচার কি অনৈতিক! আবার তিনি নিজ আদর্শে অবচল থেকে পুলিশের সামনে পার্টি নিয়ে একটিও কথা বলেননি। একজন মানুষ নিজের কাছে সৎ থাকতে বারবার ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। কোনটা শেষ সত্য আর কোনটা শ্রেষ্ঠ নীতি এই বিস্ময়বোধে লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শও বারবার ধর্মসংকটে পড়েছে, "সে ঘোষণা করেছিল সত্যের স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনো সম্ভব হয়নি বাল্যে পিতামাতার কাছে, যৌবনে স্ত্রী বা প্রেমিকার কাছে, কর্মে পার্টির কাছে এবং এখন পুলিশের কাছ।" ('নিজেকে জানার জন্য')[১৪]

এইরূপ ব্যক্তিসংকট দাঁড়িয়ে সমরেশ বসুর এক একটা গল্প অন্য মোড় নিয়েছে। তাঁর পাণ্ডুলিপি কোন কাটাকুটি থাকত না। আসলে তিনি আগে জীবনকে পড়ে মুখস্থ করে ফেলতেন। তারপর লিখতে বসতেন। আয়নার সমানে একেবারে ত্বরিত গতিতে চলত কথন-ছন্দ। স্রোতের টানে সে গদ্য এগিয়ে চলত। কোন প্যাঁচ নেই। গল্পের ব্যঞ্জনা খোঁজার জন্য পাঠককে দু'বার

পড়ার প্রয়োজন হয় না। একেবারেই সরল বয়ানের ভেতর সহজ জীবনকে ধরা থাকে। তাঁর ছোটগল্পের শিল্পায়নে কল্পনার সংযম যেমন থাকে তেমনি শেষ ইঙ্গিতটি সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনায় শিল্প হয়ে উঠে সর্বদা। বন্ধুবর সরোজ বন্দ্যোপাধায়ের তাঁর গল্পের শৈলি নিয়ে যথার্থ কথাটি বলেছেন, "নিছক স্টোরিপ্রধান গল্প নয়, যে গল্পের আপাত বর্ণবিরল ঝিনুকের দুই পার্টির মধ্যে লুকানো থাকে আশ্চর্য মুক্তা, জীবন নামক সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে লেখক তুলে আনেন"[১৫]

তথাকথিত গল্পবিহীন গল্পের মধ্যেও যে অন্তর্নাট্য থাকে তা পাঠককে শেষপর্যন্ত বৃহত্তর উপলব্ধির তটে পৌঁছায়। রিক্ত-শূন্য শত শত ক্ষত মুখগুলিকে তিনি এক অন্য টেকনিকে সংবেদনশীল সাহিত্যে ধারায় মিলিয়ে দেন। জীবনানন্দের সুরে বলতে চান,

"ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।"[১৭]

**তথ্যসূত্র ঃ**


১। দেশ পত্রিকা, ২২ শে নভেম্বর, ১৯৮৬ খ্রিঃ, পৃষ্ঠা- ১৮
২। সমরেশ বসু, 'অকাল বৃষ্টি', 'সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, কলকাত-১৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পৃষ্ঠা- ২৫
৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০
৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১
৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১
৬। সমরেশ বসু, 'এসমালগার', 'সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, কলকাত-১৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পৃষ্ঠা- ১৩৭
৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৮
৮। তদেব, 'লড়াই', পৃষ্ঠা- ৯০
৯। তদেব, 'পাড়ি', পৃষ্ঠা- ৫৩
১০। তদেব, 'পাড়ি', পৃষ্ঠা- ৬১
১১। তদেব, 'ষষ্ঠ ঋতু', পৃষ্ঠা- ১২০
১২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২১
১৩। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সমরেশ বসুর রচনাবলী ১, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৬৬৫
১৪। সমরেশ বসু, 'স্বীকারোক্তি', 'সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, কলকাত-১৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পৃষ্ঠা- ৬২
১৫। সত্যজিৎ চৌধুরী, সমরেশ বসু, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৪
১৬। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জীবনকে জানতে জানতে নিজেকে', 'সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, কলকাত-১৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পৃষ্ঠা- ১৬
১৭। জীবনানন্দ দাশ, 'হে হৃদয়', কবিতা সমগ্র, যূথিকা বুক স্টল, কলকাতা-৭৩, বইমেলা ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৭৮

# সমরেশ বসুর ছোটগল্প : বেদনার্ত জীবন অস্তিত্বের আড়ালে উত্তরণের গভীর আহ্বান

চন্দ্রিমা মৈত্র

কথাসাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় সমরেশ বসুর অবাধ যাতায়াত। ছোটগল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম পরিচিতি পান। সমরেশ বসু প্রথমে গল্পকার এবং তারপর তিনি ঔপন্যাসিক, প্রায় দু'শোর ওপর ছোটগল্প লিখেছেন, ছোটগল্প লেখার কৃতিত্ব ছিল হাতের মুঠোয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে অবলীলায় লিখে গেছেন অজস্র ছোটগল্প। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব তাই সমাজের প্রতিটি ঘটনাই জীবনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ঠিক সেরকম সমরেশ বসু যে সময় সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছেন বা তার পরবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা,নানান আন্দোলন এসব কিছুই তাঁর লেখায় প্রভাব বিস্তার করেছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি নিজেকে ভাঙছেন-গড়ছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় যখন সমাজের চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তখন ছোটগল্পেও উঠে আসছে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত মানুষগুলোর কথা। সমরেশ বসু সমাজের সেই অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকটে থাকা মানুষগুলোর প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার সংগ্রামকেই তাঁর গল্পের মৌলিক উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

বাইশ বছর বয়সে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত গল্প 'আদাব'(১৯৪৬)। কলকাতায় তখন দাঙ্গা হয়ে গেছে, মানুষের জীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। দাঙ্গা কলকাতায় হলেও সমস্ত গ্রামে-গঞ্জে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই ভয়-ঘৃণা-সন্দেহের বীজ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এই গল্প এক সুতাকলের হিন্দু মজুর এবং মুসলমান মাঝির, এক দাঙ্গার রাতে তাদের পরিচয়। একে অপরের প্রতি বিশ্বাস- অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, সন্দেহের মধ্যেই তারা তাদের মনের কথা জানিয়েছে। তারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও তারা কেউই চায় না এই দাঙ্গা হোক, এই দাঙ্গার প্রভাব পরিবারের ওপরেই পড়বে এও তারা জানে, কিন্তু তাদের হাতে কিচ্ছু নেই—"নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু'হাত দিয়ে হাত দিয়ে হাঁটু দু'টোকে জড়িয়ে ধরে।"[১] এই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার মধ্যেও মুসলিম মাঝিকে বিদায় জানাবার সময় হিন্দু সুতাকালের মজুর ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে তাকে সাদর সম্ভাষণে জানায় 'আদাব'। আবার রাতের নিস্তব্ধতাকে সরিয়ে যখন আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ শোনা যায় তখন সেই মুসলিম মাঝির জন্য অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে হিন্দু মজুরের বুক। এ গল্পে সমরেশ বসু সমকালের সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের সংকটটি অসাধারণ উপস্থাপন কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সমরেশ বসু তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময় যে সকল মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন গল্পে তাদের কথাই তুলে ধরেছেন। যেমন 'পকেটমার' গল্পে গৌরমোহন একজন অত্যন্ত

সৎ এবং ভক্তিমান পুরোহিত।এক সময় তিনি চটকলে কাজ করতেন এবং বর্তমানে তিনি পুজো করে সময় অতিবাহিত করেন। সংসারে তার অসুস্থ স্ত্রী, দুই বৌমা এবং এক নাতি। মেজ বৌমার গহনার ভারি শখ, বাপের বাড়ি থেকে সে আড়াই ভরির চুড়ি এনেছে। এখন সে তার নিজের শখে সেই চুড়ি ভেঙ্গে নতুন নকশার চুড়ি করাতে চায় তার নিজেরই জমানো টাকা দিয়ে এবং সে সেই দায়িত্ব দেয় গৌরমোহনবাবুকে। কিন্তু ধারদেনার সংসারে নিজের শখপূরণের আশা করাও যেন বিলাসিতা, গৌরমোহন বাবু সে চুড়ি বিক্রির টাকায় দেনা শোধ করেন এবং নিজের পকেট কেটে নিজেই বাড়িতে সকলের কাছে প্রমাণ করেন যে পকেট কেটে সে চুড়ি ছিনতাই হয়ে গেছে। মেজ বৌমার কাছে সে কথা বলে পার পাওয়া গেলেও এতোকালের অভাবের সংসারে যুঝতে থাকা অসুস্থ স্ত্রী বা বড় বৌমার ভর্ৎসনার দৃষ্টি থেকে গৌরমোহন নিস্তার পায় না। গৌরমোহন পরিবারের সকলকে নিজের প্রাণের থেকে বেশি ভালোবাসা সত্ত্বেও নিজের পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে এবং সমাজে বেঁচে থাকার তাগিদেই যে গহনা বিক্রি করে দেনা শোধ করেছেন তা আর বলে দিতে হয় না।

ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী সময়ে ছোটগল্পের জগতে এক সাহসী লেখক হলেন সমরেশ বসু। তাঁর লেখায় যেমন স্বাধীনতার উত্তাল সময়ের উল্লেখ পেয়েছি, তেমনি অবিকল্প রূপ পেয়েছি শ্রমিক আন্দোলনের। 'প্রতিরোধ' গল্পটি ১৯৪৩ সালে ঘটে যাওয়া তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা একটি গল্প। এই গল্পে দেখানো হয়েছে মন্বন্তরের একটি কদর্য চেহারা, যেখানে চোরা ব্যাপারী বা চালের আড়তদাররা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গরীব কৃষকদের শোষণ করেছে। সেই কৃষকরা বেঁচে থাকার তাগিদে এবং তাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য লড়াই করছে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে। এই সবকিছুর মধ্যেও সমরেশ বসু তুলে এনেছেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন, বন্ধুত্ব, ভালবাসা যা দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। একজন ভাগচাষীদের নেতা হওয়ার সুবাদে যখন মনাই বিভিন্ন সভাসমিতি নিয়ে ব্যস্ত তখন তার বন্ধ্যা স্ত্রী রাধার মনের খেয়াল সে রাখতে পারে না। আবার রাধা যে কখনো মা হতে পারবেনা সেই নারী মনের গোপন যন্ত্রণা দিনরাত তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সেকথা সে কাউকে জানাতে পারেনা। গল্পে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে সুবলের (মনাই-রাধার বন্ধু) কবিগান। সুবল তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে গান বাঁধে, রাধার রূপের বর্ণনা করতে গান বাঁধে, আবার শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুরও তার কবিগানের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। গল্পের শেষে পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে পুলিশের গুলিতেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যু হয় রাধা এবং মনাই জানতে পারে রাধা ছিল গর্ভবতী। যে বন্ধ্যাত্বের যন্ত্রণা রাধা দীর্ঘদিন বুকে বয়ে বেরিয়েছে,যে সন্তানের চেষ্টায় মনাই রাধাকে ঠাকুরের চরণ ধোওয়া জল খাইয়েছে সেই সন্তান রাধার গর্ভে এসেও পৃথিবীর

আলো দেখার সুযোগ পেল না। এ চরম বাস্তবতা ছিল তাদের জীবনের নিয়তি। লেখক গর্ভাবস্থায় রাধার মৃত্যু দেখিয়ে মনাইকে বাঁচিয়ে রেখেও মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছেন।

'জলসা' গল্পে আমরা দেখি এক কোম্পানির লাইনের ময়দানে জলসা হবে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার মানুষজন ভীষণরকম উত্তেজিত। তাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম, আলাপ -আলোচনা সবকিছু যেন সেই জলসাকে ঘিরেই। কোম্পানির লাইনে পরপর বাস করে মুসলমান, বিহারী, মাদ্রাজি, উড়িয়া নানান ধর্ম এবং জাতির মানুষ। তাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ,আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে কেন্দ্র করে এই গল্প। কিন্তু জলসাকে কেন্দ্র করে তাদের এই আনন্দ-উচ্ছাসই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হল ক্রোধ এবং তীব্র অসন্তোষ এবং আক্রোশে। মালিকশ্রেণি বিনা নোটিশে এগারোশো কর্মী ছাঁটাইয়ের নির্দেশ দিয়েছে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। সেই কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদের অপরাধে পুলিশে এসেছে, ধরে নিয়ে যাওয়া হবে প্রত্যেককে। রাতের অন্ধকারে একদিকে জলসা মঞ্চের আলো ঝলমলে রূপ আর একদিকে কালো কুচকুচে পুলিশের গাড়ি, সকলের মনে ভয়ের উদ্রেক ঘটিয়েছে। এক এক করে সিপাহীরা গাড়িতে তুলে নিয়েছে 'চন্দ্রিকা, হীরালাল,ফুলমহাম্মদ ,বৈজু, আপ্পারাও, হাফিজ.....'[২] সবাইকে। যে নারদ তার ষোলো বছরের উচ্ছল যৌবনা বিকলাঙ্গ মেয়ে পাতিয়াকে সমাজের কুনজর থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এতকাল সেও নিরুপায় হয়ে শয়তান ধনী মহাজন শাহুজীর কাছে দিয়ে আসে পাতিয়াকে দু'মুঠো খাবারের আশায়, 'উসকো দুবেলা পেট ভরকে খানা দেও, ব্যস ওর কুছ নেহি।'[৩] তীক্ষ্ণ শকুনের দৃষ্টি এড়িয়ে পাতিয়ার কোথাও যাওয়ার নেই একথা বুঝতেই "একটা জানোয়ারের বাচ্চার মত নারদের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে আঁউ আঁউ করে উঠল সে।"[৪] সেই হৃদয়বিদারক শব্দকে উপেক্ষা করে সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয় নারদ। সাধারণ মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের হতাশা-ব্যর্থতা এবং সেই সবকিছু ছাপিয়ে বেঁচে থাকার করুণ আর্তি যেন এই গল্পেও ধরা পড়েছে।

'শেষ মেলায়' গল্পে আমাদের প্রতিপদে অবাক হতে হয়। খুবই সাধারণ এই গল্পের বিষয়বস্তু, পলাশপুরের মেয়ে সুভদ্রা এবং মোহনের আলাপ এক মেলায়। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং তারা কল্পনা করে তাদের এক ছোট্ট সংসারের, "একখান ছোটখাটো ভিটে আর মা দুর্গের কোলে গণেশ ঠাকুরের পারা একটা ছ্যালের বড় সাধ আমার।"৫ কিন্তু মন্বন্তরের চিত্র এখানে স্পষ্ট, মন্বন্তর এক এক করে কেড়ে নিয়েছে মানুষের লজ্জা- রুচি -বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা- পরিবার বন্ধন সবকিছু। জীবনের সব বাধা কাটিয়ে সুভদ্রা এবং মোহনের একসঙ্গে জীবন গাঁথার স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর এবং দাঙ্গা।

মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যার (১৯৪২) প্রেক্ষাপটে লেখা সমরেশ বসুর গল্প "ও

আপনার কাছে গেচে"। এই এই গল্প এক চিঠির মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। লেখকের এক আত্মীয়া নির্মলার স্বামী নিখোঁজ, সেই স্বামীর খোঁজেই লেখককে চিঠি দিয়েছে নির্মলা। তার স্বামী ব্যবসার কাজে কলকাতায় এসে লেখকের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন তাই এই চিঠি। বিধ্বংসী বন্যায় গ্রামের বাড়ি ঘর সব ডুবে গেছে। নির্মলা তাদের এক জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাসুর তাদের বাড়িতে আছে। কিন্তু নির্মলা বুঝতে পেরেছে সেখানে নিরাপদ নয়। নির্মলা জানে না তার স্বামী বন্যার জলে ডুবে মারা গেছে। সে বন্যায় তার বাড়ি-ঘর-পরিবার সবকিছু হারিয়ে শুধুমাত্র নিজের সম্মান রক্ষার্থে লড়াই করে বেঁচে আছে তার স্বামীর পথ চেয়ে।

'প্রত্যাবর্তন' গল্পে দেখানো হয় একটি পরিবারকে যার মাথা হল ঠান্ডারাম এবং সে প্রতিদিন সন্ধেবেলা আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। স্ত্রী সুকুমারী, চার ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে ঠান্ডারামের সংসার। এই সংসারে একে অপরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, কিল, চড়, লাথি যেন নিত্যদিনের ঘটনা, কিন্তু তারপরেও একে অপরের প্রতি টান, মান-অভিমানের কথা বলা যেন নিত্যদিনের এই অশান্তিকে ভুলিয়ে দেয়। এই সংসারের যুবতী মেয়ে বাসন্তী সকলকে খাওয়ার যোগান দেয়, ঝামেলা লাগলে সে ঝামেলা থামায় আবার সকলের মনের কথাও শোনে। সে যেন ভাঙ্গা ঘরে মশালের আলো। বাসন্তী একসময় আষ্টেপৃষ্ঠে ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে মিস্ত্রী পবনের সঙ্গে। বাসন্তী জানে পবনের সঙ্গে তাকে পালিয়ে যেতে হবে এবং সে চলেও যায় কিন্তু সেই ঘরে খালি উনুন, চায়ের জলের হাঁড়ি, পিঁড়ি সবকিছু জন্য যেন তার মন হাহাকার করে ওঠে। পবনের ভালো রোজগার, একার সংসারের থেকেও তার প্রিয় হয়ে ওঠে সেই পরিবার, যেখানে প্রতিদিন মারামারি ধস্তাধস্তি হয়। সে ফিরে আসে, বেঁচে থাকতে চায় সেই মানুষগুলোর সঙ্গেই। যেতে পারে না পবনও, সেও থেকে যেতে চায় তার "বাসি'র সঙ্গেই," নাঃ বাসি যদি নেই তবে আর চন্দননগরে কি আছে!....."[৬]

'পাড়ি' গল্পটি তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে এক অন্যতম বিহার থেকে আগত নটজাতের এক স্বামী-স্ত্রী যারা দুদিন ধরে না খেতে পেয়ে গঙ্গার ধারে বেকার বসে আছে। কিছুক্ষণ পর সেখানে তারা কাজ পায় ঊনত্রিশটি শুয়োরকে গঙ্গা পার করার বিনিময়ে ঊনত্রিশ আনা মজুরি আর উপরি পাওনা গায়ে মাখার তেল, আর একটি শুয়োর হারিয়ে গেলে ছ'মাস হাজত বাস। এরপর শুরু হয় তাদের সংগ্রাম, গঙ্গার ফুলে ফেঁপে ওঠা জলের মধ্যে শুয়োরগুলোকে নিয়ে তাদের নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে তারা এগিয়ে চলে। তাদের একমাত্র ভাবনা শুয়োরগুলোকে পার করাতে হবে। খিদে তৃষ্ণা তারা ভুলেছে অনেকক্ষণই, অবশেষে প্রকৃতির ভয়ংকর সব প্রতিকূলতাকে জয় করে তারা পৌঁছায় এবং নিজেদের পারিশ্রমিক উপার্জন করে, যদিও তা খুব সামান্যই। এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করেও যে বেঁচে থাকার অদম্য চেষ্টা তা আমরা এই গল্পে খুব সহজেই দেখতে পাই।

এভাবে বিভিন্ন সময়ে সমরেশ বসু কখনো শ্রমজীবী মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াই, কখনো মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সততা- বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে সমাজে বেঁচে থাকার কথা বলেছেন। লেখক সাধারণ মানুষের কাছে ছিলেন বলেই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের কষ্ট এবং সেই কষ্টের মধ্যে থেকেও অস্তিত্বের জন্য লড়াই করা তার গল্পে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে,"সাহিত্যজীবনের সূচনা থেকে যে জীবনবোধ তথা সাহিত্যবোধে তিনি দীক্ষিত হয়েছেন, তা থেকে কখনো বিচ্যুতি ঘটে নি।"[৭] সমরেশ বসু যে সময়ে গল্পগুলি লিখছিলেন সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গল্পগুলি যেমন প্রাসঙ্গিক ,আমাদের মতো পাঠকদের কাছে আজও সমানভাবে শিক্ষনীয়।

**তথ্যসূত্র :**

১। সমরেশ বসু, 'সমরেশ বসু রচনাবলী ১', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা,২০২২, পৃ. ৫৩৫
২। তদেব। পৃ. ৪৬২
৩। তদেব। পৃ. ৪৬৩
৪। তদেব। পৃ. ৪৬৩
৫। তদেব। পৃ. ৪৫৪
৬। তদেব। পৃ. ৬১৬
৭। ড. শ্রাবণী পাল, 'বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক', পুস্তক বিপণি,কলকাতা,২০০৮, পৃ. ১৯

# সমরেশ বসু-র ছোটগল্প 'অকাল বৃষ্টি' : একটি উত্তরণের আখ্যান

সুব্রত দাস

বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখকই স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে, জীবনসত্যকে সাহিত্যের জমিতে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। সেখানে কখনও এতটুকু মেকী কৃত্রিম সত্য জুড়ে থাকুক তাঁরা তা চাননি। কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুকে আমরা এই গোত্রভুক্ত করতে পারি। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার জগত থেকে সরে এসে জীবনের রথকে চালিয়ে নেওয়ার তাগিদে গ্রহণ করেছিলেন অসংখ্য মানুষের মতো কলকারখানার শ্রমজীবী জীবন। এছাড়া জেনেছিলেন খুব নিবিড়ভাবে সমাজের তথাকথিত অর্থে অপাংক্তেয় গোত্রহীন নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবন ও যাপনকে।

এই রকম একটি যাপনের চালচিত্র আমরা খুঁজে পাই "অকাল বৃষ্টি" গল্পটিতে। গল্পটির পটভূমিতে থাকে চাকলা শিল্পাঞ্চল, চটকল শহর। গল্প শুরু হয় অগ্রহায়ণ মাস দিয়ে আর শেষ হয় চৈত্রের শেষ দিয়ে। মোটামুটি পাঁচ মাসের সময়কাল। এই চটকল শহরের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা। মিউনিসিপ্যালিটির সৌজন্যে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক শ্মশানও রয়েছে। যে-শ্মশানের চিমনির ধোঁয়াকে অনেকসময় কারখানার ধোঁয়া বলে ভ্রম হয়। তো এই শ্মশানের ডেথ-রেজিস্ট্রারের কাজ করে ভূতেশ হালদার। জাতিতে সে ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে ভূতেশের সহকর্মী হলো সিধু ডোম। চিতায় কাঠ সাজিয়ে নিখুঁতভাবে শবদেহ পোড়ানোর কাজটি সে করে। গল্পকার লিখেছেন : 'ভূতেশ যদি চিত্রগুপ্ত হয়, সিধু তাহলে সাক্ষাৎ যম।'

এই দু'টি চরিত্র হচ্ছে এই গল্পের আলম্বন বিভাব। ভূতেশের একটা সংগুপ্ত ক্ষোভ-অভিমান মানসিক যন্ত্রণা গল্পের কাহিনি জুড়ে জায়মান থেকেছে। ভূতেশের চেহারার বর্ণনায় গল্পকার লিখেছেন : 'একটা লম্বা ছিপছিপে পোড়া কাঠ।' ফুলশয্যার রাতে ভূতেশকে দেখে তাঁর 'অপ্সরী বউ' ভয় পেয়ে বলেছিল : 'মা গো, যেন পোড়া কাঠ!' রাগে ক্ষোভে দুঃখে তাড়িত হয়ে মুহূর্তের মানসিক দুর্বলতায় সে নববিবাহিত স্ত্রীকে নির্মমভাবে প্রহার ক'রে বসে। পরিণতিতে স্ত্রী তাঁর গৃহে আর ফিরে তো আসেইনি, বরং ভূতেশ একবার দেখেছিল স্ত্রীকে তাঁর জামাইবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায়। এর পর থেকেই সমস্ত মেয়েদের ওপর ভূতেশের বিরক্তি চূড়ান্ত মাত্রা নিত। তাই সিধু ডোম যখন একটি মেয়েকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে এসেছিল তখন ভূতেশ বারংবার তাঁর বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলেছে : 'শালা! শ্মশানে মেয়েমানুষ! দেখিস ও ঠিক কেটে পড়বে।' অর্থাৎ একটা অসহায়তা নিরাপত্তার অভাব তাঁর মধ্যে সবসময় কাজ করেছে।

ভূতেশ আর সিধু ডোম শ্মশানে অবস্থান করলেও তাদেরও কিন্তু জীবন আছে। জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু জীবনটাকে তাঁরা পাচ্ছে না। বিশেষত ভূতেশ যদিও তাঁর

বিবাহিত স্ত্রী-র কাছেই প্রধান অবহেলাটা পেয়েছে এবং জীবনের বড়ো আঘাতটা পেয়েছে। ফলে শ্মশানে থেকে মৃত্যু-রেজিস্ট্রারের কাজটাকেই সে সর্বোচ্চ কাজ বলে মনে করছে। এইখানেই তাঁর খবরদারি চলবে। শ্মশানে কোনো ধিক্কার নেই। ভূতেশের বউ তাকে একদা রাক্ষস ব'লে অভিহিত করেছিল। ভূতেশ সেই মানসিক পীড়ন কখনও ভুলতে পারেনি। সে যেহেতু রাক্ষস হতে পারবে না তাই হাড়-মাংস চিবিয়ে খেতে পারবে না, তাই তাঁদের দেহগুলোকে দাহ করে তাঁর যেন একটা পৈশাচিক আনন্দ। এটা যেমন তাঁর মধ্যে কাজ করছে, অন্যদিকে কাজ করছে জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। দু'জনে গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকে তাঁরা যেন সমাজ থেকে নির্বাসিত। একজন ডোম হওয়ার জন্য জাতিগত কারণে সমাজ থেকে নির্বাসিত। আরেকজন জাতির মধ্যে সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ, কিন্তু কুরূপের কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে।

অর্থাৎ নাম-রূপ নিয়ে যে জগৎ উপনিষদে বলা হয়েছে নাম ও রূপ হলো ভ্রান্তি। নাম-রূপ থেকেই ভেদের সৃষ্টি। অজ্ঞতার তো চূড়ান্ততম ফসলটাই হলো নাম আর রূপ। নাম ও রূপ নিয়েই আমরা অহঙ্কার প্রকাশ করি। সর্বত্রই নাম আর রূপ। জাগতিক বস্তুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য অস্তি, ভাতি, প্রিয়ং, নাম ও রূপম—আমরা নাম-রূপ সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছি। আমরা নাম-রূপের বাইরে আর কিছু সৃষ্টি করতে পারি না এইখানেই ভূতেশ পরাজিত। তাঁর রূপের জৌলুস নেই। প্রশংসনীয় রূপ নেই। ভূতেশ বারংবার সিধুকে বলে সে যেহেতু শ্মশানের মধ্যে রয়েছে, আর শ্মশানে জীবন্ত ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। সে কেন এই মহিলাকে শ্মশানের মধ্যে এনেছে!

আমরা দেখেছি সেই মহিলা কিন্তু তাঁদের উভয়কেই মমতার চোখে দেখত। কখনও আবার অভিমানী বাচনে এই দু'জনকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছে 'শ্মশানে-মশানে থেকে তোমাদের খালি এক কথা। পুড়তেই শিখেছ খালি। আমাকে পুড়বার জন্যেই বুঝি হাঁ করে আছ তোমরা!' তারপর নিয়তির অমোঘ আদেশেই যেন-বা চৈত্র মাসে ভূতেশের ভবিষ্যত-বাণীকে সত্যি প্রমাণ ক'রে সমগ্র চাকলা জুড়ে নেমে আসে কলেরার মড়ক। মৃত্যু হয় মেয়েটির। ভূতেশ কিন্তু বেশ যত্ন নিয়েই সেই মহিলার নাম লিখেছিল। একটা বিষাদের ছায়া তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমে আকাশে। ঘনিয়ে আসে নিবিড় অন্ধকার। এই মেঘ জমে তাঁদের উভয়ের হৃদয়েও।

আগে সিধু শবদেহের শাড়িগুলো রেখে দিত। কোনো মেয়ে মানুষ পরবে বলে। এবারে ওই মেয়েটি অর্থাৎ সুলোচনা মৃত্যুর পর সিধু কিন্তু ঘরে জমানো সমস্ত শাড়িগুলো মেয়েটির চিতায় পুড়িয়ে দিয়েছিল। যে মানবিকতার বোধ থেকে শবদেহ পোড়াতে আসা লোকজন পোশাক বা অলঙ্কার খুলতে দিত না। সিধু কিন্তু তাই করল। এত দিন প্রেম ছিল না বলেই হয়তো বস্ত্র অলঙ্কারের সঙ্গে যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা মিশে থাকে তা সে জানত না। কিন্তু এখন ভালোবাসার ফলে তাঁর শ্মশানত্বটা চলে গিয়েছিল।

অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র আমরা দেখেছি অনেক বিয়ে কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে হয়। হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ বাঙালি হিন্দুর বিয়ে ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিকে সাধারণত হয় না। অগ্র মানে প্রথম, হায়ণ মানে বছর—একটা জীবন কিন্তু একটা বছরের প্রতীক হয়ে রইল। যে জীবনটা শুরু হচ্ছে অগ্রহায়ণের মধ্যে দিয়ে, সেটা তাঁর পূর্ণ মুকুলে বিকশিত হয়ে ওঠার যে-কাল, অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে, মধুমাসে। সেই মধুমাসেই অর্থাৎ চৈত্র মাসে কিন্তু সমাপ্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ অসম্পূর্ণ জীবন আমাদের বহু মানুষকে বয়ে বেড়াতে হয়। বসন্তকালটা আমাদের প্রেমের ঋতু। প্রেমকে অসম্পূর্ণ করে দিয়ে চলে যাওয়া। কালের একটা তাৎপর্য রয়েছে। মুকুলিত হওয়ার সুযোগটাও যেন হলো না। তার মধ্যে দিয়ে যেন একটা বিয়োগান্তক নাটক সমাপ্ত হয়ে গেল। সম্পূর্ণ মিলন হতে পারল না। অর্থাৎ বসন্তের প্রেম সে পেল না। প্রথম বসন্তেই প্রেম শেষ হয়ে গেল।

পরিশেষে এই গল্পটিকে আমরা যদি রসতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করি তাহলে দেখব এই গল্পটিতে আমরা বীভৎস রসের মধ্যে দিয়ে শৃঙ্গার রসকেই উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছি। শেষ পর্যন্ত গিয়ে করুণে পৌঁছেছে। মনুষ্যত্বের জয় হয়েছে। শবদেহ ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে মৃতদেহের সঙ্গে থেকে তাঁদের সাধারণ জীবন-যাপনের মধ্যে, উভয়ের কর্মের মধ্যে যে একটা বিবমিষার ব্যাপার তৈরি হয়েছিল, সেখানে মনুষ্যত্বের জন্য অশ্রুপাত ক'রে তাঁরা যেন মনুষ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁরা প্রেতলোক থেকে মনুষ্যলোকে যাত্রা করল। আমরা যেমন ইহলোকের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন থেকে পরলোকের একটা সুন্দর জীবন কামনা করি; সে-রকম কিন্তু ওরা ওদের ওই নোংরা পরিবেশ থেকে একটা উন্নত আলোর সন্ধান পেয়েছে।

'শ্মশানটা শালা সত্যি শ্মশান হয়ে গেছে'—ভূতেশের এই শেষ বাক্যটিতে লগ্ন হয়ে রইল মানবিকতাবোধের যাবতীয় সারাৎসার। এইখানেই গল্পের তাৎপর্য। ফলত, এই গল্পে বীভৎসতার মধ্যে একটা সত্য-সুন্দরের জন্য তপস্যা আছে। আমরা এখানে বীর রসের ছায়াপাতও দেখি। উৎসাহ, জীবনকে খুঁজে নেওয়ার আনন্দ ভূতেশ ও সিধু এই দু'জন তো একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উত্তরণের দিশা পেয়েছে। সংগ্রাম বীর রসের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দৃষ্টিকোণ তৈরি করে। সংগ্রাম দৈহিক বা মানসিক দুই-ই হতে পারে। সুলোচনার মৃত্যু এবং সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে যে বিচ্ছেদ বোধে তাঁরা আক্রান্ত হয়েছে তাতে তাঁরা যেন প্রকৃত মানুষ হয়ে গেছে। ভূতেশ প্রেমে তপস্বী হয়ে সব কিছু সুলোচনার চিতায় নিক্ষেপ করেছে। সুলোচনা যেন তাঁদের উভয়ের লোচন উন্মোচন ক'রে দিয়ে নতুন এক ভাবনার, বোধের জন্ম দিয়েছে। এভাবেই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারায় গল্পকার সমরেশ বসু নতুন চিন্ত-চেতনার লালন করেছেন, জন্ম নিয়েছে মানবজীবনের নতুন দিশা।

# সমরেশ বসুর ছোটগল্প : প্রসঙ্গ যৌনতা

সুজিত মণ্ডল

যৌনতা থেকে মানবজীবনের সৃষ্টি অথচ যৌনতা বিষয়ে আলোচনায় আমাদের মনে একধরনের অস্বস্তিবোধ কাজ করে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কামবিদ্যার চর্চা করা হতো যার প্রতিফলন আমরা কামশাস্ত্র ও বিভিন্ন মন্দিরে দেখতে পাই। আধুনিক সমাজে যৌনতা হয়েছে নিষিদ্ধ। মিশেল ফুকো তাঁর 'দ্য হিস্ট্রি অব সেক্সুয়ালিটি' গ্রন্থে বলেছেন যে বর্তমানে যৌনতা বলতে আমরা যা বুঝি তা নির্মিত। যৌনতাকে নির্মাণ করেছে সমাজ, ধর্মের অনুশাসন, রাষ্ট্রীয় আইন প্রভৃতি। নির্মিত যৌনতার জন্য রচিত হয়েছে ডিসকোর্স। মানুষের স্বভাবজ প্রবৃত্তিকে সমাজের বিধিবদ্ধ নীতিনিয়ম করে তুলেছে জটিল। ব্যক্তির আচরণ, সংবেদন, চেতন, জৈবিক চাহিদার সমন্বয়ে যৌনতা নির্মিত হল। পরবর্তীতে উল্টে যৌনতায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত। যৌন আচারণ একজন ব্যক্তির চারিত্রিক মানদণ্ড হয়ে উঠল। ব্যক্তিটি সমাজে আদর্শচরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গিয়ে যৌনজীবনকে করল অবদমন। যৌনতা পর্যবসিত হল ঘৃণাহ ও অশুচি পাপাচারে। ভারতীয় সমাজে বিবাহের পর সন্তান উৎপাদনের জন্য নর-নারীর যৌনমিলনকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এর ব্যতিরেক যৌনতার উপর আরোপিত হয়েছে নিষেধাজ্ঞার পরোয়ানা। ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে 'পুত্রার্থ' হেতু ছাড়া যৌনমিলনে শারীরিক ও মানসিক শক্তির ক্ষয় হয়। সম্ভোগ স্বাস্থ্যহানিকর কারণ-"যে কার্যে দেহের আমূল কম্পিত ও ক্ষয়িত হয়, যাহা অতি ঘৃণাহ ও পৈশাচিক কার্য, ঈশ্বরপ্রদত্ত সম্মোহনী শক্তি তাহাকে জীবের প্রিয় কার্য করিয়া তুলিয়াছে, (কারণ) ইন্দ্রিয়সেবন ব্যতিরেক বংশরক্ষা হইতে পারে না।"[১] অর্থাৎ সম্ভোগকালে শরীরের অস্থিরতা, কম্পন, স্খলনে অবসাদের জন্ম নেয়, যা মানুষকে পশুতে পরিণত করে; এমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজে মানুষ নিজের শক্তির অপব্যবহার করে। যৌনতায় সুখনাভূতিকে পাপাচার ভেবে সমাজ যৌনতার উপর সংযমের রাশ টানতে চেয়েছে। পুরাণ-উপনিষদে বালকাবস্থা থেকেই সংযম, মিতাচার ও ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রবৃত্তিকে সংযম করে ধর্মসাধনার পথকে সুগম করা হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই যৌনতা সম্পর্কে আমাদের মনে ভয় ও সংস্কার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যা পরবর্তীকালে যৌনাচারে আত্মবিশ্বাস ক্ষুন্ন হয় এবং হীনমন্যতায় ভোগে। ব্যক্তিটি মনে করে সে কোনো মহাপাপের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। অতএব আমরা যৌনতার সংজ্ঞা হিসেবে বলতে পারি-"যৌনতা আসলে একটি সামাজিক সম্পর্ক। সামাজিক সম্পর্ক যেমন দেশ-কাল-নিরেপেক্ষ নয়, সামাজিক সম্পর্কের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য যেমন নির্ভর করে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, ক্ষমতার চরিত্রের উপর, যৌনতাও তাই।"[২] পরিবেশ ও সংস্কৃতিভেদে যৌনতা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। সমাজশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য সৃষ্ট করে যৌনতার সংস্কার ও সীমাবদ্ধতা।

বাংলা সাহিত্যে যৌনতা বিষয়ের ব্যপকতা লক্ষিত হয় ঊনিশ শতক থেকে; পাশ্চাত্য প্রভাবের কারণে। লেখক তাঁর রচনাকর্মে যৌনতার উপযোগিতাবাদ নির্মাণ করেন। যৌনতার সুফল-কুফল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন বৈধতা বা সমাজের প্রয়োজনে যৌনতার সংস্কারকে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেন। তবে আধুনিক লেখকরা শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। যৌনতায় মনোগহনের নানা জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন। কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর রচনাকর্মেও আমরা সেই দিকটি দেখতে পাই।

যৌনতা ও রাজনীতি সমরেশ বসুর সাহিত্যের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে। এই দুই বিষয় তাঁকে বিতর্কিত ও বিখ্যাত করেছিল। তাঁর উপন্যাস-গল্প যৌনতা সম্পর্কে মানুষের সংস্কারশ্রয়ী শুচিবায়ুগ্রস্থ মনকে আন্দোলিত করেছিল। তাঁর রচিত যৌনতাবিষয়ক গল্পগুলি চটুল বা অশ্লীল নয়, তা জীবনবোধের পরিপূরক। তিনি লেখনশক্তির জোরে যৌনতাকে সাহিত্যের সূক্ষ্মতম শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর গল্পে লিখেছিলেন- "যৌনতাকে আমরা সূক্ষ্মতম শিল্পের বিষয় করে তুলতে পেরেছি।"

ব্যক্তিগত জীবনে সমরেশ বসু বিবাহতিরিক্ত নারী সংসর্গে লিপ্ত ছিলেন। আমরা জানি তিনি দুইবার বিবাহ করেছিলেন-"দুইবার বিবাহ করা সত্বেও তিনি অসংখ্যবার বিভিন্ন নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করেছেন। বিশ্বসাহিত্যে খ্যাতনামা লেখকদের সঙ্গে সমরেশের মৌলিক প্রভেদ হল, সমরেশ মেয়েদের সঙ্গে ঠিক ততটুকুই মিশেছেন যতটুকু তাঁর প্রয়োজন হত। কোনো নারী তাঁর মনে দীর্ঘস্থায়ী আশ্রয় পায়নি, কারণ একমাত্র লেখাছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল না।"[৩] নারীর সান্নিধ্য তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি; বেসামালের পূর্বেই সম্পর্ক থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন।

মানবজীবনে ক্ষুধা ও যৌনতার চাহিদা প্রবল। আবার দুটোই সর্বগ্রাসী। আমরা ক্ষুধাকে ক্যানভাসে তুলে ধরলেও যৌনতাকে সহজে পারি না। সমরেশ বসু তাঁর সাহিত্যে মানুষের সহজাত আচারণগুলিকে শিল্পে রূপ দিয়েছেন। যৌনতা সমরেশ বসুর গল্পের অন্যতম বিষয়। জীবনচক্রের ভিন্ন পর্ব অর্থাৎ কৈশোর, যৌবন, মধ্যবয়স, প্রৌঢ়ত্বে যৌনতাকে ঘিরে নানান জটিলতার সৃষ্টি হয় তা তিনি পর্ব থেকে পর্বান্তরে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর গল্পে যৌনচেতনার আড়ালে প্রেম, হতাশা, প্রাপ্তি, অবক্ষয়, অতিকাম, অর্থক্ষমতা, পুরুষতান্ত্রিকতা ও নারী স্বাধীনতার দিকগুলি উঠে এসেছে নিম্নে নেই বিষয়েই আলোচনা করবো।

যৌন উত্তেজনায় মানুষ হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। ক্ষণিকের কামসুখ চরিতার্থের জন্য নিজের নীতিবোধ, রুচিশীলতাকে বিসর্জন দেয়। কামোত্তেজনা হ্রাস বা মেটানোর পরই ব্যক্তিটির মনকে ঘিরে ধরে অবসাদ ও আত্মগ্লানিবোধ। পাপবোধের কারণে প্রতিনিয়ত চলতে থাকে মন ও মস্তিস্কের লড়াই। অনুশোচনায় দগ্ধ ব্যক্তিটি একসময় নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নিরবিচ্ছিন্ন ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে আশ্রয় নেয় মৃত্যুর

কাছে। সংযমহীনতার কারণে বিপর্যস্ত জীবনের গল্প 'অসংশয়'। মধ্যবয়সী, বিপত্নিক কমল সমাজে আদর্শবাদী হিসেবে পরিচিত। সংসারে একা কমলের বাগানচর্চা ও অধ্যাবসায়ে দিন কাটে। কমলের একঘেঁয়েমির দিনগুলি ওলটপালট হয় কিশোরী ইভার আগমনে। ইভার পিতা কমলের বাল্যবন্ধু। বালিকাবস্থা থেকে পরিচিত মেয়েটিকে ঘিরে কমলের আদিম প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে। যৌনতার প্রতি কিশোরী মনের আদিম কৌতূহল থেকে ইভা গুটি গুটি পায়ে কমলের ঘরে উপস্থিত হয়। কিশোরী মনের অন্যায় জিজ্ঞাসার প্রতি কঠোর, রাশভারীর হওয়ার পরিবর্তে কমল তামসিকতার শিহরিত সুখে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে-"তখন আমি, ব্যক্তি, সমাজ, বিবেক সকল সীমা একটার পর একটা পার করে চলেছি, অথচ এখনো আমার ভিতর প্রতিবাদের পালা চলছে। তখনও আমার ছেড়ে আসা সীমায় ফেরবার জিন্য ভিতরটা আকুলি বিকুলি করছে। তখন ষষ্ঠেন্দ্রেয়ির টের পাওয়ার চেতনা পেরিয়ে তার ভয়ঙ্কর হিংস্র হাঁ মুখ দেখতে পেয়েছি। আমি তখন তার কবলে, উদ্ধার পাবার কোনো উপায় ছিল না।"[৪] দীর্ঘদিনের অতৃপ্ত শারীরিক চাহিদার কাছে বিবেকশূন্য হয়ে পড়ে কমল। ক্ষণিকের সুখচরিতার্থের পরই তার মনে লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, পাপবোধ জন্মায়। ইভার সঙ্গে যৌনাচার যেমন সম্ভব নয় তেমনি পুরোনো মান-সম্মান-নীতিবোধ নিয়েও বাঁচা কমলের পক্ষে অসম্ভব। আত্মগ্লানিতে দগ্ধ এই জীবন থেকে মুক্তি পেতে কমল বিষপান করে।

পাপবোধের গ্লানিময় জীবনের করুণ পরিণতির আরেক গল্প 'পাপপুণ্য'। গল্পটির প্রথম লাইন "এটা কি দুঃখ, কিছু বুইতে পারলাম না।" আসলে যৌনতায় মনোগহনের সর্পিল গতি আমাদের বোধগ্যমের বাইরে। বিন্দু গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার মৃতদেহ শশ্মানে নিয়ে চলছে পিতা গদাই ও হবু স্বামী কেতু। কেতু বুঝতে পারে না বিন্দুর আত্মহত্যার কারণ। কিন্তু পিতা গদাইয়ের কাছে তা অজানা নয়-"আমি পেরেছি, কেন কি না পাপ চাপা থাকে না।"[৫] অন্ধকারে ভৈরবের ঘরের কোণে পাচীর সঙ্গে শারীরীক সম্পর্ক করতে গিয়ে গদাই নিজের মেয়ে বিন্দুর সঙ্গে সম্ভোগ করে। চরম কামসুখে গদাই পাচীর নাম ধরে ডাকে। অন্ধকারে পিতার ডাক চিনতে পেরে বিস্মিত বিন্দু বলে-"অইগ, তুমি বাপ।" এই ঘটনার পরই বিন্দু আত্মহত্যা করে। ঘৃণ্য অসামাজিক ঘটনায় গদাইয়ের মনে পাপবোধের জন্ম নেয়। গ্লানিভরা জীবন নিয়ে বাঁচা তার পক্ষে অসম্ভব, তাই গদাই মেয়ের চিতায় আত্মহুতি দেয়-"অ মা দাঁড়া আমি যাই।"

সমরেশ বসু এই গল্পে দেখিয়েছেন কামাচারে মানুষ ও পশুর মধ্যে বিভেদ আছে। কামে মানুষ ও পশুর আচারণের পার্থক্য একটি ছোট দৃষ্টান্তের দ্বারা তুলে ধরেছেন। শশ্মানে বিন্দুর পাশে গদাই আর কেতু পাশাপাশি অবস্থানকালে দূর জঙ্গল থেকে শিয়াল ডেকে ওঠে। ডাক শুনে ভীত কেতুকে সাহস দিয়ে গদাই বলে "শরীলে কাম হলে অমন ডাকে।" পশু কামে জানান দিতে পারে কিন্তু মানুষের সংসারে লজ্জা আছে, কামে লজ্জা আছে। যৌনসুখ মেটানোর জন্য মানুষের পশ্বাচারকে লেখক সমর্থন করেন না। তাই অসামাজিক কর্মের জন্য গদাইয়ের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে।

যৌবনের অসংযমতায় অনুতাপগ্রস্তা জীবনের গল্প 'চেতনার অন্ধকার'। সুন্দরী ললিতার বিবাহ স্থির হয় প্রেমিক প্রবীরের সঙ্গে। বিবাহের আগে ললিতা দাদা-বৌদির সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়। চলমান ট্রেনে পাশের কামরার এক চল্লিশ বছরের যুবককে দেখে ললিতার কামোদ্রেক হয়। রাত্রিবেলায় সকলের অগোচরে, নিজের অতীত-বর্তমানকে ভুলে অপরিচিত যুবকটির সঙ্গে যৌনমিলন করে। চেতনার অন্ধকারে মিলনের ফল ক্রমে ললিতার মন ও শরীরে প্রকটিত হতে থাকে। অন্তঃসত্বা ললিতার বিষাদচ্ছন্ন মনে জন্মায় অপরাধবোধ। সে গোপনে হাসপাতালে গর্ভপাত করে। আত্মগ্লানিবোধ থেকে মুক্তি পেতে প্রবীরের কাছে স্বীকারোক্তি করে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, যে নারী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ প্রেমিকের কাছে কিন্তু কি কারণে নিজের শরীর উজাড় করে দেয় অন্য পুরুষের কাছে? উত্তর একটাই, আদিম প্রবৃত্তির সম্মোহনে মানুষ বোধশূন্য হয়ে পড়ে। ক্ষণিকের কামসুখের জন্য জীবন হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত।

কাম-তাড়িত মানুষের বিকৃত যৌনতা গল্পে উঠে এসেছে লেখকের কলমে। বিকৃত যৌনতায় মনের অন্ধকার দিকগুলি হিংস্রতার রূপ নেয়। সমরেশ বসুর কাছে নিম্নশ্রেণির মানুষের যৌনজীবনে যৌনতা পরিশুদ্ধ প্রেমের প্রকাশ। অন্যদিকে তাঁর যৌনবিকার বা বিকৃত কাম বিষয়ক গল্পগুলি নাগরিক প্রেক্ষাপটে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষের যৌনজীবনে পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তির বঞ্চনা, হতাশা, অপ্রাপ্তি থেকে যৌনতা বিকৃতকামে পর্যবসিত হয়।

সমরেশ বসু বিকৃত কামের মাধ্যমে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মুখোশ খুলে ভিতরের পশুত্বকে সমাজের সামনে এনেছেন। তারই প্রতিচ্ছবি 'কে নেবে মোরে' গল্পটি। 'কে নেবে মোরে' নামটি থেকেই বুঝতে পারি মানুষ নামক পণ্যের কেনাবেচা চলছে। সুরজিৎ মণ্ডল আত্ম-স্বার্থসাধনে নিজের বাগানবাড়িতে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে শহরের নামজাদা অফিসারদের একত্রিত করে। খাদ্যের প্রাচুর্যের সঙ্গে চলতে থাকে অপরিমিত মদ্যপান। কিছু খাবারের আশায় নিম্নশ্রেণীর দুই যুবক-যুবতী উপস্থিত হয় বাগানবাড়িতে। ক্ষুধার্থ মেয়েটির কালো টানা চোখ, পুষ্ট ঠোঁট, পিনোন্নত বুক ও দীর্ঘ ছিপছিপে শরীরী গঠন এবং যুবকটির চওড়া বুক, পেশল বাহু অফিসার ও তাদের পত্নীদের কামোদ্রেক করে। অফিসাররা আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে যুবতীর শরীরকে পণ্যে পরিণত করে ভোগ করতে চায়। কামক্ষুধার্থ বাবুদের নেশাতুর চোখ যুবতীর সর্বাঙ্গ লেহন করে। তারা যুবতীর শরীরের সতেজ মাংসলোভী-"উই অল ওয়ানট হার। ওয়ানট টু হার অল ফ্লেশ অ্যান্ড বোনস।"[৬] দুই যুবক-যুবতী উচ্চশ্রেণীর বাবুদের কাছে প্রাগৈতিহাসিক জীবের সমতুল্য। দুই-মুঠো খাদ্যের বিনিময়ে তারা যুবতীর শরীর ভোগ করতে চায়। যা বিকৃত কামেরই নামান্তর। লেখক এই গল্পে পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধার বীভৎস রূপকে তুলে ধরেছেন।

যৌনতাকে স্বার্থচরিতার্থের হাতিয়ার করে তুললে তা রূপ নেয় বিকৃত কামে। 'নিষ্কৃতি পাবার স্টাইল' গল্পে সেই ছবিই দেখি। জয়ন্ত ভালোবেসে বিয়ে করেছিল কস্তুরীকে। যদিও

সেই ভালোবাসা ছিল কস্তুরীর নিটোল শরীরের প্রতি আকর্ষণ। চার বছরের দাম্পত্যে কস্তুরীর জীবন-যাপন ছিল উচ্ছৃঙ্খলময়। তার আকর্ষক চেহেরার গুণে একের পর এক পুরুষের চিত্তহরণ করে। সংগীত জগতে নিজের খ্যাতির জন্য সে কল্লোল, অতীনদের অঙ্কশায়িনী হয়। বহুগামী স্ত্রীর কাছ থেকে নিস্কৃতি চায় জয়ন্ত। কস্তুরী ডিভোর্স দিতে রাজী হয়নি; কারণ, শখ-আহ্লাদ মেটাবার জন্য জয়ন্তর টাকাই তার সম্বল। পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে শরীরের চাহিদা মেটাবার খেলায় কস্তুরীর জীবনে নেমে আসে অশনি সঙ্কেত। স্বামী নয়, ঈর্ষাপরবশ হয়ে কস্তুরীর এক প্রাক্তন প্রেমিক তাকে হত্যা করে। শরীরের বিনিময়ে কার্যসাধন একধরণের বিকৃত কাম, যার ফলে জীবনের পরিণতি হয় অনুশোচনীয়।

অতিকামে মানুষের জীবন হয় ভয়াবহ। সেই বীভৎসতার গল্প 'রতি প্রতিমা'। লেখক অনুসূয়া শেট্টিকে বলেছেন 'নিম্ফোম্যানিয়াক'। নিম্ফোম্যানিয়া শব্দের অর্থ হল যে নারীর অতিমাত্রায় যৌনচাহিদা এবং তা পূরণে বিভিন্ন যৌন কর্মকাণ্ড ঘটায়। সমরেশ বসুর মতে নিম্ফোম্যানিয়াগ্রস্ত নারীর জীবন অসহায় বা কদর্য নয়, যদি সেই কামনা উদ্দেশ্য সার্থকতার জন্য হয়। নিম্ফোম্যানিয়ার সংজ্ঞানুসারে কুন্তি ও দ্রৌপদী সবথেকে বড় নিম্ফোম্যানিয়াক। কুন্তী তিনজন দেবতার সঙ্গে যৌনমিলন করেছিল; দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীকে বরণ করে নিয়েছিল। তারা সকলেই কার্যসাধন উদ্দেশে তাদেরই সমতুল্য পুরুষকে নির্বাচন করেছিল। এক্ষেত্রে নারীকে অতিকামগ্রস্ত বলা চলে না। কিন্তু সার্থকতা ছাড়া অতিকাম মেটাতে যত্রতত্র যেকোনো পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন 'নিম্ফোম্যানিয়া'র আচরণ। 'রতি প্রতিমা' গল্পে অনুসূয়া শেট্টি জীবন্ত রতিপ্রতিমা। অতিকাম মেটানোর জন্য সে বহু পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন করে। অনুসূয়া শেট্টি 'নিম্ফোম্যানিয়াক' আক্রান্ত। স্বামীর বর্তমানেও সে বহুগামী। বহু পুরুষের মত সলিলও তার কামের শিকার হয়। প্রকৃতিবিরুদ্ধ কামাচারে অনুসূয়া জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ হারিয়ে ফেলে। যৌবনের দাহ নিয়ে নারী-পুরুষের রচিত মিলনবাসরে শান্তি নয়, তৃপ্তি নয়, এক বেদনার গাঢ় হতাশা শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করে। অতিকাম মেটানোর খেলায় একটা সময় জীবনের প্রতি আসে ক্লান্তি ও ঘৃণাবোধ। অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পেতে অনুসূয়া আত্মহত্যা করে। সুস্থ, স্বাভাবিক যৌনতা জীবনকে করে মধুর, সম্পর্ক হয় প্রেমময়। কিন্তু ধর্ষকাম জীবনকে করে তোলে দুঃসহ-"যৌনতাকে আমরা সুক্ষ্মতম শিল্পের পর্যায়ে তুলতে পেরেছি। কিন্তু বাসনার আগুন সেই শিল্পকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।"[৭] অনুসূয়া শেট্টি তার দৃষ্টান্ত।

বিকৃত কামে জীবন জটিলতার আরেক গল্প 'মুখোমুখি'। শান্তা 'কালো হলেও নজরকাড়া'। 'নজরকাড়া' শব্দেই আমরা বুঝতে পারি শান্তা শারীরিক গঠনে আকর্ষণীয়া। যা সহজেই পুরুষের মনে যৌন উত্তেজনা উদ্রেক করতে পারে। শান্তার জীবনে অপূর্ণতা নেই। ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর ভালোবাসা, দাস-দাসী ঘেরা রাজপ্রাসাদে রাজরাণীর মত থাকে। সুখ-বিলাস থাকা সত্বেও তার স্বামীর অফিসের নিম্নতন কর্মচারী তপনের কাছে সে 'ধর্ষিত' হতে চায়। শান্তা

'নজরকাড়া শরীর' দিয়ে তপনকে উত্তেজিত করতে বারবার ব্যর্থ হয়। কিছুদিন পর তপন জেলবন্দী হয় চোদ্দ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করার অপরাধে। স্বামীর মুখে এই খবর শুনে শান্তা অপমানিত বোধ করে। শান্তা কল্পনায় নিজেকে ধর্ষিত মেয়েটি ভেবে ধর্ষণসুখ অনুভব করে-"শান্তা শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে যেন সেই ধর্ষণের স্বরূপকে অনুভব করার চেষ্টা করলো। ঠোঁটে বুকে সারা শরীরের বাইরে ও ভিতরে।"[৮] তপনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলে শান্তার জিজ্ঞাসা তার যৌনাবেদনে সাড়া না দিয়ে কেন চোদ্দ বছরের কালো মাংসের পুঁটুলিকে তপন ধর্ষণ করলো? আসলে আদিম চেতনায় মানব মনোগহনের বিচিত্র জটিলতার সর্পিল গতি বুঝতে আমরা অক্ষম। এই গল্পে শান্তা ও তপনের যৌনতা বিকৃত কামে পরিণত হয়েছে।

প্রবল যৌনাবেগের তাগিদে বা কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে ভোগ করার বাসনায় মানুষ হিংস্র পশুতে পরিণত হয়। তখন মানুষের আচরণ হয় পাশবিক; যা বিকৃত কামেরই নামান্তর। সমরেশ বসু যৌনতায় মানুষের পশুচারকে তীর্বভাবে নিন্দা করেছেন, তাই তাঁর এইসব গল্পে জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে। পূর্বালোচ্য 'পাপপূণ্য' গল্পে কামে মানুষ ও পশুর মধ্যে যে বিভেদ তা বর্ণিত হয়েছে। মানুষের সমাজে আছে লজ্জা, আছে নীতিবোধ ও রূচিশীলতা। যা তাকে পশুর থেকে ভিন্ন করে। তবুও মানুষ আদি রিপুর অন্ধকারে জ্ঞানশূন্য হয়ে পশুতে পরিণত হয়। তেমনই এক গল্পের নাম 'মহাযুদ্ধের পরে'। জন্মান্ধ কানি কুরচিকে ঘিরে দুই জন্মান্ধ সুলা ও বটার মধ্যে মহাযুদ্ধ। জন্মান্ধ তিনজনের অন্ধকার জীবনে বর্তমান ইতিহাসের আলো জ্বলেনি। তারা যেন প্রাগৈতিহাসিক জীব-"ইতিহাসের আগে, আদিম যুগের গুহা-মানবের মতো নিতান্ত গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। শব্দ দিয়ে যারা রূপকে দেখতে চেয়েছে, স্পর্শ করে রঙকে চিনতে চেয়েছে। কীট আর পতঙ্গের চেয়েও অসহায়। ক্ষুধার মতো প্রাকৃতিক বোধ আর অসুখের অনুভূতি ছাড়া, মানুষ হিসেবে আর কোনো দরকার নেই তাদের।"[৯] লেখক দুজনের জীবনের বর্ণনা করেছেন কীট-পতঙ্গদের মতো- "সে বাসনায় জোনাকি জ্বলে ওঠে, সেই বাসনায় পুরুষ-ঝিঁঝিঁটা চেঁচিয়ে ফাঁদ পেতেছে মেয়েটার জন্য", "এই বর্ষায় মাতাল পুরুষ ব্যাঙ-এর মতো ডাকতে ইচ্ছে করে ক্যাঁ কো ক্যাঁ কো। যেমন করে মেয়ে ব্যাঙটাকে ডাকে" বা "বটা চীৎকার করে উঠল কাথাহীন, সুরহীন বুনো শুয়োরের মতো।" সুলা ও বটা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করে। দুজনের রক্তে কামনা উদ্দীপিত হয় অন্ধ কানি কুরচির আগমনে। মেয়েমানুষের গন্ধে দুজনের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তি জাগে। দুজনেই চায় কানি কুরচির শরীরের একচ্ছত্র অধিকার। পথের কাঁটা সুলাকে খুন করতে গিয়ে বটা কানি কুরচিকে হত্যা করে। পুলিশ কানি কুরচির মৃতদেহ উদ্ধার করে। জন্মান্ধ বটা ও সুলাকে কেউ সন্দেহ করে না। কিন্তু তাদের অন্ধকার জগত ঘন কালোতে পরিণত হয়েছে। তবুও ওরা দুজন বাঁচে গোষ্ঠিবদ্ধ আদিম প্রাণীদের মতো-"ওরা ভিক্ষা করে। তারপর রাত্রে ফিরে এসে কাঁদে ভাষাহীন, সুরহীন গলায়। এ কান্না কোনোদিন থামবে না।

কোনোদিন না।"[১০] জন্মান্ধ বটা ও সুলাকে আদিম প্রবৃত্তির অন্ধকার আরো গ্রাস করেছিল। কামনার অন্ধকার জগতে তারা আজও প্রাগৌতিহাসিক জীব।

'মহাযুদ্ধের পরে' গল্পটি আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৌতিহাসিক' গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। আদিম কামনায় মত্ত ভিখু, পাঁচীকে পাওয়ার জন্য খোঁড়া বসিরকে হত্যা করে। সুলা, বটা, ভিখু এরা সকলেই কামতাড়িত পশুর মতো পাশবিক আচরণ করেছে।

এক নারীকে ঘিরে দুই পুরুষের মধ্যে যৌনহিংস্রতার আরেক গল্প 'উরাতীয়া'। দুই বন্ধু লাখপতি ও ঘামারির জীবনের সব আনন্দ মল্লচর্চা ঘিরে। পরিবর্তনশীল সমাজ-সংসারে দুই মল্লবীর অপরিবর্তিত, যেন দুর্গম অঞ্চলের দুই আদিম জীব-"নির্জন পরিবেশে লোকালয়ের বাইরে, দূর প্রান্তরে তারা দুই বন্ধু যেন গহন অরণ্যের দুটি জীব। এখানে এই পরিবেশে তারা একাত্ম ও উন্মুক্ত।"[১১] প্রাগৌতিহাসিক দুই জীব এতদিন কেবল মাংসপেশির ক্ষমতা অনুভব করেছে; হঠাৎ হৃদয়ের কম্পন অনুভব করে উরাতীয়ার আগমনে। লাখপতির বাল্যকালের বিবাহিত স্ত্রী উরাতীয়া। মা-বাবার মৃত্যুর পর সে লাখপতির কাছে উপস্থিত হয়। দুই বন্ধুর দশ বছরের দেহচর্চার অন্তরালে লুকিয়েছিল কামনার কালসর্প; উরাতীয়ার আগমনে তা ফণা তোলে। নিস্পাপ উরাতীয়া স্বামী লাখপতিকে দেবতা ও ঘামরীকে সহচর ভাবে। কিন্তু দুজনে উরাতীয়াকে কেন্দ্র করে প্রাণঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। উরাতীয়ার শরীরে কেবল তার অধিকার, এই জ্ঞানে লাখপতি আদিম প্রবৃত্তির ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসায় রাত্রে উরাতীয়ার শরীর ভোগ করে। অসহনীয় আদরে রাতের অন্ধকারে উরাতীয়ার মুখ থেকে অস্ফুট গোঙানির শব্দ দেওয়ালে কান পেতে থাকা ঘামারির রক্তে অসহ্য জ্বালা ধরায়। শরীরচর্চায় ছিল দুই বন্ধুর মিলন আবার শরীরের কাম চাহিদা দুই জনের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে-"যে ভয়ঙ্কর দৈহিক শক্তি তাদের মিলনের সূত্র ছিল, আজ তা পরস্পরকে আক্রমণে উদ্ধত করল।"[১২] দুই বন্ধুর প্রাণঘাতী লড়াই থেকে মুক্তি দিতে উরাতীয়া আত্মহত্যা করে। উরাতীয়ার মৃত্যুতে বোবা অসহায়ের মতো কেঁদেছিল লাখপতি ও ঘামরি। যৌনতায় পাশবিক আচারণ জীবনকে করে তোলে বিপদাপন্ন।

যৌনতা এক রহস্য; সেই রহস্যে মানবজীবনের অপার কৌতূহল। সমরেশ বসু যৌনচেতনাকে ঘিরে রহস্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এবং সেই রহস্য উন্মোচনে জন্য সৃষ্টি করেছেন গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর চরিত্র। অশোক ঠাকুর যৌনরহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে মানবমনের জটিলতাকে প্রকাশ করেছেন। অশোক ঠাকুর-কৃত যৌনরহস্য উন্মোচিত গল্পের নাম 'জন্মদাতা'। সুবিমল ও বিভা নিঃসন্তান। সুবিমল পরীক্ষা করে জানতে পারে তার শুক্রাণু সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম। নিজের অক্ষমতা স্ত্রীর কাছে গোপন রেখেছিল। কয়েকবছর পর বিভা গর্ভবতী হয়। বিভার গর্ভজাত সন্তানের জন্মদাতার রহস্যোদঘাটনের জন্য সুবিমল গোয়েন্দা অশোক ঠাকুরকে নিযুক্ত করে। তদন্ত করে অশোক ঠাকুর জানতে

পারে, বিভা তাদেরই পাড়ার চোদ্দ বছরের কিশোর নিমুর সঙ্গে যৌনমিলনে অন্তঃসত্বা হয়। সুবিমলের বাগানে নিমু কাঁচা আম কুড়োতে গেলে এই ঘটনা ঘটে, নিমুর কথায়-"প্রথমদিন দুপুরবেলা কাকীমা আমাকে তাঁর গা হাত পা টিপে দিতে বলেছিল, তারপর-"[১৩] তারপরই অঘটন ঘটে। যৌনজীবনের রহস্য আমাদের সত্যিই আশ্বর্যন্বিত করে। প্রথমবার যৌনমিলনের পর নিমু অনেকবার বিভার কাছে গেছে কিন্তু তার সঙ্গে আর শারীরীক মিলন করেনি বরং বিভা আদর করে নিমুকে খেতে দিয়েছে। আমরা বুঝতে পারি না বিভা নিজের অনিষ্টসাধন করেছে নাকি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র নিমুর জীবনকে সর্বনাশের পথে নামিয়েছে। মাতৃত্ব আস্বাদের জন্য বিভা নিজের নীতিবোধকে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

অশোক ঠাকুরকৃত যৌনজীবনের অতল রহস্য মোচনের আরেক গল্প 'প্রিয়তম সে'। চিত্তর ছোটপিসিমা সুধা হঠাৎ মারা যায়। সকলের ধারণা সুধা হার্টফেল করে মারা গেছে, কিন্তু চিত্তর বিশ্বাস পিসীমাকে খুন করা হয়েছে। মনের সংশয় দূর করতে ও রহস্য মৃত্যুর সত্যতা জানতে চিত্ত নিযুক্ত করে অশোক ঠাকুরকে। তদন্ত করে অশোক ঠাকুর জানতে পারে চিত্তর অনুমানই ঠিক, সুধাকে খুন করা হয়েছে। চিত্তর ছোটপিসীমাকে খুন করেছে তারই মেজপিসেমশাই শচীশবাবু। সম্পর্কে শ্যালিকা-ভগ্নীপতি হলেও দুজনের মধ্যে ছিল পরকীয়া সম্পর্ক। অবিবাহিত সুধা নিজের শারীরিক চাহিদা মেটাত শচীশবাবুর দ্বারা। বিত্তশালী সুধা তার বিষয়সম্পত্তি শচীশের সন্তানের নামে দলিল করেন। এই দলিলই তার মৃত্যুর কারণ। শচীশবাবু নিজে হতে চেয়েছিল শ্যালিকা সুধার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির মালিক। শচীশবাবু সম্পত্তি বঞ্চনার প্রতিহিংসায় নিজের শ্যালিকাকে যেভাবে হত্যা করে তা মনোবিকলনের লক্ষণ। অন্যান্য দিনের মতো শ্যালিকার সঙ্গে যৌনমিলনের পর যৌনসুখে ক্লান্ত সুধাকে অল্পায়াসে গলা টিপে খুন করে। অর্থলোলুপতা ও যৌনতা মানুষকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে পিশাচ বানায়-"গরীব মানুষের অভাব একরকম, কিন্তু অভাবগ্রস্ত ভদ্রলোকের চরিত্র আলাদা। লোভ তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকৃত করে দেয়। তা না হলে শচীশবাবু এমন হটকারিতা করতেন না।"[১৪] অসামাজিক যৌনতা জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, অশোক ঠাকুরের অনুমান-কিছুদিন পর আর একটা মৃত্যু ঘটবে হয় শচীশবাবু না হয় উনার স্ত্রী।

সমাজে যৌনতা ও অর্থের অবস্থান সমানুপাতিক। অর্থের কাছে যৌনতা সহজলভ্য। অর্থের বিনিময়ে যেমন যৌনতা কেনা যায় তেমনি যৌনতা সম্পদশালীদের কাছে সহজেই ধরা দেয়। সমরেশ বসু যৌনচেতনামূলক গল্পে ধনসম্পদের ক্ষমতা ও যৌনতায় সমাজজিজ্ঞাসার প্রশ্ন তুলেছেন। যৌনতাকে ঘিরে সমাজচেতনামূলক গল্পের নাম 'শানা বাউরির কথকথা'। শানা বাউরির কথা সমাজের উঁচুশ্রেণির মেকি ভদ্রতার মুখোশ খুলে তাদের বিবেকে কশাঘাত করেছে। শানা বাউরির 'মনটা অবুঝ হয়্যে গেছে' আর 'পানটো জ্বলে', কারণ অভাবের তাড়নায় দু' ধামা ধানের বিনিময়ে তার বউকে শুতে হয় চার কুড়ি বিঘা জমির মালিক কেদারবাবুর সঙ্গে। দেবতার সামনে কেদারকে বলি দিতে চায় শানা।

যদিও শানা জানে, সমাজের বুকে কেদারের মত বহু পশু যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে-"ক্যাদার শালা, উয়ার মতন মানুষের ঘরে কত বেজন্মা আছে আমি জানি।" সমাজে তেমনই এক বেজন্মা গগন বাড়ুজ্জ্যে। তার কেদারবাবুর থেকে বেশি জমি থাকায় সে কেদারের বোনটাকে নিয়ে বিছানায় শুই। শানার ধারণা গগন বাড়ুজ্জ্যের থেকে অধিক জমির মালিক-"গগন বাড়ুজ্জ্যে মশাইয়ের টুকটুকে লাতীনটাকে মন্দিরে নিয়ে শুয়ে থাকত আর একজনা।"[১৫]

ধনসম্পদ মানুষকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিলাসী করে তোলে। শানা বাউরির বেশি ধান থাকলে সেও কেদারের বউটার সঙ্গে বিছানায় শুতো। বাস্তুতন্ত্রের খ্যাদ্য পিরামিড়ের মতো সমাজে ধনসম্পদ অনুসারে ক্ষমতা পিরামিড়ের স্তর পরিবর্তিত হয়। কেবল শানা বাউরির মত নিম্নশ্রেণির মানুষ নয় সুন্দর রায়, হারান গাঙ্গুলীর মতো ছাপোষা মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষের পরিবারের মান-সম্ভ্রম বিপদের মুখে; কারণ তাদের থেকে কেদার বা হরেন বাড়ুজ্জ্যে বিত্তশালী। সম্পদশালী উঁচুশ্রেণির মানুষ অর্থের জোরে সমাজের বুকে যে ব্যাভিচার তাকে সম্মুখে এনেছে শানা বাউরি তার কথকথায়। এরাই আমাদের সমাজকে কলুষিত করে-"শহরে বাজারে মায়ে মানুষের পাড়া আছে, ইখানে বাউরীপাড়াটা আছে। উয়াদের ঘরে ধান আছে, এট্টা শালা বাউরির ডাগর বউকে লিয়ে শুতে উয়োদের রক্তে বড় দপদপানি। জমিদারটো উঠে গেলছে, বাগ্যার নাই, কিন্তুক পাপটো যেছে না।"[১৬] শানা বাউরির কথকথায় সমাজের সেই পাপের ছবিই চিত্রিত হয়েছে।

আবার কিছুক্ষেত্রে মানুষ প্রথমে অভাবের তাড়নায় পরে অর্থ ও যৌনসুখে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। তেমনই এক গল্প 'পাপবোধ'। শিবতোষ অভিমানে অল্প বয়সে বাড়ি ছেড়েছিল। বহু বছর পর নিজের স্ত্রী আরতিকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে ফেরে। পৈতৃক সম্পত্তির সবটুকু বিক্রি করে দাদ-ভাইরা ভিন্ন স্থানে বাস করে। সহায়সম্বলহীন, অসহায় শিবতোষকে আশ্রয় দেয় তার জ্যাঠামশায় ভবতোষ। বেকার শিবতোষ স্ত্রীর জীবনে বিলাস ও শখ-আহ্লাদ পূরণে অক্ষম। আশ্রয়ের তিনমাসের মধ্যে নিঃস্ব আরতির সোনার অলঙ্কার প্রভূত পরিমাণে বাড়তে থাকে-"কারণ আরতি এখন ভবতোষের অঙ্কশায়নী, সারা গায়ে তার সোনার অলঙ্কার তার সাজসজ্জা এখন ভিন্ন। প্রচুর তার বিত্ত। অর্থবান ভবতোষ অর্থের টোপে খুব সহজেই আরতির শরীর কিনে নিয়েছে। শরীরের বিনিময়ে বিলাস আরতিকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। পরকীয়া ও ধনসম্পদে মত্ত আরতির জীবনে শিবতোষ হয়ে পড়ে অস্তিত্বহীন। আর রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে নয় সর্বসমক্ষেই আরতি ভবতোষের ঘরে পা বাড়ায়। অর্থলালসার এক অলৌকিক শক্তির আকর্ষণে সম্মোহিত হয়ে আরতি বিত্তবান জ্যাঠামশায়ের বিছানায় শোয়। শিবতোষ পুনরায় গৃহত্যাগ করে স্ত্রীর এমন পাপাচারের জন্য। কিন্তু আরতির মনে পাপবোধ নেই, কারণ শরীরের বিনিময়ে প্রাপ্ত ঐশ্বর্যে মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। অর্থ ও যৌনতার নেশায় মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার লোপ পায়।

নারীশরীর কেবল যৌনোত্তেজনার সৃষ্টি করে না, জীবনও দান করে। একজন কামাতুর

ব্যক্তি নারীশরীরকে কেবল ভোগের সামগ্রী ভাবে। তারই প্রকাশ 'উত্তাপ' গল্পে। লেখক এই গল্পে নিম্নশ্রেণির মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মানসিকতার পার্থক্য দেখিয়েছেন। স্টেশনে সাঁওতাল সুঠাম শরীরী এক মেয়েকে দেখে হরেনের রক্তে অসহ্য কামনার জ্বালা ধরে। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দুর্বল শরীরে হরেন সাঁওতাল মেয়েটির পিছু নেয় ভোগের কামনায়। মুষলধারা বৃষ্টিতে পাহাড়ি রাস্তায় একটু হাঁটার পর জ্ঞান হারায় হরেন। প্রচণ্ড শীতে থরথর করে কাঁপতে থাকা হরেন ক্রমে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। সাঁওতাল রমণীটি লজ্জা-সম্ভ্রম ভুলে নিজের স্তনদুগ্ধ দিয়ে হরেনকে উতপ্ত করে তোলে। ছয়মাস আগে সাঁওতাল মেয়েটির সন্তান মারা গেছে কিন্তু বুকের দুধ এখনো জমা হয়, সেই স্তনদুগ্ধ-"আড়াল করে মানুষ মানুষের মৃত্যু-শীতকে তপ্ত করেছে। মেয়েটার বুকে ওর ছেলেটার দাগ রয়েছে এখনো। হরেনকে ওর উত্তাপের চাপে-চাপে গরম করতে লাগলো। একটু একটু করে অনেকক্ষণ ধরে।"[১৭]

সরল, নিষ্পাপ মেয়েটি কিছুক্ষণ পর অনুভব করে একটা বিছে যেন তার বুকে কোমরে ঘুরে-বেড়াচ্ছে। মেয়েটির শরীরে ঘুরছে হরেনের হাত। চৈতন্য পেয়ে মেয়েটির স্তন মুখে হরেন কামাতুর হয়ে পড়ে। আদি রিপুর বলে হরেনের মুখে ফুটে ওঠে হিংস্রতার ছাপ; মেয়েটির কোলে শুয়ে তারই স্তনে হাত দেয়। কামান্ধ হরেনের আচরণে মেয়েটির চোখ দপদপিয়ে ওঠে-"তার বলিষ্ঠ নিটোল হাতের এক ঝটকায় ছিটকে ফেলে দিল হরেনকে। বললো, 'আ মরণ কেন্নোর মরণ গো। বলে সেই ক্রুদ্ধ মুখেও হেসে উঠলো মেয়েটি, 'ই আর বাঁচবেনি দেখছি গো।"[১৮]

সমরেশ বসু তাঁর রচনাকর্মে যৌনতা বিষয়কে সুক্ষ্মতম শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যৌনচেতনামূলক গল্পগুলিতে তিনি নারীশরীরের রগরগে বর্ণনা দিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করতে চাননি। তাঁর গল্পে যৌনতা জীবনবোধের পরিপূরক। যৌনতা জীবনেরই এক মৌলধর্ম। যৌনতাহীন নর-নারীর জীবনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। যৌনতা সম্পর্কে ছুঁতধর্ম না রেখে যৌনতায় মানবচরিত্রের বিচিত্রবস্থার বর্ণনা তাঁর গল্পে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কলমে চটুল রগরগে যৌনগল্প নয় ক্ষণিকের কামসুখে নীতিবোধ বিসর্জনে আত্মগ্লানি, উচ্চশ্রেণীর মানুষের মুখোশের আড়ালে বিকৃত কাম, যৌনরহস্যে মানবমনের জটিলতা, অর্থক্ষমতার বলে সমাজে যৌনব্যাভিচার, আদি রিপুর কারণে পাশবিক আচারণ এবং যৌনতায় নিম্নশ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতার তারতম্যে প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য গল্পগুলিতে। সুস্থ যৌনতায় প্রেমের পরিশুদ্ধি ঘটে, সম্পর্ক হয় মধুরতর। সমরেশ বসু সুস্থ-স্বাভাবিক যৌনতায় বিশ্বাসী ছিলেন; তাই তাঁর কলমে অতিকাম, ধর্ষকাম বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ অসামাজিক যৌনতা বিষয়ক গল্পগুলির ব্যক্তি চরিত্রে ঘনিয়ে এসেছে করুণ বিপর্যয়। যৌনতার বিবরে আবর্ত নয়, যৌনতায় বিবরমুক্তের আভাস পরিলক্ষিত হয় তাঁর ছোটগল্পে।

**তথ্যসূত্র :**

১) বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী, সূর্যনারায়ণ ঘোষ, ঢাকা, ১৮৮৪, পৃ-৩৩
২) যৌনতা ও সংস্কৃতি, সুধীর চক্রবর্তী(সম্পাদিত), 'যৌনতা ও সংস্কৃতি', প্রদীপ বসু, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০, ফ্রেবুয়ারী-২০১০, পৃ-২৭
৩) সমরেশ বসু গল্প সমগ্র(প্রথম খণ্ড), নিতাই বসু(সম্পাদনা), 'ভূমিকা', নিতাই বসু, মৌসুমী প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রকাশকাল-ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ-ঙ
৪) সমরেশ বসু গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), নিতাই বসু (সম্পাদনা), মৌসুমী প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রকাশকাল-ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ-১৩৪
৫) সমরেশ বসু গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), নিতাই বসু (সম্পাদনা), মৌসুমী প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রকাশকাল- মহালয়া ১৪০১, পৃ-২০৯
৬) তদেব, পৃ-২০৯
৭) তদেব, পৃ-১৮৯
৮) তদেব, পৃ-২২৮
৯) তদেব, পৃ-৬৭
১০) তদেব, পৃ-৬২
১১) সমরেশ বসু গল্প সমগ্র(প্রথম খণ্ড), নিতাই বসু (সম্পাদনা), মৌসুমী প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রকাশকাল-ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ-১১৭
১২) তদেব, পৃ-১২০
১৩) সমরেশ বসু গল্প সমগ্র(দ্বিতীয় খণ্ড), নিতাই বসু (সম্পাদনা), মৌসুমী প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রকাশকাল- মহালয়া ১৪০১,পৃ-১৪১
১৪) তদেব, পৃ-২৩৩
১৫) সমরেশ বসু গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), নিতাই বসু (সম্পাদনা), মৌসুমী প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রকাশকাল-ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ-৩৩৬
১৬) তদেব, পৃ-৩৩৫
১৭) তদেব, পৃ-২৯
১৮) তদেব, পৃ-৩১

# মূল্যবোধ : সমরেশ বসুর ছোটগল্প

**গোলক সরকার**

**সূচক শব্দ :** মানবতাবাদ, শ্রমিক সম্প্রদায়, মূল্যবোধ, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, অত্যাচার, নিপীড়ন, বঞ্চনা, কঠিন বাস্তব।

**সংক্ষেপ :** সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্যের একজন ব্যতিক্রমী ধারার স্রষ্টা। সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং দায়বদ্ধতা থেকে তিনি সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তাঁর অজস্র ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১১ ডিসেম্বর ১৯২৪ সালে বিক্রমপুরে। ছোটবেলা থেকেই প্রথাগত শিক্ষার গন্ডির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকতে চাননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি ইংরেজ অত্যাচারের ফলে সমগ্র দেশবাসীর যে অত্যাচার নিপীড়ন ঘটেছিল তার অভিজ্ঞতা থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর একটি আলাদা দায়বদ্ধতা তৈরি হয়ে ওঠে। তাই সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন যন্ত্রণা তাদের যাপন প্রণালী, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংকট, প্রেমচেতনা সবকিছুই তিনি কলমের তীক্ষ্ণ ডগায় বলিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী সমরেশ বসু সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিক সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের নিপীড়ন, অত্যাচার বঞ্চনার যে প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। গল্পকার মানব জীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে যে গল্পগুলি রচনা করেছেন তার মধ্যে 'জোয়ার ভাঁটা', 'খিঁচাকবলা সমাচার', 'আলোর বৃত্তে পাড়ি', 'আইন নেই', 'প্রাণপিপাসা', 'মানুষ রতন', 'শুভবিবাহ', 'অকালবৃষ্টি', 'মাসের প্রথম রবিবার', 'নিষিদ্ধ ছিদ্র', 'উৎপাত', 'জলসা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য প্রবন্ধ সমরেশ বসুর উক্ত গল্পগুলির মধ্যে থেকে মানবজীবন চেতনার ব্যাখ্যা কুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

**মূল বক্তব্য :** মানবতাবাদ সমরেশ বসুর ছোটগল্প রচনার একটি অন্যতম রসদ। তাঁর গল্পে, উপন্যাসে লড়াই-সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও জীবনের নৈতিকতার কথা টেনে এনেছেন প্রতিনিয়ত। সাহিত্যজীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সমাজের নীচুতলার মানুষের জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন অক্লান্তভাবে। বেশিরভাগ গল্পে এসেছে সমাজের নীচুতলার বা সমাজের দরিদ্র মানুষের জীবনের কথা। জীবনসংগ্রামে যাদের ক্রমাগত লড়াই করে টিকে থাকতে হয় সমাজের আঙিনায়, তাদের জীবনের সারবস্তু তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। জীবনের মূল্যবোধের গল্পগুলি হল 'জোয়ার ভাঁটা', 'আলোর বৃত্তে পাড়ি', 'আইন নেই', 'প্রাণপিপাসা', 'সোনাটরবাবু', 'মানুষ রতন', 'শুভবিবাহ', 'অকালবৃষ্টি', 'মাসের প্রথম রবিবার', 'নিষিদ্ধ ছিদ্র', 'উৎপাত', 'জলসা', 'অকালবসন্ত' ইত্যাদি।

সমরেশ বসুর মানব জীবন চেতনার আরেকটি অন্যতম গল্প হল 'আইন নেই'। এই 'আইন নেই' গল্পের নায়কও আমাদের পরিচিত গণ্ডির বাইরে থেকে নেওয়া। গল্পের

নায়কের নামটিও বেশ মজাদার, কুঁচলাল। এই গল্পের নায়কের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এইভাবে—

"এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ির সঙ্গে হাত-ছেঁড়া হাফশার্ট। সেইটি যেমন তেলচিটে, তার ওপরে মান্ধাতার আমলের বগল-কাটা সোয়েটারও তেমনি। তেলচিটে তো বটেই, রঙটা যে কিসের বোঝবার সাধ্য নেই। ময়লা কাপড়টা হাঁটুর কাছাকাছি উঠেছে। কোমরে অন্ততঃ গুটি দুয়েক মাঝারী পুঁটলি ঝুলছে। তার ওপর দিয়ে একখানি শুকনো গামছা জড়ানো।"[১]

সাধারণভাবে তার জীবিকা চাষবাস হলেও বর্তমানে কুঁচলালের পেশা গ্রামে ঘুরে ঘুরে বাঁদর মেরে বেড়ানো। কুঁচলালের কথায় জানতে পারি বাঁদর চাষের জমির ফসল নষ্ট করে। সেই কারণে কুঁচলালকে সরকার থেকে বাঁদর মারার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি বাঁদর মারার জন্য দু'টাকা করে মজুরি বরাদ্দ হয়েছে। কুঁচলাল মূলত, দায়ে পড়েই এই কাজ নিয়েছে। কুঁচলালের একমাত্র সম্বল একটি বন্দুক। ১৮১ টাকা ৩ আনা অর্থ উপার্জন করা কুঁচলালের একটি লক্ষ্য। কারণ উক্ত টাকা কোর্টে জমা না দিতে পারলে সে ভূমিহীন হয়ে পড়বে। দেনার দায়ে বিকিয়ে যাবে তার চাষ-আবাদের জমি, তার বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু শেষমেষ আমরা দেখতে পাই কুঁচলাল তার জমিরক্ষা করতে পারেনি। এখানে গল্পটির সমাপ্তি ঘটে। গল্পের কাহিনীর এই সাধারণ বিষয় সমরেশ বসুর কলমে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তাঁর বর্ণনার গুণে, পরিবেশনের মুন্সীয়ানায় গল্পটি বাস্তব হয়ে উঠেছে। বাঁদর মারার সময় কুঁচলালের মধ্যে যে মানবিক সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তাতে সকল পাঠকই মুগ্ধ হতে বাধ্য হয়। গল্পের এইরকম একটি বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে — "তিনটে বাঁদরী — তিনটেই মা, তিনটেরই পেটে বাচ্চা ঝুলছে। .. মিছে বলবে না কুঁচলাল, ছেলেমেয়েগুলিকে বুকে আগলানো কুসুমের কথাটা তার মনে পড়ল।" জমিদারী প্রথা উঠে খাসপ্রথা হয়েছে। তাতেই কুঁচলালের জমি ফসল সব গেল। বাঁদর মেরে সে সকলের ফসল রক্ষা করেছে কিন্তু নিজের জমি ও ফসল সে রক্ষা করতে পারেনি। নিজের জমিতে যে বাঁদরগুলি তার ফসল নষ্ট করেছে, সেই বাঁদরগুলিকে কুচলাল আর মারতে পারেনি। এখানেই গল্পের চূড়ান্ত ব্যঞ্জনা লুকিয়ে রয়েছে।

সমরেশ বসুর মানবদরদের আরেকটি গল্প হল 'মাসের প্রথম রবিবার'। 'মাসের প্রথম রবিবার' গল্পে শ্রমজীবী মানুষের শখ- সাধের যে বাস্তবচিত্র লেখক তুলে ধরেছেন, তা শ্রমিকদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত ঋণভার-জর্জরিত সংসার থেকে পালিয়ে মাসের ওই একটি রবিবার অন্তত আশ্রয় নেবার করুণ প্রয়াস হিসেবেই চিহ্নিত। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যে প্রতিটি শ্রমিককে একান্ত করে তুলতে পারে তা 'পসারিনীর' পুষ্পলতার মধ্যে আমরা দেখেছি- যে পুষ্পলতাকে একদিন কটূক্তি, কুৎসিত ইঙ্গিত ও নোংরা প্রতিরোধ উপেক্ষা করে দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হয়েছিল।

সমরেশ বসু তাঁর 'জলসা' গল্পের মাধ্যমে শ্রমিক অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেছেন। 'জলসা' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন প্রশাসনের প্ররোচনায় মালিক শ্রেণী কিভাবে ঘৃণ্য কৌশলে শ্রমিকদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতে পারে। গল্পে একদিকে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, অন্যদিকে এগারোশো শ্রমিক ছাঁটাই, মালিকের অর্ডার নেই। শ্রমিকেরা কর্মহীন হয়ে পড়ছে। দুর্জয় প্রতিরোধে গর্জে ওঠে গল্পের চরিত্র চন্দ্রিকা, সরমা বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বড়বাবুর ওপর, সাহেবের কপালে মোটা করুনশুদ্ধ আঘাত করে স্বৈরিনী ছেদি। শেষে সংগ্রামী মানুষগুলিকে যখন পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তখন জলসাঘরে ধর্মের আফিং খাইয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে শান্ত রাখা হল। "এ আজাদী ঝুটা হ্যায়" এ কথাটা সমরেশ সুকৌশলে চন্দ্রিকাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। গল্পের শেষে একদিকে জলসা চলছে অন্যদিকে সংগ্রামী মানুষগুলোকে রাতের অন্ধকারে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ—"রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই নিঃশব্দে একটা কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল সাইনের সামনে, তারপর বেছে বেছে লোক ওঠানো হতে লাগল তাব মধ্যে। চন্দ্রিকার বহু প্রসব-বেদনায় এলিয়ে পড়েছে রে'য়াকে। চন্দ্রিকাকে তখন সিপাহীরা জোর করে ঠেলে তুলে দিচ্ছে গাড়িটাব মধ্যে।"[২]

সমরেশ বসুর 'জোয়ার ভাটা' এবং 'উজান' গল্পের বিষয়বস্তু এক ভিন্ন ধরনের। 'জোয়ার ভাটা'য় রয়েছে কর্মহীনতার সঙ্গে লড়াই, এবং হতাশা। 'উজানে' আছে নিঃসঙ্গতার সঙ্গে জীবন নির্বাহ করার প্রসঙ্গ। শ্রমজীবী মানুষের কর্মহীনতা আর অস্তিত্ব সংকটের প্রশ্নকে পাশাপাশি রেখে এক বৃহত্তর সমাজ ও জীবনজিজ্ঞাসার মুখোমুখি সমরেশ বসু পাঠকদের দাঁড় করিয়েছেন। 'জোয়ার ভাঁটা' গল্পে আমরা দেখতে পাই দিনমজুররা গঙ্গার তীরে সকালবেলা সমবেত হয় কাজ পাবার আশা নিয়ে। কিন্তু প্রতিদিন তাদের কাজ জোটে না। কোনদিন মাল ভর্তি নৌকা এলে তবে তাদের কাজ হয়, নতুবা তাদের খালি হাতে ঘুরে যেতে হয়। তাই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যত মাল ভর্তি নৌকা না এলে ততই তাদের কাজ পাবার নিশ্চয়তার সম্ভাবনা কমতে থাকে। এই কর্মহীনতা তাদের মুখের হাসি কেড়ে নেয়। এই অনিশ্চয়তা থেকে তাদের গান, হাসি ফুরিয়ে যায়, শুরু হয় নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হিংসা, মারামারি। গল্পকারের বর্ণনা—"আর নৌকো থেকে মাল খালাস করার জন্ত্র এসেছে এই মানুষগুলো। এরা দিনমজুর কিন্তু অনিশ্চিত, এদের দিনের দিন মজুরি পাওয়া, কেন না, এসব আড়তে কখনো একসঙ্গে দু'তিন দিনের কাজ থাকে না। মাল আনা আর দেওয়ার একটি কেন্দ্র মাত্র। তাই এরা ফেরে রোজ কাজের সন্ধানে, আড়তে, ইট পোড়ানো কলে, বাড়ি ঘর তৈরি কন্ট্রাকটরের ফার্মে, কাঠ-শুড়কির গোলায়। কাছে কখনো, কখনো দূরে! ওদের রোজ মজুরের নির্দিষ্ট মহল্লায় কোন কোন সময় আপনা থেকে ডাক আসে।"[৩]

কিন্তু কিছু পূর্বেই খিদের জ্বালায় অস্থির কর্মহীন যে মানুষগুলো জান্তব উন্মাদনায় পরস্পরকে আক্রমণ করেছিল, তারাই আবার সাঁঝের বেলায় "মন পবনের নাও"-এর খবরে বেঁচে থাকার সুমধুর আশ্বাস পেয়ে আবিষ্কার করল নিজেদের দানবীয় রূপের আড়ালে

সযত্নে রক্ষিত সহানুভূতিশীল হৃদয়কে। গল্পকারের "উজান" গল্পের নারান তার স্ত্রী-সন্তান খুইয়ে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও উষ্ণতা থেকে বিয়োজিত হয়ে শূন্যতাবোধের নিশ্চিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। জীবনের এই সারহীনতার মধ্যে দিয়েই জীবনের রমণীয়তার প্রতি তার ছিল বিতৃষ্ণা। নারান প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেও মানুষের প্রতি তার ছিল চরমতম অনীহা। অবশেষে একদিন তার এই নিঃশব্দ আর নিঃসঙ্গ জীবনে ছেলে নিয়ে হাজির হল এক মেয়েমানুষ" এবং গল্পের শেষে সমরেশ বসু দেখালেন যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের মৌল প্রেরণাই অনিবার্যভাবে জয়ী হয় সব নৈঃসঙ্গ্যের পরপারে।

সমরেশ বসুর প্রস্তুতি পর্বের একটি অন্যতম গল্প হল 'অকালবৃষ্টি'। 'উজান'- এর মত এখানেও রয়েছে মানব প্রকৃতির অপরাজেয়তারই প্রতি মনের অনুসন্ধান। মধ্যবিত্তের অপভ্রংশ দুটি চরিত্র ভূতেশ হালদার আর সিধু ডোম আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। 'অকালবৃষ্টি' গল্পের প্রেক্ষাপট হল শ্মশান। এ সম্পর্কে গল্পকার বলেছেন—"আগে গঙ্গার ধারে ধারে ঘাটে-অঘাটে মড়া পোড়ান হত! এখন এ গাঁ হয়েছে চটকল শহর। মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে মস্ত বড়। কোন এক চটকলের সাহেব এ শ্মশান তৈরি করে দিয়েছে। ইটে খোদাই করে ইংরেজীতে লেখা আছে, এস্ট, ১৯২৬। মস্ত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও শ্মশান। মড়া যখন পোড়ে তখন দূর থেকে মনে হয় বুঝি কোন চটকলের চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্চে। পুবদিক ঘেঁষে বটতলায় ডোমচালার মেঝেটা ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।"[৪]

ভূতেশের কাজ হ'ল মৃত্যুর হিসেব রাখা আর মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানা ফন্দি ফিকির করে মৃতের আত্মীয়দের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব টাকা উপার্জন করা। গল্পটির মধ্যে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তিসমূহের মূল্যহীনতার আভাস দেয়া হয়েছে। সিধু ডোমকে মৃতের জামা কাপড়, বিছানা, আর বকশিস ছাড়া কোনদিন কোনো মৃতদেহ উদাস করেনি। অবশেষে সিধু একদিন শ্মশানে নিয়ে এল এক 'মেয়েমানুষকে'। এই অবস্থায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ভূতেশ হালদার। ভূতেশ বলে— 'আবার তুই মেয়েমানুষ এনে তুললি শ্মশানে।' - আসলে নারী পুরুষ এক হয়েই তো সৃষ্টি করে জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য। ভূতেশ হালদার সংসারের স্বাদ পায়নি কোনদিন। নারীর কাছে সে শুধুই পেয়েছিল প্রত্যাখ্যান আর বঞ্চনা। সামাজিক ব্যবস্থায় যেখানে মানবিক চেতনার বিকাশ অপূর্ণ থেকে যায়, সেই ব্যবস্থায় পুরুষ-নারীর বাহ্যিক রূপের বাইরে খাঁটি মানুষটাকে আবিষ্কার করা অনেক সময়েই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কুৎসিত রূপের ভূতেশ তাই বিয়ে করা বউয়ের কাছে পেয়েছিল চরম অবহেলা আর লাঞ্ছনা। সেই কারণেই ভূতেশ সিধু ডোম আনীত মেয়েটিকে সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু একদিন ভূতেশকে প্রকৃতি এবং বিশ্ব-সংসারের অমোঘ আহবানে ফিরে আসতে হয়েছে সেই জীবনের কোলে। গল্পের শেষে ভূতেশ আবিষ্কার করেছে তার ভেতরের মানবিক সত্তাকে।

মানুষের অপরাজেয়তার স্বরূপ নানা দ্যোতনায় উঠে এসেছে সমরেশ বসুর গল্পে। বেঁচে থাকার সংগ্রামের পরিশুদ্ধতাই তো বিশ্বের মহৎ শিল্পের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

সংগ্রামের চেয়ে অমোঘ প্রেরণা জীবনে আর কি আছে? 'পাড়ি' গল্পে সমাজের নীচুতলার কর্মচ্যুত এক পুরুষ আর রমণীর বেঁচে থাকার সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পটি একেবারেই সমরেশ বসুর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এই গল্পে মহাজনের শুয়োরকে গঙ্গা পার করে দেবার অসীম চ্যালেঞ্জ ওই পুরুষ ও মেয়েটি গ্রহণ করে। ঊনত্রিশটা শুয়োরের জন্য ঊনত্রিশ আনা মজুরী কর্মহীন ক্ষুধার প্রেক্ষিতে অসাধারণ বাস্তব। কিন্তু শুধুমাত্র শুয়োর পার করার গল্প নয় "পাড়ি"। এ গল্প দুর্যোগের দিনে মরণপণ পাড়ি দেওয়ার লড়াইয়ের গল্প। এ গল্পে তিনি দেখান, প্রকৃতই মানুষ জীবনকে অতল অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরছে। আর মানবসমাজের উত্থানের শক্তি সেখান থেকেই। দ্বিতীয় বাক্যটি সমরেশের গল্পে বার বার বলা হয়েছে। এদের মধ্যেই তিনি উজ্জীবনকে দেখতে পান। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তিনি প্রথম থেকেই বাদ দিয়েছেন বিষয় হিসেবে নয়, উজ্জীবনের উপায় হিসেবে। গল্পের শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"খাওয়ার পর মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরশুদিনের রাত্রের মত ওদের দুজনের রক্তে ডাঁটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।"[৫]

জীবনের বহু আপাত-উপেক্ষার যোগ্য অসংখ্য মালমশলা সমরেশ বসু তাঁর গল্পের মধ্যে ধরে রেখেছেন। বিশেষ করে সমাজের নীচুতলার মানুষদের জীবনের প্রায় কোনো কিছুই তিনি চিত্রিত করতে কার্পণ্য করেন না। 'প্রত্যাবর্তন' এরকমই সমাজের নীচুতলার তথা অন্ধকার গলির একটি মেয়ের জীবনের এক অসাধারণ মানবিক চিত্তবৃত্তির কাহিনী।

অন্ধকার শ্বাসরুদ্ধ এক গলির বাসিন্দা ঠান্ডারাম। তার চার ছেলে দুই মেয়ে নবা, কেষ্ট, কেলো, শেলী এবং বাসন্তী ও হারানী। একটি বউও আছে। তাদের জীবিকার্জনের জন্য ঝি-গিরি, রিক্সা চালানো, মজুর খাটা, কাঠ মিস্ত্রির কাজ ইত্যাদি করতে হয়, তার ওপর সংসারের কর্তব্য। ঠান্ডারামের আছে মদের নেশা। আর সংসারে অভাবের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে আছে ঝগড়া, মারামারি। এ হেন সংসারে বাসন্তী তার বয়স এবং স্নেহ সহানুভূতি দিয়ে একটা শান্তির আবহাওয়া ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। বাসন্তীকে ঘিরে অভাবের সংসারটায় যেন নতুন করে জীবনের একটা পরিচ্ছন্ন বিকাশ ঘটতে লাগল। যারা সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে হাতাহাতি লাথালাথিতে মত্ত জানোয়ারের মত আচরণ করত, তারাই এখন বাসন্তীর হাতে গড়া রুটি আর চা নিশ্চিত আরামে গল্প করতে করতে খায়। একদিন বাসন্তীর জীবনে আসে তাঁর নিজের স্বপ্নের জগতকে বাস্তবে রূপায়িত করবার ডাক। তার ভালোবাসার মানুষ তাকে নিয়ে সংসার গড়তে চায়। বাসন্তী বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু বেরিয়েই তার মনে পড়ে ফেলে আসা সংসারের অসহায় মানুষগুলোর কথা। যাদের বেঁচে থাকবার অবলম্বন সে নিজে। বাসন্তীর আর পবনের সঙ্গে চন্দননগরে গিয়ে ঘর বাঁধা হয় না। সে আবার ফিরে চলে সেই গলির অন্ধকার সংসারে। যেখানে অতগুলো মানুষের মনের অন্ধকারকে সেই একমাত্র পারে আলো দিয়ে ভরিয়ে দিতে। গল্পকারের অসামান্য জীবনদৃষ্টির

প্রশংসা না করে পারা যায় না।

বারবিলাসিনীদের জীবনযন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিতান্ত আকস্মিকভাবে এক পতিতার ঘরে ঢুকে পড়ে সমরেশ বসু 'প্রাণপিপাসা' গল্পের উপকরণ পান। তিনি চিরকালই প্রতিরোধের কথা, জীবন সংগ্রামের কথা বলতে ভালোবাসেন। এই জীবনপিপাসাই পরিণত শিল্প সুষমায় দেখা গেছে 'প্রাণপিপাসায়'। এই গল্পে একজন দেহোপজীবনী নারী ও সমাজের নিকৃষ্টতম শ্রমিকের রূপ ধরা পড়ে। কিভাবে একটি সাধারণ বারাঙ্গনা অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, কিভাবে একটার পর একটা মানবিক গুণের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটে সেই স্বার্থপর লোকটির মধ্যে, যে কিনা তার মৃত বন্ধুর টাকা নিয়ে ক'দিন আরাম ও আয়েসে কাটাবে স্থির করেছিলতাই গল্পকার এই গল্পে দেখিয়েছেন। এমন জটিল অথচ সংবেদনশীল বিষয়ের সযত্ন চিত্রণে সমরেশ বসুর মুন্সীয়ানা অতুলনীয়। যে শ্রমিক বন্ধুর পুঁটলিটা (যার মধ্য টাকা আছে!) সামলে রেখেছিল এতটা দুর্যোগের পথে, সেই ভোরে চলে যাবার সময় পুটলিটা দিয়ে যায় সেই বারাঙ্গনা মেয়েটিকে।

'মানুষ রতন' গল্পে মানবীয়তার সংকটে জর্জরিত ত্যাবড়া জগা, পুনিয়া, সোতে আর যমুনারা হাজার প্রমত্ততা আর প্রতারণার ক্লেদ স্রোতে জীবনের অনিঃশেষ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেও গল্পের শেষে ওদের প্রতারণা আর উন্মাদনার উৎস বেওয়ারিশ মৃতদেহটাকে যমুনার বাবা হিসাবে চেনার পর ওরা আবিষ্কার করে নিজেদের ভেতরকার মনুষ্যত্বকেও। শত বিপর্যয়ে, শত দলনে- পেষণেও যা শেষ হবার নয়। চণ্ডী ডোম তাই মন্তব্য করে 'কাদ, সবাই কাঁদ। কাঁদলে জ্বালা জুড়োয়'।

এইভাবে সমরেশ বসু তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পের মধ্যে দিয়ে সমাজের নীচু তলার মানুষের জীবন ও জীবিকার করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। শ্রমিক সম্প্রদায়ের সংগ্রাম, লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে মানুষের টিকে থাকা এবং জীবনের মূল্যবোধের দিকটিকে সমরেশ বসু তাঁর ছোটগল্পে আলাদা মাত্রায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

**তথ্যসূত্র :**

১) স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প,সমরেশ বসু,মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, বৈশাখ ১৩৭০, আইন নেই- পৃষ্ঠা-১২

২) স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প,সমরেশ বসু,মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, বৈশাখ ১৩৭০, জলসা, পৃষ্ঠা-৮

৩) সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭, ১৯৬১ জোয়ারভাটা, পৃষ্ঠা-১৬৬-৬৭

৪) সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭, ১৯৬১, অকাল বৃষ্টি, পৃষ্ঠা-১৭

৫) সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭, ১৯৬১, পাড়ি, পৃষ্ঠা-৬১

# যে জীবন দেখে না কেউ ফিরে: 'মরেছে প্যাল্লা ফরসা'

অনসূয়া কুণ্ডু

**সারসংক্ষেপ :** জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি কতটা নিবিড় হলে কথাসাহিত্যে তা স্থান পায়, তা সমরেশ বসু রচিত 'মরেছে প্যাল্লা ফরসা' গল্প পাঠে স্পষ্ট। এই গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বৃহত্তর সমাজের নির্মম সত্য প্রকাশ পেয়েছে, যা একই সঙ্গে সমকালীন ও চিরন্তন। সাংসারিক অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও, বস্তির পুতি-গন্ধময় নিকৃষ্ট জীবন বর্ণনায় যাঁর লেখনি আকাশচুম্বী সাফল্য পেতে পারে; তিনি এককথায় জিনিয়াস। পিতা-মাতার দেওয়া আসল নাম ছিল সুরথনাথ। বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাম দেন সমরেশ। পরবর্তীকালে অমৃত কুম্ভের স্রষ্টা হয়েছিলেন 'কালকূট'। বাল্য বয়স থেকেই ছিলেন ছন্নছাড়া এক বাউল প্রাণ। পরবর্তীকালে এই সব শৈশবের অভিজ্ঞতা সুযোগ পেলেই চিত্রিত হয়েছে জীবনশিল্পী সমরেশ বসুর গল্পে ও উপন্যাসে। সুখী মধ্যবিত্ত জীবনকে উপেক্ষা করে যন্ত্রণাবিদ্ধ বিষাক্ত জীবন রস পান করেছেন যে মানুষটা 'কালকূট' ছদ্মনাম তাকেই মানায়। তাঁর রচনাগুলি তাই শুধু লেখার জন্য লেখা নয়; নিবিড় জীবন অনুভবের দৃঢ় প্রত্যয় ধরা পড়েছে সেখানে। 'মরেছে প্যাল্লা ফরসা' তাঁর রচিত এমনই একটি ছোটগল্প; যেখানে পিতা-মাতাহীন নিরাশ্রয়ী শিশুদের জীবন যন্ত্রণার মর্মান্তিক রূপ তুলে ধরেছেন লেখক।

**সূচক শব্দ :** চিরন্তন, আকাশচুম্বী, ছন্নছাড়া, যন্ত্রণাবিদ্ধ, জীবনশিল্পী, আর্নজাতিক শিশুবর্ষ।

**মূল বক্তব্য :** 'মরেছে প্যাল্লা ফরসা' সমরেশ বসু রচিত একটি ছোটগল্প; কিন্তু এই জাতীয় গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বৃহত্তর সমাজের নির্মম সত্য প্রকাশ পায়, যা একই সঙ্গে সমকালীন ও চিরন্তন। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি কতটা নিবিড় হলে কথাসাহিত্যে তা স্থান পায়, একথা যিনি স্রষ্টা তিনিই সবচেয়ে ভালো বোঝেন। তদুপরি, সাংসারিক অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও, বস্তির পুতি-গন্ধময় নিকৃষ্ট জীবনচর্যায় যার লেখনি আকাশচুম্বী সাফল্য পেতে পারে; তিনি এক কথায় জিনিয়াস!

কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর নাম উঠলেই সাধারণ পাঠকের মনে আসে তাঁর রচিত 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'দেখি নাই ফিরে' এইসব বহুল প্রচলিত উপন্যাসগুলি। গল্পের ক্ষেত্রে 'আদাব' জনপ্রিয়তার শীর্ষে। অসংখ্য পরিমাণ গল্প ও উপন্যাস সমরেশ বসু লিখেছিলেন, কারণ একমাত্র লেখাই ছিল তার পেশা। ১৯৪৬-এ 'আদাব' গল্পের মধ্যে দিয়ে তাঁর পরিচিতি। পিতা-মাতার দেওয়া আসল নাম ছিল সুরথনাথ। বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাম দেন সমরেশ। পরবর্তীকালে অমৃত কুম্ভের স্রষ্টা হয়েছিলেন 'কালকূট'।

সুরথনাথ বাল্য বয়স থেকেই ছন্নছাড়া এক বাউল প্রাণ। প্রথাগত পড়াশোনায় তার মন

বসে না। স্কুল ছুটি করে ঘুরে বেড়ায় বুড়ি গঙ্গার তীরে, কখনো শ্মশানে, কখনো 'রমনা'র ধানমণ্ডির মাঠে, কখনো আবার বাল্য সাথী রাজলক্ষ্মীর হাত ধরে রাম-সীতার মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে অনুভব করে বাল্য প্রেমের আকর্ষণ। বুড়িগঙ্গার চোরা স্রোত ও মোহনার টানে বারবার ঘরছাড়া হয়েছে; এমনকি নৈহাটিতে গঙ্গার তীরে এসেও তার সেই পথ চলা থামেনি। লালন ফকিরের কথায়—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরসী নগর,
এক পড়শী বসত করে।"

সুরথনাথের বাবা ও ছোটকাকা দুজনেই ছিলেন বাউন্ডুলে চিত্রশিল্পী। বাবা মাঝে মাঝে পাঁচালী গান করতে বাইরে চলে যেতেন। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত আবেগসম্পন্ন খামখেয়ালি মনের পরিচালনায় সুরথনাথের জীবন ভাবনার পালে লেগেছে উল্টো হাওয়া। একদিন বুড়ি গঙ্গার তীরে নদীর স্রোত আর বিভিন্ন লোকজনের যাওয়া-আসা দেখতে দেখতে সর্বহারা ভিখিরীদের মতন 'বাবু একটা পয়সা দ্যান' বলে ভিক্ষা চাইতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ঘোরের মধ্যে নিজের অজান্তে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং এক পরিচিত মানুষের কাছে হাত পেতেছিলেন মাত্র দশ বছরের বালক সুরথনাথ। এই সময় স্কুলে না গিয়ে পরিত্যক্ত আবর্জনাময় শ্মশানে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সব শৈশবের অভিজ্ঞতা সুযোগ পেলেই চিত্রিত হয়েছে জীবনশিল্পী সমরেশের গল্পে ও উপন্যাসে।

মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। নিজের দিদি ও দাদাদের দেখেছেন কেবল স্বার্থের জন্য পড়াশোনা করতে, তাই নিজের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও আকর্ষণ অনুভব করেননি। তাদের বাড়িতে রাজনৈতিক সশস্ত্র বিপ্লবীরা ভাড়া থাকায় রাজনীতির স্বার্থত্যাগ এবং দেশকে ভালোবাসার মন্ত্র অঙ্কুরিত হয়েছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। বিপ্লবীদের খোঁজে তাদের বাড়িতে ঢুকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলেও; বালক সমরেশ কখনো মুখ খোলেননি, পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিত এভাবেই শক্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেও বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তার থেকে বয়সে ৪ বছর বড় গৌরী দেবীকে বিবাহ করে একক সংসার পাতার সময়, অল্প পয়সায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে হয়েছে নৈহাটির বস্তিতে। বাড়ির অমতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করায় চূড়ান্ত দারিদ্রের মধ্যে পড়তে হলেও নিটোল জীবনীশক্তি আর কলমের জাদুতে সমরেশ হয়ে উঠলেন কালকূট। সুখী মধ্যবিত্ত জীবনকে উপেক্ষা করে যন্ত্রণাবিদ্ধ বিষাক্ত জীবন রস পান করেছেন যে মানুষটা- 'কালকূট' ছদ্মনাম তাকেই মানায়। তাঁর রচনাগুলি তাই শুধু লেখার জন্য লেখা নয়; নিবিড়

জীবন অনুভবের দৃঢ় প্রত্যয় ধরা পড়েছে সেখানে। একজন পরিচিত জীবনমুখী গায়কের গানের কথায় আছে শুধু বিষ, শুধু বিষ দাও, অমৃত চাইনা। অমরত্বের লোভ করুক বিক্ষোভ, জীবনকে যদি দাও নীল বিষাক্ত ছোপ, থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না, ক্ষোভ। (নচিকেতা চক্রবর্তী)

তবুও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষোভ-ঘৃণা, অপ্রাপ্তি-হতাশা শিল্পী সাহিত্যিকের কলমে চাপা থাকে না। সুযোগ পেলেই তা নতুন কোনও আঙ্গিকে অজস্র সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে চায়। এভাবেই ছোট বড় ঢেউগুলি হয়ে ওঠে গল্প কিংবা উপন্যাস। এমনই একটি ছোট্ট ঢেউ সাহিত্যকার সমরেশ বসুর লেখা গল্পে ধরা পড়েছে; গল্পটির নাম 'মরেছে প্যাল্লা ফরসা'।

**গল্পের বিষয়বস্তুর ক্রম বিন্যাস:**

ক. ভারতের ৩২ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে চারিদিকে মহাসমারোহ।

খ. দেশ জোড়া গণতন্ত্রের উৎসবের পাশাপাশি আজই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ।

গ. এমন দিনে আধ ন্যাংটা কয়েকটি বাচ্চা মিলে বাঁশে করে প্যাল্লা ফরসার লাশ নিয়ে যাচ্ছে।

ঘ. প্যাল্লা ফরসা অনাথ পথশিশু। ওর মত আরো অনেকে মিলে থাকে গঙ্গার ধারে খাল নর্দমার জঞ্জালে ঘেরা পোড়ো চাতালে।

ঙ. প্যাল্লা আজ মরে গেছে। একজন দোকানদার তাকে দু-মুঠো মুড়ি চুরি করার জন্য লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে।

চ. থ্যাতলা ইঁদুরের মতো মুখ থেকে রক্ত আর কষ ঝরে পড়তে পড়তে প্যাল্লা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে তার সঙ্গীদের সামনে।

ছ. তাকে ঘিরে রয়েছে আরও অনেক ছোট বয়সের (৮-১৪ বছর) পথশিশু।

জ. প্যাল্লাদের দলে সব থেকে বড় পথশিশুর নাম চটা। তারা সারাদিন ভিক্ষা করে যা পায় সেই পয়সা জড়ো করে রাতে খাবার কিনে খায়।

ঝ. ওরা বাজার, স্টেশন, আর সিনেমা হলে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়। আধ-পয়সা, এক-পয়সা যে যতটুকু পায়; তা কোমরে বেধে নিয়ে দুপুরে চাতালে ফিরে আসে, নিজেদের মধ্যে গল্প করে।

ঞ. ওদের গল্পের বিষয় বাবুরা বা দোকানদারেরা কে কিভাবে ভিক্ষা দেবার সময় আচরণ করল, কি কথা বলল! এবং ওরাই বা কিভাবে ভিক্ষাটা আদায় করল।

ট. ওরা বাজারে ঢুকে খই, চিড়ে, বাতাসা চুরি করে খাওয়ার জন্য দোকানিরা দেখতে পেলেই ডান্ডা উচিয়ে মারে আর কাঁচা খিস্তি করে।

ঠ. দুপুরে আড্ডার পর ওরা আবার বেরিয়ে পড়ে। ভিক্ষার পয়সা একত্র জড়ো করার

জন্য ওরা রেললাইনের সাইডিং এ ফাঁকা জায়গায় যায়। সব পয়সা গুনে এক জায়গায় করে, যেকোনো হোটেল থেকে খাবার কিনে খায়।

ড. রাতে খাবার খেয়ে, স্টেশনের জল পান করে, আবার নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসে। একসাথে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে কোনমতে।

ঢ. এভাবেই ওদের দিন-রাত কেটে যেতে যেতে দোকানির হাতে মার খেয়ে প্যাল্কা মারা যায়। ওদের দলের অন্যান্য সদস্যরা শুনেছিল দুটো মুড়ি চুরি করে খাওয়ার দায়ে কদমবাবু প্যাল্কাকে লাঠির ঘায়ে মেরেছে।

ণ. দারোগা পুলিশ সেই কথা অস্বীকার করে কদমকে ছেড়ে দিল; আর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মরা সৎকার করিয়ে নিল ওই অনাথ অবুঝ শিশুগুলোকে দিয়েই।

ত. জীবনে প্রথম মরা পোড়ানোর আনন্দে অনাথ পথচারী শিশুদের দল মেতে উঠলো করুণ উল্লাসে। বাঁশে বেঁধে প্যাল্কার লাশ নিয়ে চলল মৃত্যুর পরের দিন, সেদিন ছিল স্বাধীনতা দিবস।

থ. চারিদিকে খুশির পরিবেশ, সেই আবহে পথশিশুর দল লাশ নিয়ে হট্টগোল করতে করতে চলেছে শ্মশানের দিকে। গল্পের শেষে তীব্র বিদ্রুপের সুরে লেখক জানিয়েছেন আজ আন্তর্জাতিক শিশু দিবস।

গল্পটি সীমিত পরিসরে লেখা হলেও; এর কাহিনি ভাবনায় লেখকের শৈশব ও যৌবনকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। মূল গল্পটির বয়ান নির্মাণের সময়; বিভিন্ন চরিত্রের মুখের ভাষা ও তাদের অবস্থান ষোল আনা খাঁটি। এই গল্পের মধ্যে চারটি কমন ফ্যাক্টর পাওয়া যায়, যা নিশ্চিতভাবেই লেখক জীবনের দৃঢ় প্রত্যয়। আমাদের আলোচিত গল্পের সেই চারটি কমন ফ্যাক্টর হল

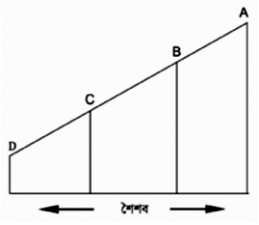


A = নিরাপত্তাহীনতা

B = সর্বহারা শিশু

C = বস্তির জীবন

D = স্বাধীনতার মিথ্যাচার

সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের অগোচরে কত অনাথ শিশুর জীবন সংগ্রাম চলতে থাকে সেই খবর কেউ খুব একটা রাখে না। নিয়মাধীন সমাজচিত্রের বাইরেও এমন অনেক বিচ্ছিন্ন নোংরা জীবনের ছবিও থাকে। আলোচ্য গল্পে সেই জীবনের একটুকরো ছবি ধরা পড়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হল

চিত্র ১ — "আট দশ থেকে পনেরো বছরের, খালি গায়ে ধুলা কাদা মাখা বেশে সব ছেঁড়া ঝোল ঝাপ্‌পা পাতলু ইত্যাদি পরে আধ ন্যাংটার দল। একটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা, একটা ছেলের মড়া কাঁধে বয়ে, রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে, আর চেঁচাচ্ছে, 'মরেছে প্যাল্লা ফরসা, দে হরিবোল'।"[১ (B)]

চিত্র ২ "হা ঘরে ভিখিরি, শহরের আপদগুলোর ধ্বনি আর নাচের তালে, অনেকেরই শরীরে তাল লেগে যাচ্ছে। হাসছে কেউ, অবাক কেউ। শহরের যত খুদে আপদ, নেংটি ইদুঁরের বাচ্ছাগুলো এ আবার কি সঙ বের করেছে? সত্যি মড়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নাকি মজা মারছে।"[২(B)]

চিত্র ৩ "শহরের যে খাল নর্দমাটা গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, যার দুপাশে ঘিঞ্জি শরের খাটা পায়খানা বাড়ি বাজারের পিছন দিকে, যত নোংরা জল আবর্জনা ভেসে যায়, তারই ধারে কোন এক কালের একটা পুরানো ধসে পড়া বাড়ির জঙ্গল ঘেরা চাতালে, লোক চোখের আড়ালে, ওদের একটা আস্তানা আছে।"[৩ (C)]

চিত্র ৪ "বাঁদিকে, খাল নর্দমাটার পাড় বাঁচিয়ে বেশ্যাপল্লী। জুয়ার আড্ডা বেআইনি মদ চোলাইয়ের কারখানা। যেটুকু পাড় বাঁচিয়ে রেখে শহরের এই অংশ মৌমাছির চাকের মত জমে উঠেছে, সেই পাড়টুকুতে যে কোন বয়সের মেয়ে পুরুষই প্রস্রাব পায়খানা করে। নোংরা জঞ্জাল তাদেরও কিছু কম না। সবই খাল নর্দমার ধারে জমা হয়। তারই পাশ কাটিয়ে ময়লা নোংরা মাড়িয়ে, প্যাল্লা ফরসাদের পোড়োয় যাবার আস্তানা।"[৪ (C)]

চিত্র ৫ "পাহারাদারকে ডেকে এনে, তারপর যে যার ভিক্ষের ঝুলি ঝোলকৌটা খোলে। একটা খবরের কাগজ পেতে, তার ওপর সব ঢালে। মুড়ি, চিঁড়ে, ভাঙা বিস্কুটের টুকরো, পাঁউরুটির টুকরো, বাবুদের মুখের থেকে ছুঁড়ে দেওয়া সিঙারা, নিমকি, জিলিপি, গজা, এমন কি রসগোল্লা সন্দেশের কুচিও তার মধ্যে থাকে।"[৫(A)]

চিত্র ৬ "কাকে কার বাপ মা এ শহরে ছেড়ে গিয়েছে, মনে করতে পারে না। কতটুকু বয়সে কে এই শহরে এসেছিল, মনে নেই। বাজারের ধারে, ইস্টিশানে, রাস্তার ধারের দোকানের ঝাঁপের তলায় থাকতে থাকতে ওরা এ বয়সে পৌঁছেছে।"[৬ (A)]

চিত্র ৭ "তারপর এল একজন লাঠিধারী সেপাই। সেপাই এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?' ওরা সেপাইকে যা জবাব দিয়েছে, সেপাইকেও তাই বলল, 'কদম সা মেরেছে'। সেপাই ডাণ্ডা তুলে বলল, 'বাজে কথা বলিস না। কদমবাবুর খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। চল থানায় নিয়ে চল। রাস্তায় ভিড় করা চলবে না।"[৭(A)]

চিত্র ৮ "সেপাইটা প্যাল্লাকে এখানে নিয়ে আসতে বলল কেন? থানায় কদম সার দল এসে কি করল? কি কথা হল? থানার দারোগাবাবু কি বললেন? শুভদিনের আগে মেঘলা রাত্রে, ওদের জিজ্ঞাসার জবাব দেবার কেউ ছিল না।"[৮(A)]

চিত্র ৯ "সেপাইটি রিক্‌শা থেকে নেমেই একটা গালাগাল দিল, 'কুত্তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না।' তারপর চারিদিকের ভিড়ে একবার শাসানো নজর বুলিয়ে চটাকে হাত তুলে ডাকল, 'এই ছোঁড়া, এদিকে আয়।' চটা উঠে তার কাছে গেল। সেপাই একটু সরে গিয়ে বলল, 'ওই মড়াটাকে পোড়াতে হবে বুঝলি?"[৯(B)]

চিত্র ১০ "আশেপাশে বাবু মা আর খোকা খুকুদের ভিড়। হলের মধ্যে ঢোকাবার জন্যে আকুঁপাকুঁ করছে। শুধু হলের মাথার লাল কাপড়ের ওপর সোনালী অক্ষরের লেখাগুলো ওরা পড়তে পারল না। সেখানে লেখা ছিল, আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ"?[১০ (D)]

উপরিবর্ণিত চিত্রগুলির মধ্যে আপাতক্রমিকভাবে A = 4 – B = 3 – C = 2 – D = 1 এই প্রকার বাস্তব বর্ণনার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে কোনো পাঠক তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে এই সংখ্যাগুলির রদবদল হতে পারে। কিন্তু, গল্পের মূল ভাবনার অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে লেখক পথহারা অনাথ শিশুদের নিকৃষ্ট জীবনযাপনের মূলে দেশের নীতি নির্ধারণকারী মানুষগুলোর ব্যর্থতাকে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে এসেছে ভারতের ৩২ তম স্বাধীনতা দিবসের কথা। কিন্তু লেখক প্রচ্ছন্নভাবে বলেছেন, এই স্বাধীনতা সমাজের কাছে সঠিক মূল্যবোধের অন্তরায় হয়ে উঠেছে। সেই কারণে স্বাধীনতার সংরক্ষক যারা অর্থাৎ দেশের বিচার ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসন, সমাজকর্মী, সামাজিক নেতৃত্ব, ব্যবসায়ী, অথবা শিক্ষিত বাবুদের দল কেউই ইতিবাচক নয়। অতএব প্যাল্লা ফরসাদের দল মনুষ্য পদবাচ্য হয়ে ওঠেনি। পিতা-মাতার প্রেমের স্পর্শ হতে বঞ্চিত, শৈশব চুরি যাওয়া শিশুদের গল্প বলতে গিয়ে তাদের অদ্ভুত নামচয়ন করেছেন লেখক লুকা, চেনো, রাম, বগ্‌গি, চটা, কেডোর বন্ধু প্যাল্লা ফরসা। সরকারি সেপাই তাদের সম্বোধন করে 'কুত্তার বাচ্চাগুলো' বলে। শহরের বাবুরা শিক্ষিত সচেতন! তাদের মনে হয় এইসব বাচ্ছাগুলো 'নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা'। প্যাল্লার শবদেহ নিয়ে যাবার সময় বড় রাস্তার ওপর ছুটে এসে কয়েকজন নানা বয়সের বাবুরা হেঁকে বললো "এই চুপ। এখানে তোরা ও সব হাঁক ডাক বাচলামো করবি না। মুখ বুজে চলে যা। এগিয়ে গিয়ে যত খুশি হরিবোল দে।"[১১]

এই আধিপত্যশীল (Dominating) মানসিকতা ছোট ছোট পথশিশুগুলিকে একেবারে স্তব্ধ করে দিল। মুহূর্তের মধ্যে তারা প্যাল্লার শবদেহ কাঁধে করে নিয়ে যাবার উচ্ছ্বাস তিরোহিত হয়ে নিঃশব্দে পার হয়ে গেল সিনেমা হলের সামনের রাস্তাটুকু। কারণ সিনেমা হলের সামনে তখন গম্‌গমে উৎসবের মেজাজ। মা বাবার হাত ধরে এসেছে তথাকথিত

সত্য বাড়ির শিশুরা। তাদের আজ পরিবারের সাথে আনন্দ করার দিন। প্রশাসন তৎপর স্বাধীনতা দিবসের দিনটিকে নির্বিঘ্নে নান্দনিক ভঙ্গিতে উদ্‌যাপন করানোর জন্য।

এই গল্পের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল গণতন্ত্রের নামে রাজনৈতিক মিথ্যাচার। রাজনীতির অঙ্গুলিহেলনে দেশবাসীর উৎসব, আনন্দ, উৎসাহের ঢক্কানিনাদ। কারণ, দেশের রাজা প্রধানমন্ত্রী আজ গণতন্ত্রের বিজয় দিবস ঘোষণা করেছেন। রাজাকে প্রসন্ন করার প্রচেষ্টায় আজ গোটা দেশ ব্যস্ত :

"আজ যে-যাই বলুক বা বলুন, গণতন্ত্রের আসন্ন বিপদের সংকেত দেখা দিয়েছে 'দেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে' কিন্তু আজ আনন্দের দিন। আজ পতাকা ওড়বার দিন, গৃহস্থেরাও সন্ধ্যা পর্যন্ত পতাকা ওড়াতে পারে, আজ রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবীদের বিশেষ ব্যস্ততার দিন, বিশাল বোঝা বহন করবার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার দিন, তথাপি আজ বড় আনন্দের দিন। কারণ এই বছরটা আর্নজাতিক শিশুবর্ষ, অতএব আজ আলিপুরের চিড়িয়াখানা শিশু উদ্যানে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত খোকাখুকুদের বিনা পয়সায় ঢুকতে পারা থেকে শহরের গ্রামে গঞ্জে তাবৎ বাচ্ছাদের মিষ্টি খাওয়াবার দিন, নানা রকম খেলাধুলা, ছবি আঁকা ইত্যাদির হারজিতের দিন, নানা রকম কুচকাওয়াজের দিন, ভবিষ্যতে তারা কি হবে বা হতে যাচ্ছে, সে-কথা ওদের মনে করিয়ে উপদেশ দেবার দিন।"[১২]

গল্পের শুরুতেই স্বাধীনতার ৩২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৫ই আগস্ট দিনটিকে একটি উল্লাসময় আনন্দের দিন বলে উদযাপন করার টুকরো ছবি আছে। এই আনন্দে সামিল হয়েছে বাচ্ছা থেকে বুড়ো সকলে। তবে সর্বোপরি এই বছর আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পড়ে যাওয়ায় দিনটির মাহাত্ম্য যেন বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। লেখক স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন শিশুরাই দেশের সম্পদ। শিশুদের হাসি খেলা আনন্দ কেড়ে নেওয়াটা কখনোই উচিত নয়। দেশের স্বাধীনতার মতোই শিশুরাও যেন স্বাধীনভাবে থাকতে পারে সেদিকে সকলের নজর দেওয়া প্রয়োজন। শৈশব অবস্থায় নিজের জীবনের চঞ্চল মুহূর্তগুলো সমরেশ বসুর ভাবনায় ফল্গুধারার মতো বহমান ছিল বলেই, এই গল্পে শিশুদের মনস্তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। শিশু দিবসের প্রাসঙ্গিকতায় সমাজের নির্মমতার প্রতিচ্ছবি হুবহু চিত্রিত করেছেন। স্বাধীন ভারতে শিশুদের খাবার অধিকার, থাকার অধিকার, বস্ত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও; স্বাধীনতা দিবস পালনের উল্লাসে মাততে কারোর কোন ক্ষতি নেই। আশ্রয় ও শিক্ষা-দীক্ষাহীন শিশুদের কোন অধিকার নেই বেঁচে থাকার। নোংরা আবর্জনার স্তূপের মধ্যেও ওরা শান্তিতে থাকতে পারে না। অন্য দলের মস্তান রয়েছে; ওদের ভিক্ষার রোজগার কেড়ে নেয়, মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। সমাজে ওদের কথা ভাববার মতো কেউ নেই। ওদেরকে সবাই নিকৃষ্ট ভাষায় গালাগাল দেয়, কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের জীবনকে জীবনের চোখ দিয়ে দেখেছেন সমরেশ বসু। নিজের কলমের ডগায় ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পের বাস্তবতা; এখানেই গল্পটির সার্থকতা।

**তথ্যসূত্র :**

১. সমরেশ বসু, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ:২৯৪।
২. তদেব, পৃ:২৯৫।
৩. তদেব, পৃ:২৯৫।
৪. তদেব, পৃ:২৯৫।
৫. তদেব, পৃ:২৯৬।
৬. তদেব, পৃ:২৯৭।
৭. তদেব, পৃ:৩০০।
৮. তদেব, পৃ:৩০১।
৯. তদেব, পৃ:৩০১।
১০. তদেব, পৃ: ৩০২।
১১. তদেব, পৃ:৩০২।
১২. তদেব, পৃ:২৯৪।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :**

১. নিতাই বসু, 'সমরেশ বসু', গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৫।
২. বারিদবরণ চক্রবর্তী, 'সমরেশ বসু: জীবন ও সাহিত্য', শিলালিপি, কলকাতা, ২০০৬।
৩. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সমরেশ বসু: সময়ের চিহ্ন', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৭।
৪. হিতেন্দ্র মিত্র, 'সমরেশ বসু মুক্তি পন্থার সন্ধান', প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৫।

## সমরেশ বসুর 'নররাক্ষস' : অতীতচারী এক নররাক্ষসের জীবনদর্শন

শোভা সাঁতরা

**সংক্ষিপ্তসার:**

স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে কথাসাহিত্যিকরা বাংলা ভাষায় নিজেদের স্থান সুচিহ্নিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বগ্রগণ্য ছিলেন সমরেশ বসু। 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৪৬ এর শারদীয় সংখ্যায় 'আদাব' গল্পটির প্রকাশ তাঁকে পাঠক-সাধারণের কাছে পরিচিত করলেও সেদিন তিনি ছিলেন তরুণ লেখক। পরবর্তী চার দশক জুড়ে বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক আলোচিত লেখক তিনিই। তিনি এমন একজন লেখক ছিলেন যিনি বারবার প্রথাসিদ্ধ প্রত্যাশাকে প্রশ্ন করতে জানতেন। বারবার তার উপলব্ধিগত বিশ্বাসের, এমনকি সংশয়ের ক্ষেত্রেও যা সত্য বলে প্রভাবিত হয়েছে তাকে লেখায় অভিব্যক্ত করতে দ্বিধা করতেন না। এমনই একটি গল্প 'নররাক্ষস'। 'নররাক্ষসে' কারিগরি দক্ষতা ও গভীর অভিনিবেশের আশ্চর্য সংমিশ্রণ অবশ্যই স্বতন্ত্র আলোচনা দাবি রাখে।

**সূচক শব্দ:** নররাক্ষস, হিংস্র, প্রতীক্ষা, পূর্ণাঙ্গ, সান্নিধ্য, গার্হস্থ, উন্মোচন, অনুষঙ্গ

**মূল আলোচনা :**

গল্পটি শুরু হয় অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে: "নররাক্ষস! নররাক্ষস এসেছে! আগেই বলেছি, হুঁশিয়ার! এখানে নররাক্ষস এসেছে'..."[১] মাঘ মাস শীতের সকালে মিনতি স্টোভে চা বানাচ্ছে। মিনতির স্বামী তারক দাড়ি কামাচ্ছে। দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। শীতের সকাল, রাঢ় অঞ্চলে দিগন্তবিস্তৃত সদ্য ধান কাটা শেষ করেছে চাষীরা। মাঘের সকালে গ্রামের লোকেরা রৌদ্রের উত্তাপের সঙ্গে তাদের নানা টানাপোড়েন কথা বলতে থাকেন। আর টেলিগ্রাফের তারের ফিঙের ক্বচিৎ ডাক, ধান কাটা মাঠে বনচড়াইদের ঝাঁকে ক্ষুধাতৃপ্ত পাখিদের খুশির শিস শোনা যাচ্ছে। দূর নিরালায় ছোট এক স্টেশন, দুটি-একটি দোকান, দুটি রেলকোয়ার্টার দেখা যাচ্ছে। লেখক রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম ইত্যাদির বর্ণনা করতে করতে তারক-মিনতির বর্তমান যৌনজীবনের ইঙ্গিত দিয়ে দেন। সদর বন্ধ, স্বামী সান্নিধ্যের নিরালায় মিনতি শাড়ি অগোছালো, জামার বোতাম খোলা। "এখন স্বামীর কাছে আর গোপনতার ঢাকাঢাকি নেই, ঔদাস্যই সুন্দর, যেহেতু সন্তানেরা ও স্বামী সকলেই এই দেহকে ঘিরেই রকমে রকমে বিকশিত!"[২] এই দূরে নিরিবিলি নিরুদ্বেগ সংসারে খুশি স্বাধীনভাবে ছড়িয়ে আছে ছাব্বিশ সাতাশে—মিনতির স্বাস্থ্যে। মিনতির খোলা বুকে কয়েকটি রঙের দাগ দেখা যায়, সেগুলি আসলে ছোটো মেয়ের নখে লাগানো কুমকুমের দাগ।

নররাক্ষস আগমনের ঘোষণার পুণরাবৃত্তিতে ক্রমশ যেন গভীর স্থির জলের নিচ থেকে বুদবুদ ওঠার মতো অতীতের পাক ঘুরতে থাকে। এবং অতীত সম্পর্কে তারক ও মিনতির ভিন্ন মনোভাব প্রথম থেকেই অত্যন্ত স্পষ্ট।

"তারক বলে উঠল, আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে, সত্যি বলছি, মিনতি যেন আচ্ছন্ন, নিবিড় হাসি হেসে বলল, "আর আমার যে কত কথা মনে পড়ছে, উঃ!"[৩]

তারক অতীতকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে স্থাপন করতে পেরেছে, কিন্তু মিনতির সত্তার সঙ্গে তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এক শীতের সকালে সেটা আবিষ্কার করে সে বিহ্বল, আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

বাউরি বউ ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, বড় মেয়ে রাণু তার পিছন পিছন ঘুরছে, তারক 'পোয়াভর ওজনের' ফটকিরি গালে বোলাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে সাসপেন্স জমে ওঠার পর মিনতির মুখ দিয়ে প্রশ্নের ছলে প্রায় নাটকের মত লেখক জানাচ্ছেন প্রধান তথ্যটা: "কি গো তোমার মেয়েই যে নররাক্ষস চেনে না।" এবং তারপর "এখন আর পারবে?"[৪]

আমরা লক্ষ করি মিনতির মধ্যে ইতিমধ্যেই বিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, নিস্পৃহ তারক চা জুড়িয়ে যাবার কথা বলতেই 'মিনতি যেন দূর থেকে মন দিয়ে ফিরে এল। প্রায় আদুরে গলায় ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "জুড়োক গে, আমার এখন চা খাবার মন নেই।"[৫]

এরপরই মিনতির স্মৃতিচারণায় আমরা জানতে পারছি ন' বছর আগের কথা। এখন সবকিছুই মাইকে বলে। আর আগে পাড়ার দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগানো থাকতো, খবরের কাগজের ওপর লিখে দিত। "লেখা হয়েছিল, 'নররাক্ষসের খেলা, জীবন্ত পশু ভক্ষণ। কালোচাঁদ বাবুর মাঠে, বিকেল পাঁচটায়। পুরো টিকিট দু-আনা, হাফ টিকেট এক আনা। তাই লেখা ছিল না গো?"[৬] কালাচাঁদ বাবুর মাঠে তারকের নররাক্ষস সাজার দিন, পোস্টারের ভাষা, টিকিটের দাম, তারকের সেসব আর মনে নেই জেনে মিনতির "দুই চোখ বিস্মিত অভিমানে" ভরে ওঠে। তারক সেটা বুঝতে পেরে মিনতির গাল টিপে একটু নিবিড় দাম্পত্যের ভঙ্গি করে চলে যায়। কিন্তু স্বামীর এই ক্ষণিক সোহাগ প্রদর্শনে মিনতির স্বাভাবিক স্ত্রীসুলভ সাড়া দিতে পারেনা, কারণ 'নররাক্ষস' এই জাদু শব্দটিতে তার অস্তিত্বের কোথাও একটা আদিম ঘড়ি চলতে শুরু হয়েছে 'কোপ কটাক্ষে হাসতে গেল মিনতি, কিন্তু মুখের অভিমান বিষণ্ণ বিধুরতাটুকু ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারল না।"[৭] এবং সেজন্যই এক গভীর শূন্যতাবোধে এই নয়-বছরে সময়ের পরিবর্তনটা প্রকৃত উপলব্ধি করতে পারে সে।

"এখন একেবারে নিস্তরঙ্গ, এখন শুধুই অভ্যাস এই জীবনটা।... এখন সবকিছুই, এমনি নিরুদ্বেগ হাতে, আলগোছে গাল টিপে দেওয়া।"[৮]

মিনতির ভাবনায় এই মুহূর্তে নররাক্ষস আগমনের ঘোষণা একটা নতুন ব্যঞ্জনা পেয়ে যায় "সাবধান! নররাক্ষস এসেছে..."

নররাক্ষস আগমনের ঘটনাটি গল্পে বারবার আসছে, 'নররাক্ষস' শব্দটি তারক-মিনতির জীবনের এক গূঢ় রহস্যের সঙ্গে যুক্ত; 'নররাক্ষসে'র অণুষঙ্গ স্মৃতিকে উস্কে দিয়েছে; মিনতির মধ্যে বিক্রিয়া ঘটতে শুরু করেছে। ক্রমশ শব্দটি হয়ে উঠেছে এক গোপন মন্ত্রের মতো, যা দিয়ে যেন জাদু বলে অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, প্রায় চলচ্চিত্রের মতো লেখক ঘটান ব্যাপারটা:

"মিনতি ঠোঁট নেড়ে উচ্চারণ করল "নররাক্ষস!" তার চোখের সামনে তখন ভাসছে...।"[৯]

মিনতি নামক এক স্বাভাবিক গৃহবধূর ভেতর অন্য এক আধো চেনা নারীর পুর্ণ জাগরণের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় যখন জীবন তার ম্যাড়মেড়ে প্রাত্যহিকতা নিয়ে উপস্থিত হয় "আজ সবই মন্থর। কেমন যেন গা ঢিসঢিসভাব।" জীবনের এই ভুয়া একঘেঁয়েমির মধ্যে নররাক্ষস একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায়। তাকে দেখতে যাবার উত্তেজনায় "নিপাট গৃহিণীটি আজ যেন কেমন অল্পবয়সী বালা হয়ে উঠেছে।"[১০] ভরদুপুরে ভাত ঘুম ছেড়ে তারক মেলায় নররাক্ষস দেখতে যেতে নিমরাজি হলে "কালো চোখ দুটিতে দুর্জয় অভিমানের ঝিলিক।"[১১]

তারক শেষ পর্যন্ত মেলায় নিয়ে যেতে রাজি হয়। অন্যদিকে তারক একটি মন্তব্য মিনতিকে করে "আর নররাক্ষস দেখে কী হবে? এক নররাক্ষসকে তো অনেক দিনই কাত করেছ।"[১২] তারকের মুখে এই উক্তি বসিয়ে লেখক কাহিনীকে অনিবার্য মোড় নেবার দিকে প্রস্তুত করেছেন। এই উক্তি এবং কিছু পরে মেলায় নতুন নররাক্ষসটি তারকের পরিচিত শুনে মিনতির উচ্ছ্বাসে তারক যখন মন্তব্য করে "তাহলে আরেকটাকে কাত করবে?" এই দুটি উক্তির সাহায্যে গল্পটি নিয়তি নির্ভর না হয়ে, হয়ে উঠেছে চরিত্র নির্ভর।

এরপর মেলায় নররাক্ষসে তাঁবু। তারক খেলা দেখার টিকিট কাটতে গেলে স্টেশন মাস্টারকে চিনতে পেরে একজন এগিয়ে আছে "ছি ছি ছি, রাধাকান্তের মেলায় ইস্টিশান মাস্টার পয়সা দিয়ে খেলা দেখবে, রাম রাম। আসুন দেখি এদিকে।"[১৩] এই ঘটনাটি তাৎপর্য এই কারণে যে, এই ন-বছরের দাম্পত্য জীবনে মিনতির প্রেমের নররাক্ষস শুধু যে তার সব আদিমতাকে বিসর্জন দিয়ে এক ছাপোষা গৃহস্থ নরে রূপান্তরিত হয়েছে তাই নয়, একটি সামাজিক আইডেন্টিটিকে সে গ্রহণ করেছে এবং সেটা রক্ষা করার জন্য সে বেশ ব্যাকুল।

তারপর তারা ভেতরে গেল। একেবারে স্টেজের সামনে বসল। পর্দাঢাকা স্টেজ। মিনতির কৌতূহল ক্রমে উত্তেজনায় পরিণত হচ্ছে 'নররাক্ষস' দেখার জন্য। মিনতির মেয়ে রুনু বকবক করছে, তার স্বামী তাকে ডাকছে তাতেও সাড়া দিতে পারছে না। মিনতি তার স্বামী তারককে বারবার জিজ্ঞেস করছে, "এদের শুরু হবে কখন?"[১৪] মিনতির আর অপেক্ষা সহ্য হচ্ছে না। খেলা শুরু হল। খেলা চলাকালী স্ত্রীর চপলতায় তারক সর্তকতার সুরে বলে, "উঃ! লোকে দেখবে যে! ইস্টিশান মাস্টারের বউ।"[১৫]

এরপর তারক রসিকতার সুরেই মিনতিকে বলে 'আর তুমি যে সামান্য মেলায় আসতে এত সেজে এসেছ আজ?'

মিনতি অবাক হয়ে বলল, 'ওমা, কোথায়?'

'নিজেই চেয়ে দেখনা, মেলায় আসতে কোনবার তো এত সাজগোজের ঘটা দেখিনা। স্নো পাউডার মেখেছ, কাজল এঁকে...'

মিনতি বলে উঠল, 'মিথ্যুক, মিছে কথা বলছ? স্নো পাউডার কাজল তো রোজই মাখি।'

'আর কুঁচিয়ে ঘুরিয়ে টকটকে লাল শাড়ি যাই বল, আজ একেবারে মার মার, কাট কাট।'

'অসভ্য! আমি বুঝি তোমাদের নররাক্ষসের সঙ্গে ভাব জমাতে এসেছি?"[১৬]

নতুন নররাক্ষসকে দেখার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে অভিসার সজ্জা। এরপর পরিচয় পর্ব, প্রথম দর্শনেই তারক চিনে ফেলে নররাক্ষসকে। কাকতালীয় ভাবে পিনাকী তারকের পূর্ব পরিচিত। পিনাকী মুগ্ধ হয়ে, মিনতিকে দেখে কামনাঘন দৃষ্টিতে এ যেন অত্যন্ত অবশ্যম্ভাবী, কারণ পিনাকীর পেশল বলিষ্ঠ শরীরটা রক্ত মাংসের ততটা নয় যতটা এক নারীর অবদমিত কামনা ও দিবাস্বপ্ন দিয়ে গড়া। মিনতির উপমা ব্যবহার ও তাই এত স্পষ্ট, সোজাসুজি "পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি চিনতে ভুল হয়না, দৃষ্টির ঠিকানাটাও অচেনা নয়। সবকিছুর হদিশ তো এই শরীরেই।... তবু বুকের মধ্যে একটা পুরোনো তাল কেন বেজে উঠেছে। এখানকার একই জীবনের তালের সঙ্গে যে বড়ো বেতালের মতো বাজছে। কেন বাজে?"

নররাক্ষস মিনতির সংসারে অনুপ্রবেশ। মিনতির গার্হস্থ্যের দুর্বল, একঘেঁয়ে তালকে অধিকার করে নেয়। এই নতুন তাল বড়ো চড়া সুরে বাঁধা। "কিন্তু বউদি, আপনার নররাক্ষস এখন শুধু নর হয়ে গেছে, রাক্ষস আর নেই। আমি কিন্তু এখনো পুরোপুরি রাক্ষস।' " ... তারকদা কি এখন ডিউটিতে?"

মিনতি হ্যাঁ, নরের কাজ।"[১৭]

এক আচ্ছন্ন নেশায় মিনতি এই নতুন তালে কণ্ঠ মেলায়। অত্যন্ত স্বাভাবিক, ঘরোয়া আলাপচারিতার ভাষায় যে এত বিপদজ্জনক এবং বিহ্বল হয়ে পড়ে সে। "যা বলতে চায়না তাই অপ্রতিরোধ্য হয়ে বেরিয়ে আসে মিনতির মুখ দিয়ে।" দেখা যাচ্ছে এক তীব্র আদিম আবেগ যেন অলৌকিক মায়াজালের মতো নিয়ন্ত্রণ করছে চরিত্রদের মুখের ভাষাকে, এরপর দেখব এই আবেগ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কাহিনীর গতি।

ঠিক যখন মিনতি-পিনাকীর সম্পর্কটা একটা কোন সুযোগের অপেক্ষায় স্পন্দমান, তখনই তারক খবর আনে কলকাতায় হেড অফিসের জরুরি তলবে ওকে একরাত্রির জন্য অনুপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু কাহিনীর এই নতুন মোড় অপ্রত্যাশিত মনে হয়না, কারণ মিনতির অবচেতনে সেই অন্ধকার, অপ্রতিরোধ্য আবেগ, যা স্মৃতির অতল থেকে এক নররাক্ষসকে পুর্ণজাগরিত করেছে, তা যে শুধু তাকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, সেই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করছে ঘটনার স্রোত। পিনাকি চলে যাবার পর "সহসা বুকের উপর হাত রেখে মিনতি চুপি চুপি স্বরে বলে উঠলো, 'কোথায় চলে যাচ্ছি আমি, কোথায় চলে যাচ্ছি।"[১৮] এবং তারকের হেড অফিসের তলব শুনেই "ওর প্রাণের ভেতরটা যেন, আবর্তিত হয়ে, একটা বাধাবন্ধহীন মুক্তির বেগে ছুট দিতে চাইল। আর একটা মুগ্ধ বিস্ময়ের ঘোর ওর ভেতরে চুপি চুপি বলে উঠল, 'এ কিসের ইঙ্গিত! কিসের!"[১৯]

পিনাকী 'পাহারা দিতে' রাতে আসার প্রস্তাব দেয়। মিনতিও সেই প্রস্তাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে গোপন মিলনের চুক্তি হয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু আমরা দেখি গল্পের শেষ দৃশ্যে মিনতি স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় চলে চলেছে রাতের ট্রেনে। ওর কোলে তারকের মাথা। উল্টো দিকের গদিতে ঘুমিয়ে আছে দুই মেয়ে খুকু আর রুমু। একটি নিটোল সংসারের ছবি। শুরুর দিকে সেই লাইনটা "সন্তানেরা ও স্বামী সকলেই এই দেহকে ঘিরেই রকমে রকমে বিকশিত।"

চূড়ান্ত সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয়েও মিনতি শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেল কেন? কারণ "সব নররাক্ষসই যে আসলে নর হয়ে ঘর বাঁধতে চায়! একটি ঘর, একটু নিবিড় করে, ঠিক এই মানুষটার মতোই! পিনাকীর স্বপ্নও যে, একদা তারক হব।"[২০] আর তাই 'জীবনে আরেকটা পুনরাবৃত্তির পাপ সে করতে পারবে না।'

পিনাকির আগেকার উক্তি—

"আঃ, তবু একটু ঘরের খাবার খেয়ে বাঁচবো।"

"মেলায় ঘুরে ঘুরে বউ জোটাবার আর সময় পেলাম কোথায়!"

"ঘর ভুলে গেছি অনেক দিন।"

"তা হলে অনেক ভাগ্য, বহুদিন বাদে কাঁচা মাংসের বদলে নররাক্ষসের ঘরে দুটি অন্ন জুটবে।"

এক সাধারণ শীতের সকালে এক স্বাভাবিক গৃহস্থ রমণীর অবচেতন থেকে আদিম বুদবুদের মতো যে নররাক্ষস আগমনের ঘোষণা ভেসে এসেছিল, শেষ পর্যন্ত তা এক কল্পনার ছবি থেকে গেল। গভীর রাতের ট্রেনে ঘুমন্ত স্বামী সন্তানের মাঝে বসে মিনতি "যেন দেখতে পেল, নররাক্ষসটা রেলকোয়ার্টারের অন্ধকার বন্ধ দরজার কাছে এসে ফুঁসছে। দুঃখ, ঘরের অন্ন তাকে দিতে পারল না মিনতি।"[২১]

'নররাক্ষস' গল্প কোনো নতুন জীবনদর্শনের সন্ধান দেয় না; মিনতির অবচেতন মর্ষকামিতা তা অজস্র কেন-র কোনো সামাজিক-দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক উত্তর মেলে না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু গল্পটির নির্মাণে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা একটি নিখুঁত, নিটোল জগৎ তৈরি করে, যে জগৎ জীবনেরই মতো সমুদ্র হিল্লোলজাগায় পাঠক মনে, আর ভ্রান্ত পথিককে দেয় সঠিক ঠিকানা।

**উল্লেখপঞ্জি :**

১। সমরেশ বসু, সমরেশ বসু রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ.৬২০।

২। তদেব, পৃ. ৬২১।

৩। তদেব, পৃ. ৬২২।

৪। তদেব, পৃ. ৬২২।
৫। তদেব, পৃ. ৬২২।
৬। তদেব, পৃ. ৬২৩।
৭। তদেব, পৃ. ৬২৩।
৮। তদেব, পৃ. ৬২৩।
৯। তদেব, পৃ. ৬২৩।
১০। তদেব, পৃ. ৬২৫।
১১। তদেব, পৃ. ৬২৬।
১২। তদেব, পৃ. ৬২৬।
১৩। তদেব, পৃ. ৬২৬।
১৪। তদেব, পৃ. ৬২৬।
১৫। তদেব, পৃ. ৬২৭।
১৬। তদেব, পৃ. ৬২৭।
১৭। তদেব, পৃ. ৬২৯।
১৮। তদেব, পৃ. ৬৩১।
১৯। তদেব, পৃ. ৬৩১।
২০। তদেব, পৃ. ৬২৯।
২১। তদেব, পৃ. ৬৩২।

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১। সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও বিজলি সরকার (সম্পাদনা), সমরেশ বসু : স্মরণ- সমীক্ষণ, চয়নিকা, ৪৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।
২। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৯।

## আদাব

### কাহিনী—সমরেশ বসু / নাট্যরূপ : জয়গোপাল মণ্ডল

[শহরের রাজপথ। কোনো ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলছে না। শুনশান রাত্রি। ১৪৪ ধারা জারি। চারিদিকে আওয়াজ—কান্নার আওয়াজ, চিৎকার চেঁচামেচি চলছে—মৃত্যুর হাহাকার—হানাহানি দুই গলির মোড়ে একটা ডাস্টবিন উল্টে পড়ে আছে। চারিদিক থেকে শব্দ ভেসে আসে—কখনো আল্লাহ আকবর, কখনো বন্দেমাতরম। হঠাৎ ডাস্টবিনটা নড়ে উঠল। প্রাণভয়ে পড়িমরি করে দৌড়ে আসছিল, এক মাঝি হঠাৎ ভয়ে থমকে দাঁড়ায়, শরীরের শিরা উপশিরা কেঁপে ওঠে। অপেক্ষা করে। পার হতে ভয় পাচ্ছে। কুকুর নয় তো? খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর ডাস্টবিনটা আবার নড়ে উঠল। ভয়ে একটু পিছিয়ে যায়, আবার কৌতুহলবশত ল্যাম্পপোস্টের পাশ থেকে উঁকি মারে। তারপর ধীরে ধীরে দু'জনে দু'জনের দিকে এগিয়ে যায়। ব্রাকগ্রাউন্ডে মাঝে মাঝে হানাহানির চিৎকার ভেসে আসে ]

সুতা-মজুর— (ভয়ে ভয়ে) হিন্দু না মুসলমান?

মাঝি— আগে তুমি কও।

সুতা-মজুর— না, আগে তুমিই কও।

মাঝি— আচ্ছা, বাড়ি কোনখানে?

সুতা-মজুর— বুড়িগঙ্গার হেইপারে সুবইডার। তোমার?

মাঝি— চাষাড়া—নারাইনগঞ্জের কাছে।

সুতা-মজুর— কী কাম করো?

মাঝি— নাও আছে আমার, নায়ের মাঝি। তুমি?

সুতা-মজুর— নারাইনগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

[ আবার চুপচাপ। দুজনে দুজনের চেহারাটা দেখে বোঝার চেষ্টা করে কে কোন্ ধর্মের! হঠাৎ কাছাকাছি একটা শোরগোল ওঠে। মার মার, ধরে মাথাটা কাইটা ফ্যাল।—মার মার, শালা নেড়ের জাত শেষ কইর‍্যা ফ্যাল। মার মার শালা হিঁদুর জাত শেষ কইরা দে।—ভয়ে দুজন—দুজনকে জাপটে ধরো]

সুতা-মজুর— ধারে কাছেই য্যান লাগছে।

মাঝি— হ, চলো এইখান থেইকা উইঠা যাই।

সুতা-মজুর— আরো না-না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝি— (দূরে সরে যায়) তুমার কোনো বদ-মতলব নাই তো?

সুতা-মজুর— আরে না না। আমি মরত্যাছি ভয়ে।—বইয়ো। বইয়ো। যেমন যমুনা বইয়া রইছে—সেই রকম থাকো। (হাত ধরে টেনে বসায়)

মাঝি— (সন্দেহ হয়, হিঁচকে টান মেরে হাত ছাড়ায়)—ক্যান? যামুনা?

সুতা-মজুর— ক্যান্ কি? মরতে যাইবা নাকি তুমি? ওদেকে তো দুই পক্ষই খুনোখুনি করছে।

মাঝি— যামুনা কি আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি?

সুতা-মজুর— তোমার মতলবডা তো ভালো মনে হইতেছে না। কোন্ জাতির লোক কইলা না? শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা, লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগা?

মাঝি— এইডা কেমুন কথা কইলা তুমি? (হঠাৎ চিৎকার ক'রে বলে)

সুতা-মজুর— আরে চুপ চুপ! ভালো কথাই কইছি ভাই; বইয়ো, মানুষের মন বোঝো না?—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি? আমি ভাইবত্যাছি, ঘরের কথা, মা-বউ-ছেলে মেয়েদের কথা.... (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)।

মাজি— আমিও তাই ভাইব্ত্যাছি—

সুতা-মজুর— বিড়ি খাইবা? পকেট থেকে বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে)।

[মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যেস মতো দু'একবার টিপে কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর দেশলাইটা জ্বালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভয়ের ঘামে ভিজে শপশপে]

মাঝি— (কাছে এসে) আরে, জ্বলব—জ্বলব, দেও দেহনি—আমার কাছে দেও (সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে দু-একবার খসখস করে জ্বালিয়ে ফেলল কাঠি)।—সোহান আল্লা!—নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি।

সুতা-মজুর— (মুখ থেকে পড়ে গেল বিড়িটা)—কী বললে তুমি? —তুমি তাহলে....?

মাঝি— হ', আমি মোছলমান—কী হইছে?

সুতা-মজুর— (ভয়ে ভয়ে) না, না। কিছু হয় নাই, কিন্তু.... পাশের পুঁটলিটা দেখিয়ে) ওইডার মধ্যে কী আছে?

মাঝি— পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখান শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব জানো?

সুতা-মজুর— আর কিছু নাই তো?

মাঝি— (ঝেঁঝিয়ে ওঠে) মিথ্যা কথা কইত্যাছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখো। (পুঁটলিটা বাড়িয়ে দেয়)

সুতা-মজুর— (আশ্বস্ত হয়)—আরে না না ভাই, দেখুম আর কী। তবে দিনকালটা দেখছ তো? বিশ্বাস করন যায়?—তুমিই কত্ত?

মাঝি— হেই তো হক কথাই। ভাই—তুমি কিছু রাখো-টাখো নাই তো?

সুতা-মজুর— ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটাও সুঁইচ নাই। পরানটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। (নিজের ব্যাগটা ঝেড়ে ঝুড়ে দেখায়)

[আবার দু'জনে পাশাপাশি বসল। বিড়ি ধরিয়ে নিশ্চিন্তে ধুমপান করল খানিকক্ষণ]

মাঝি— (যেন প্রাণের দোসর) আইচ্ছা....আইচ্ছা—আমারে কইতে পার?—এই মাইর-দ'ইর কাটাকুটি কিসের লেইগা?

সুতা-মজুর— দোষ তো তোমাগো ওই লীগওয়ালা লোগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি— হেই সব বুঝি না। আমি জিগাই, মারামারি কইরা হইব কী? তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?

সুতা-মজুর— আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা—(হাতের বুড়ো আঙুল দেখায়)—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলা—মাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা, আর তার পোলা-মাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল, আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

মাঝি— মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এমন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেমবায়? (নিস্ফল ক্রোধে হাত দুটো দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে)

সুতা-মজুর— হ', ঠিকই কইছ। আমাগো কথা কেডা ভাবে?

মাঝি— এই যে দাঙ্গা বাঁধল—অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমুন্দি? নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে লীগের লোকেরা, ঠিক করছে, কও তার ঠিক কি? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশায় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাই নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত ক্যান হজরতের

হাত, বখশিশ দিত পাঁচ, নায়ের কেয়ারা দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দু বাবু আইব আমার নায়ে!

[কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল সুতা-মজুর। একসঙ্গে অনেকগুলো ভারি বুটের শব্দ কানে আসে। শব্দটা যেন বড় রাস্তা হয়ে এই গলির মোড়ে আসছে। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকায় শঙ্কিত হয়ে।]

মাঝি— কী করব? (পুঁটলিটা বগলদাবা করে)

সুতা-মজুর— চলো পালাই। কিন্তুক বাবু কোনদিকে? শহরের রাস্তা-ঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি— চলো, যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না।—ও ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

সুতা-মজুর— হ। ঠিক কথাই কইছ। কোন্‌দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।

মাঝি— এই দিকে। চলো, কোনো গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ডর নাই।

[উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল তারা, সোজা এসে পড়ল পটুয়াটুলি মোড়ে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুজনেই থমকে দাঁড়াল—আবার দৌড়ল— (মাঝি-হেই দ্যাখো কই একজন অশ্বারোহী ইদিকে আইত্যাছে।) দেখল অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে— বাঁপাশে মেথর যাতায়াতের সরুগলির মধ্যে ঢুকে পড়ল—ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে চলে গেল অশ্বারোহী]

সুতা-মজুর— কিনারে কিনারে চলো ভাই—

মাঝি— খাড়াও—

সুতা-মজুর— কী হইল?

মাঝি— এদিকে আইয়ো—(হাত ধরে একটা পানবিড়ির দোকান-গুমটির আড়ালে নিয়ে গেল)—হেদিকে দ্যাখো। ওই ঘরের সামনে, —দশ-বারোজন বন্দুকধারী পুলিশকে ইংরেজ অফিসার কীসব বলছে...ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। আর একটু আগাইয়া গেলে আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতা-মজুর— তবে?

মাঝি— তাই কইতাছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া বিশেষ কাম হইব না। এইটা হিন্দুগো আস্তানা, আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইটা বাড়িত যাইবা গা।

সুতা-মজুর— আর তুমি?

মাঝি— আমি যাই-গা। আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল, না হইল আল্লাই জানে। কোনোরকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

সুতা-মজুর— আরে না—না মিয়া, করো কী? (মাঝির কামিজ চেপে ধরে) কেমনে যাইবা তুমি অ্যাঁ?

মাঝি— ধইরো না ভাই, ছাইড়া দেও। বোঝো না তুমি কাইল ঈদ; পোলা-মাইয়ারা সব চান্দ দেখছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পরব, বাপজানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—পারুম না—মনটা কেমন করতাছে।

সুতা-মজুর— যদি তোমায় ধইরা ফেলায়?

মাঝি— পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখান থাইকা ব্যান ইউঠো না। যাই....ভুলুম না ভাই এই রাত্রির কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। আদাব।

সুতা-মজুর— আদাব। আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব। (মাঝি চলে গেল) ভগবান, —মাঝি য্যান বিপদে না পড়ে। (বার বার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে)—আহা—হা, 'পোলামাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করবে।—বাপজানের পরান তো। বিবি হয়তো সোহাগে আর কান্নায় ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে। কত সোহাগে করবে—'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ',—(স্বগতোক্তি) (হাসি হাসি মুখে)—আর মাঝি তখন কী করবে! মাঝি তখন—

[হঠাৎ বুটের আওয়াজ! ধ্বক করে উঠল সুতা-মজুরের বুক]

পুলিশ— হলট্.....হলট্—ডাকু ভাগতা হ্যায়

[সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখে]

(লাফিয়ে নামল পুলিশ অফিসার—ডাকু ভাগতা হ্যায়-ফায়ার—ফায়ার—(লুটিয়ে পড়ল মাঝি—তার বুকের রক্তে তার পোলা-মাইয়ার, তার বিবির শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে) লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে পুলিশ অফিসার চলে যায়, দৌড়ে যায় সুতা-মজুর, কোলে তুলে নেয় মাঝির নেতিয়ে পড়া মাথাটা, অঝোরে কাঁদে, যেন আত্মজনের কান্না)

মাঝি— পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবির চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না ত্যাগো লগে, তুমি পালাও। ওরা হয়তো তোমাকেও—।

(কেঁদে ওঠে সেতারের তার, ভেসে আসে বিষাদের সুর। এই অন্ধকার রাত আর কাটল না—মাঝি লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

সুতা-মজুর— -মাঝি-ই-ই-ই, তোমার পোলা মাইয়া গো কী হইব!—

কী আর কইব ভাই, আদাব-আদাব, ভুলুম না তোমারে। তোমাকে ছাইড়া যাইতে মন চাহে না—

(বিষাদের সুর তীব্র হয়, কেঁদে কেঁদে ওঠে সেতারের আওয়াজ)

# কবি গণেশ বসুর স্মরণে

## কবি গণেশ বসুর কাব্যচর্চা ঃ এক অসম দ্বৈরথের আখ্যান

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

"আমরা একবার চিনা কবি ইয়ং ওয়ান লি-র প্রশ্ন ও উত্তরকে সামনে খাড়া করতে পারি—

Now, What is poetry?

If you say it is simply a matter of words I will say a good poet get rid of words. If you say it is simply a matter of meanings. I will say a good poet get rid of hearings, 'But', you ask, 'Without words Where is the poetry?

To this I reply : Get rid of meanings and there is still poetry.

এরকমই আরও একটি স্মৃতিধার্য উচ্চারণ—

Boswell : Sir what is poetry?

Johnson : Why sir, it is much easier to say what it is not. We all know what light is, but it is not easy to tell what it is.

"কবিতাও তাই। ব্যক্তি-আমি ও জনজাতির মর্মলোকের মন্থনজাত শব্দ ও অর্থের রসায়নে ছন্দময় বিষামৃতই কবিতা। তা হয়তো উন্মাদের বিভা। হয়তো শাণিত তরবারির খেলা। সময়ের ভালোবাসাকেও কবিতা বলতে অন্যায় কোথায়?"

(গণেশ বসু নিবেদন ঃ গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ-১ সম্পাদনা ড. জয়গোপাল মণ্ডল/ দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা বইমেলা ২০২৩)

গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ ২-এর নিবেদন অংশে কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বীক্ষণ এক অনন্য মাত্রাকে স্পর্শ করে তাঁর পাঠ ও বোধের সম্পৃক্ততায়। "কবিতা রহস্যময়। এবং এই রহস্যই তার আকর্ষণের ভরকেন্দ্র। সেকারণেই কবিতার অমোঘ ও অনিবার্য সম্মোহন ক্ষমতা কবিতার রচনাকার এবং পাঠককে গ্রস্ত করে। একবার যিনি এই নিষিদ্ধ নেশার স্বাদ পেয়েছেন তার পক্ষে সেই হাতছানি উপেক্ষা করা দুরূহ। আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে ওই আসক্তি এমনই দুর্মর ও সর্বগ্রাসী, যে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার সমূহ উপস্থিতি একজন তন্নিষ্ঠ কবিকে নির্দিষ্ট সঞ্চারপথ থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয় না।"

পশ্চিমবঙ্গে গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে যাঁরা বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি গণেশ বসু ছিলেন অন্যতম। যে কালখণ্ডের ফসল এই কবিকুল, তা ছিল নানা সঙ্কটের সমন্বয়ে কন্টকাকীর্ণ—এবং এর মধ্যে তীব্রতম কালান্তক ঘটনাটি হল দেশভাগ। গণেশ বসুর সমসাময়িক আশিস সান্যাল, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা প্রমুখ কবিদেরকেও এই একই প্রতিকূলতার সঙ্গে ধারাবাহিক সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়েছে এবং সেই আর্থ-সামাজিক দ্রোহের সম্মুখীন হয়েও তাঁরা 'কবিতা' নাম্নী এক

সুকুমার শিল্পকলাকে পরিত্যাগ করেননি। নিদারুণ দারিদ্র্য, প্রতিমুহূর্তে গ্রাসাচ্ছদনের জন্য এক নিরন্তর সংগ্রাম তাঁদের সারস্বতচর্চাকে প্রতিহত করতে পারেনি।

আমরা এবার কবি গণেশ বসুর শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করব। বরিশাল জেলার চাঁদশি গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস। তাঁর জন্ম ১৯৪০ সালের ১লা ডিসেম্বর দেহেরগতি গ্রামে মামাবাড়িতে। জন্মসূত্রে সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ১৯৪৭-এ দেশভাগজনিত সমূহ বিড়ম্বনার ফলে তাঁর শৈশব সুখের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছিল। এই বিশেষ কালপর্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি একটু দেখে নেওয়া থাক :

"We know that the joy of our country's independence from colonial rule in 1947 who tarnished by the violence and brutality of partition. The partition of British India into the solvereing States of India and pakistan (with its western and eastern wings) led to many sudden developments. Thousands of lives were Snufted out, many others changed dramatically, Cities changed, India changed, a new country was born, and there was unprecedented genocidal violence and migartion. [Themes in Indian History, part III, NCERT, Reprinted 2021 page 376]

আরও অনেক ছিন্নমূল পরিবারের মতো গণেশ বসুর পিতা সুমন্তনাথ বসু মজুমদারও তাঁর সমগ্র পরিবার নিয়ে ১৯৪৮ সালে শরণার্থীর পরিচয় সম্বল করে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। মাত্র ৮ বছর বয়সে গণেশ বসুর জীবনে এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন লক্ষ করি। যে পরিবার চাঁদশিতে জমিদার পরিচয় বহন করতেন আজ তারা নিতান্তই উদ্বাস্তু। এই পর্যায়ে প্রায়শই তাঁদের আবাস বদল হতো। প্রাথমিক ভাবে পদ্মপুকুরে পরিত্যক্ত এক মিলিটারি ক্যাম্পের আশ্রয়শিবিরে কয়েকদিনের দুঃসহ বসবাসের পর সুমন্তনাথ বাবু তাঁর ভগিনীর ভবানীপুরের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং এখানে বছর দুয়েক কাটিয়ে ১৯৫০ সালের শেষভাগে তাঁরা টালিগঞ্জের একটি বস্তিতে বসবাস শুরু করেন—এর পরে চন্দ্র মণ্ডল লেনের একটি দোকান ঘর হয়ে ওঠে তাঁদের আস্তানা। সেসময় এক চরম আর্থিক অপ্রতুলতার মধ্যে তাঁদের জীবন কাটে। অভুক্ত-অর্ধভুক্ত দিন অতিবাহিত করতে হয় পরিবারের প্রত্যেকেই। সুমন্তনাথ কখনো সখনো দেশ থেকে খাজনা বাবদ কিছু টাকা সংগ্রহ করে আনতেন, কিন্তু একসময়ে তাও বন্ধ হয়ে যায়। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায়, স্ত্রী পারুল দেবী সংসার বৈতরণী পার হওয়ার ভার নিজের মাথায় তুলে নেন। তিনি নিজের দেশে ছিলেন সেবিকাপরিবৃত রাজরানির মতো, তাঁকে রাঁধুনি ও কাঁথা সেলাইয়ের কাজ নিতে হয় বাধ্য হয়ে। এমনকি এক সময়ের দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে একটি প্লাস্টিক কারখানাতেও তিনি কাজ করেন।

এই সামগ্রিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গণেশ বসুকেও অর্থ উপার্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হয়। তিনিও তাঁর দিদি কাগজের ঠোঙা বানিয়ে দোকানে দোকানে বিক্রি করতেন। দাদা কার্তিক বসু চানাচুর সরবরাহ করতেন বিভিন্ন দোকান। এর পরে তাঁরা গৃহশিক্ষকতা শুরু করেন। পঞ্চম শ্রেণিতে যখন কবি পড়েন তখন তিনি দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ দিতেন। তাঁর স্কুলজীবন শুরু হয় ভবানীপুর নাসিরুদ্দিন স্কুলে, পরে তিনি ভর্তি হন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে। ১৯৫৩ সালে তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম মহাত্মা গান্ধি সম্পর্কিত একটি গদ্য বিদ্যালয়ের পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। এবং একই বছরে তাঁর রচিত প্রথম কবিতা 'মৃত্যু', 'পথের বাণী' শীর্ষক একটি দেওয়াল পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে।

কবি গণেশ বসুর জীবন কখনোই সরলরৈখিক নয়—নানা ধরনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন—অভিনয়, ম্যাজিক, হিপনোটিজ্‌ম থেকে শুরু করে সক্রিয় রাজনীতির চর্চা—সব বিষয়েই এক অপরিসীম আগ্রহ ও অক্লান্ত জিজ্ঞাসা তাঁকে সতত উজ্জীবিত রেখেছে। তাঁর অধীত বিষয়ের বৈচিত্রও কৌতূহলোদ্দীপক। একদিকে তিনি পাঠ নিয়েছেন সিভিল ড্রাফটম্যানশিপ বিষয়ে, আবার কলেজে তিনি প্রথমে বিজ্ঞান এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী হয়েছেন। এমনকি কর্মক্ষেত্রেও তাঁর বিচরণে বহুবিধ রকমফের। ক্যালকাটা অটোমোবাইলস নামে একটি মোটর গাড়ি সারাইয়ের কারখানায় তিনি কাজ করেছেন। ১৯৬৩ সালে রাঁচিতে তিনি শালিমার প্রোডাক্টসে স্বল্প সময়ের জন্য ঠিকাদারের পক্ষে কাজ করেন। স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। 'অমৃত' সাপ্তাহিকে সাব এডিটরের কাজ করেছেন।

১৯৬৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ', প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বইটি তৎকালীন কবি ও কাব্যমোদীদের মধ্যে এক আলোড়ন তোলে। কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কবি তরুণ সান্যাল প্রমুখ কবিরা এই কাব্যগ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এম. এ পাশ করার পর ১৯৬৬ সালে একই সঙ্গে দিনে অধুনালুপ্ত 'অমৃত' পত্রিকায় কাজ করতেন, রাত্রে পড়াতেন কলেজে এবং কিছু গৃহ শিক্ষকতাও করতেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নিজের মুখোমুখি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালের মে মাসে, রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন। এই কাব্যগ্রন্থটি কবি বিষ্ণুদে-কে উৎসর্গ করা হয়।

এই কাব্যগ্রন্থেই স্থান পায় কবির বহুচর্চিত 'সমুদ্রমহিষ' কবিতাটি। অগ্রজ কবির কোনও অনুজ কবির কবিতাকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করার ঘটনা বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিরল। তিনের দশকের বিশিষ্ট কবি বিষ্ণু দে এই কবিতাটি পাঠ করে একটি সম্পূর্ণ কবিতা লেখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'সমুদ্র মহিষ' কবিতাটি এক সময় প্রাক্‌স্নাতক স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত ছিল। এধরনের আর একটি ঘটনার কথা হয়তো এখানে উল্লেখ করা অপ্রসাঙ্গিক হবে না। চারের দশকের কবি দিনেশ দাসের কবিতা 'কাস্তে' অনুপ্রাণিত করেছিল তিনের

দশকের আর এক বিশিষ্ট কবিকে, একটি সমভাবনা সম্পন্ন কবিতা রচনা করতে। সেই কবির নাম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

চূড়ান্ত দারিদ্রের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ চলাকালীন কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থে আমরা লক্ষ করেছি প্রেমের উদ্ভাস, প্রেমিক হৃদয়ের নিঃশর্ত সমর্পণ-দয়িতাকে হারিয়ে ফেলার গাঢ় নীল বেদনা- বেদনা-স্মৃতিসর্বস্ব কবির আর্ত উচ্চারণ—

"বনানী, এখনো ফের ভালোবাসা দোলা দেয়, এ বুকে জোয়ার/ তোমার স্মৃতিকে ঘিরে আসে, ফোটে আদিগন্ত স্বপ্নসূর্যমুখী/ গেটমিটিংয়ের ভিড়ে, নোনা ঘামে, দীর্ঘবাহু সময় সত্তয়ার / প্রতিটি মুহূর্তে আনে একই মুখ হাসিকান্না কে কেমন সুখী/ আজো এই শূন্যতায় দীর্ণ বুক জ্বলে।"

[গণেশ বসু : বনানীকে কবিতাগুচ্ছ; গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ-১ ও সম্পাদক : ড. জয়গোপাল মণ্ডল; দিয়া পাবলিকেশন জানুয়ারি ২০২০]

এরপর তাঁর কাব্যে এসেছে নানান চড়াই-উতরাই-বামপন্থী দর্শনে দীক্ষিত কবির সমাজ সচেতনমন তাঁর কাব্যভাবনাকে উসকে দিয়েছে সমাজের নানা অসংগতির বিরদ্ধে সরব হওয়ার মন্ত্রে :

"যাদের যেমন যোগ্যতা
শাসক জোটে তেমনি তাদের
খণ্ডকালের কথ্য তা।
মাথায় যদি মোরগ ডাকে
গন্ধগোকুল পথ দেখায়
গাঙশালিকে হল্লা করে
দুর্নীতিরই দস্যুতায়
বুলবুলিরা আবহমান
ভাষণ বেচে বাঁচতে চায়
এর-ওর ঘাড়ে দায় চাপিয়ে
ভিটেয় ঘুঘু মুগ্ধ তায়
বর্বরতার মর্যাদায়।"

[আপাতত : গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ ২ পৃ. ৫ সম্পাদক : ড. জয়গোপাল মণ্ডল: দিয়া পাবলিকেশন ফেব্রুয়ারি ২০৮]

কবি আজ আর আমাদের এই ইহজগতে নেই। কিন্তু তাঁর ২০১৬ সালের সেই অভ্রান্ত উচ্চারণ এই ২০২৪-এও সমান (যদি তার থেকে বেশি নাও হয়) প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই জন্যই কবিকে বলা হায় ক্রান্তদর্শী-দ্বিতীয় ব্রহ্ম।

তাঁর অবলোকনে সমকালের ঘটনাসমূহ উঠে আসে অকপট উন্মোচনে—প্রতিটি

সরকার তা রাজ্যই হোক বা কেন্দ্র—তাতে বিচ্যুতির যে দীর্ঘ তালিকা সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে তা তাঁর নজর এড়ায় না।

"....কলির সন্ধ্যায়
ন্যায়
এবং অন্যায়
একাসনে চেটেপুটে গণতন্ত্র খায়
মায়াবী মুখোশ।
ব্যাংক লুট হ'য়ে যায়, নোটবন্দি, বহুলাখি
পোশাকের জোশে
মেষতন্ত্র দারুণ জমকালো।
উদ্ভাসিত আলো
সংসদের ফ্লোরে
জোরে জোরে
কীর্তনের ধুয়ায় ধুয়ায়
ক'রে দিতে চায়
কর্পোরেট পুঁজির কলোনি।
এসব গোপন ছক জেনেছিল রাহু আর শনি।
জেব্রার চামড়ায় মোড়া ধর্মের এজেন্ডা।
বাক্‌তাল্লা সিংহাসনে উচ্চকিত হয়ে ওঠে ভেজেই ভেরেন্ডা।
খুশির যৌতুক—
প্রভুত্ববাদীরা এসে চুমো খায় ধ্বংসের চিবুক"
[যৌতুক : আপাতত : তদেব]

আজকে যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি পূর্বজদের অপরিসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে, তা যে প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। সে সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই—তাই তিনি স্বাধীনতার সঠিক স্বরূপকে তুলে ধরেন নিজস্ব ইডিয়মে।

স্বাধীনতা নয় পুঁজিপতিদের প্রতারণা ক্ষমা করা;
স্বাধীনতা নয় মেরুকরণের তরবারি রাজনীতি;
স্বাধীনতা নয় ধর্মের নামে ধ্বংসের দাপাদাপি;
স্বাধীনতা নয় মেধাকে চালান, নারীমেদ বন্টন;
স্বাধীনতা নয় নাতসিবাদের অমায়িক অর্জন;

স্বাধীনতা নয়  যাত্রাপালায় শকুনের বাগ্মিতা।

স্বাধীননতা মানে  স্মৃতি-সত্তায় রবি বাউলের গান;
স্বাধীনতা মানে  আদ্যোপান্ত সহিষ্ণুতার দিশা
স্বাধীনতা মানে  অ্যাকোয়ারিঅ্যামে সোনালি মাছের খেলা;
স্বাধীনতা মানে  ব্যাস-বাল্মীকি ইকবাল-নজরুল;
স্বাধীনতা মানে  লালন-হাছন-হেমাঙ্গ বিশ্বাস
স্বাধীনতা যেন  স্বচ্ছ চেতনা ম্যাজিক বাস্তবতা।
স্বাধীনতা যেন  মানবিকতার সুসময় সিম্ফনি।

স্বাধীনতা হ'লো স্বপ্ন উড়ান, স্বপ্নপুরণ শুধু।"

কিছু পাঠকের কাছে এমনও মনে হতে পারে যে তাঁর কবিতায় হয়তো একটি ম্যানিফেস্টোধর্মিতা কাব্যগুণকে কোনো কোনো সময়ে ম্লান করে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের বিনীত নিবেদন এইটুকুই—একজন কবি, তিনি যতই নৈর্ব্যক্তিক হোন না কেন, সমসময়ের প্রতি দায়বদ্ধতাকে তিনি এড়াতে পারেন না। যুগ যখন বারুদ, তখন তার অবশ্যম্ভাবী ফসল—নজরুল বা সুকান্ত ভট্টাচার্য। ঠিক তেমনি জীবনানন্দ দাশের মতো একজন আত্মমগ্ন কবির কলমেও '১৯৪৬-৪৭' এর মতো কবিতায় সময়ের দলিলকে স্পষ্ট প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত হতে দেখি। দেশভাগের মর্মান্তিক পরিণতি অভিব্যক্ত বাংলাদেশের প্রতি মানুষকে স্পর্শ করেছিল তার পরিচয় আমরা এই কবিতায় পাই। কৃত্রিম বিভাজনের রাজনীতির ফল যে কতটা বিষময় হতে পারে তা এ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট।

কবি হিসেবে তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়ন এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। আমাদের সীমিত ক্ষমতায় আমরা দেখতে চেয়েছি একজন ছিন্নমূল ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ শৈশবের প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানচ্যুত হয়ে নিজ বাসভূমি ছেড়ে এক অচেনা দেশে এসে নিরন্তর নানাবিধ প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করেও তাঁর স্বীয় সারস্বত ধর্ম থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর তন্নিষ্ঠ কলম বিশ্রাম নেয়নি। নিজের মেরুদণ্ডটির ঋজুতা ও দার্ঢ্যকে আমৃত্যু কোনো প্রলোভনের বিনিময়ে তিনি বিকিয়ে দেননি। ফলস্বরূপ—কোনো নামী প্রকাশক এগিয়ে আসেননি তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায়—তাঁর ভাগ্যে জোটেনি কোনো সরকারী পুরস্কারের প্রসাদ। তাতে কিছু আসে যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা/ এ ধূলায় তার যত হোক অবহেলা।' তাই তিনি জীবনের সায়হ্নে বেলায় পান ড. জয়গোপাল মণ্ডলের মতো একজন সাহিত্যপ্রাণ মানুষের সাক্ষাৎ। ২০২০ সালে ড. জয়গোপাল

মণ্ডলের সম্পাদনায়, দিয়া প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হলো 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহের' প্রথম খণ্ড। এবং সেই বছরেই 'সাহিত্য অঙ্গন' পত্রিকার ১২তম জুলাই-ডিসেম্বর' ২০২০ সংখ্যাটি কবি গণেশ বসুর ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে দুই কৃত্য কালের কষ্টিপাথরে স্বর্ণাক্ষণে মুদ্রিত থাকবে। 'কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় কবি গণেশ বসুর অনুভব ও প্রতিক্রিয়াতে একটু চোখ বুলিয়ে, নেওয়া যাক!

"একদিন হঠাৎ এক ঝলক আলোর মতো এসেছিলেন কবি ও অধ্যাপক ড. জয়গোপাল মণ্ডল। ডাক দিলেন ১৯৬৪ থেকে ২০১৫-এ পর্যন্ত প্রকাশিত আমার বারোটি কাব্যগ্রন্থের সংকলন 'কবিতা সংগ্রহ' প্রকাশের। কিন্তু জাগে, বর্তমান মন্দার বাজারে আর্থিক দায় কে নেবেন? পিছিয়ে যাই সবিনয়। আমি তো কোনোদিন মিডিয়া, দল, গোষ্ঠী বা কোনো সরকার পোষিতই ছিলাম না, আজও নই। কিন্তু করিতকর্মা জয়গোপাল হাল ছাড়লেন না। তাঁর উদ্যোগে মুশকিল আসান হয়ে দেখা দিলেন দিয়া পাবলিকেশনের আত্মজন অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর মল্লিক। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিলেন সাহসিকা প্রকাশিকা দেবারতি মল্লিক। তাঁদের সহৃদয়তা ও আন্তরিকতায় প্রকাশিত হলো 'কবিতা সংগ্রহ'। জীবনের বেলাশেষের ধুলোবালির কিছু আলো অন্ধকার।"

[ভূমিকা : গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ : সম্পাদনা ড. জয়গোপাল মণ্ডল: দিয়া পাবলিকেশন : প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২০ পৃ. প্রথম]

ড. জয়গোপাল মণ্ডল সেখানেই থেমে থাকেননি। ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলা প্রাঙ্গণে একটি মঞ্চে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ'-এর দ্বিতীয় খণ্ড। ড. জয়গোপাল মণ্ডল, ড. দীপঙ্কর মল্লিক এবং প্রকাশিকা দেবারতি মল্লিককে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই।

আমাদের দুর্ভাগ্য ২০২৩ সালের ১০ই নভেম্বর কবি গণেশ বসু পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেন। আমরা আশা করব, তাঁর প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য রচনাগুলিকে একত্রে গ্রন্থবদ্ধ করার কাজে কোনো নবীন প্রকাশ উৎসাহী হবেন। ইতোমধ্যে ড. মণ্ডল তাঁর অগ্রন্থিত/ অপ্রকাশিত কবিতাবলীর একটি সংকলন নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন।

তরুণ প্রজন্মের যারা কবিতা রচনা ও পাঠে আগ্রহী তাদের পূর্বজদের লেখা পাঠ করা একটি অবশ্যকৃত্য, সেকারণে কবি গণেশ বসুর রচনা সমগ্র দুই মলাটে গ্রন্থবদ্ধ হওয়া ছিল একটি অত্যন্ত জরুরি কাজ। সেই কাজটির অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছে। আমরা আশা করব বাকিটুকুও অনতিবিলম্বে পরিণতি পাবে।

এই নিবন্ধটির সমাপ্তি পর্বে আমরা তাঁকে প্রণাম জানাব, তাঁরই একটি কবিতার উদ্ধৃতি সহকারে। যে পংক্তি তিনি নির্মাণ করেছিলেন কিংবদন্তী নট ও নাট্যকার শম্ভুমিত্র প্রসঙ্গে-তা কি তাঁর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নয়?

"কোনো অভিমান নয়। কার প্রতি অভিমান? নীরব নিঃসঙ্গ চলে যাওয়া,
ঢের বেশি উজ্জ্বলতা, সহজ সারল্য এই রাজকীয় বিনা আড়ম্বর
নক্ষত্র-প্রস্থান। থেকে যায় কিছু চাওয়া পাওয়া।
ঢেউয়ের চূড়ায় সমুদ্রে নিজস্ব বলয়ে দায়বদ্ধ প্রকীর্ণ প্রহর
নচিকেতা তোমার মননে।
.....
.....
আমিও কি রাগী প্রৌঢ়? স্বতন্ত্র মুদ্রায় এই আমিও কি একা?
স্বপ্ন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়, একাকীত্ব ফুলে ওঠে, মুখোশের ভিড়ে
কতনিন্দা কত ঈর্ষা, তাই
তোমারই ভিতর যেন নিজেকেই চিরে চিরে দেখা"
[ গণেশ বসু : শম্ভু মিত্র : গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র : তদেব]

**গ্রন্থসমূহ :**

১। বসু, গণেশ : গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ : সম্পাদক : ড. জয়গোপাল মণ্ডল : দিয়া পাবিলকেশনে : প্রথম সস্করণ জানুয়ারি ২০২০
২। বসু, গণেশ : গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ : সম্পাদক ড. জয়গোপাল মণ্ডল : দিয়া পাবিলকেশন : প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৩। মণ্ডল, ড. জয়গোপাল সম্পাদিত সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা—খণ্ড-৬ সংখ্যা-১২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০
৪। লাহিড়ী, তারকনাথ : ৬০ দশকের কয়েকজন কবি : নিবিড় বীক্ষণ চারুপত্র প্রকাশনী : প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৮
৫। ঘোষ ড. গৈরিকা : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা উৎসও বিবর্তন প্রকাশক : অসিত ঘোষ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৫

# গণেশ বসু'র কবিতা : সময় ও জীবনের কণ্ঠস্বর

সপ্তর্ষি রায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) উত্তরকালে বাংলা কবিতায় যে কবিরা নতুন মোড় এনেছিলেন, তাঁরা কাব্যভাষার দিক থেকে বিশ্বজোড়া প্রক্রিয়ার শরিক ছিলেন। তিরিশের কবিদের প্রধানতম অন্বেষণ ছিল চির-চেনা রবীন্দ্রসরণির যানজট এড়িয়ে নিজস্ব ভাষাভঙ্গির পথ খুঁজে নেওয়া সমাজবাদী সাহিত্যাদর্শ ও বিশ্বাস, জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চল্লিশের কবিদের। সমকালীন পরিস্থিতি দেশভাগ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ—এসব কিছুকে অস্বীকার করার প্রতিক্রিয়ায় পঞ্চাশের উল্লেখযোগ্য অংশ মগ্ন হলেন আত্মমুখীন, সমাজবাস্তব বিমুখ, ভাষাভঙ্গিতে স্মার্ট সাংবাদিক তরলতায় কবিতা রচনায়।

চল্লিশের 'প্রগতি' কবিতার ধারাকে প্রবহমান ও সঞ্জীবিত রেখেছিলেন পঞ্চাশের তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, যুগান্তর চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও ভাষাভঙ্গিতে ও নির্মাণ কৌশলে বিশিষ্ট ধারায়, কিছু সময় পেরিয়ে শঙ্খ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত মানবিক চেতনার ও সময়-সমাজস্পর্শী কবিতা রচনা করেছেন। পঞ্চাশের দশকে এঁরা সকলে ছিলেন সময়লগ্ন।

বলা যায় কোনো দশকেই পূর্বাপর বিযুক্ত নয়। অতএব ষাটের দশকের ভূমিকা রচনা করেছেন পূর্বসূরিরা। একথা স্মরণে রাখা দরকার ষাটের দশকের কবিরা প্রাতিষ্ঠানিক আনুকুল্য না পেলেও, সমকালীন পরিস্থিতি, সুযোগ, মননমেধা চিন্তাচেতনা ও নিজস্ব মেজাজেই কবিতা সৃষ্টির পথ খুঁজে নেন।

এই দশকে যাঁরা লেখালেখি শুরু করেছিলেন তাঁদের বৃহৎ অংশের কাছে দেশবিদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অন্য অভিজ্ঞতার সঞ্চার ঘটিয়েছিল। মানবিক সত্তাকে ঘিরে ঘনীভূত হচ্ছিল এক অপ্রসন্ন অন্ধকার। আত্ম-চিন্তাচেতনা-সৃষ্ট ও আত্মনিবিষ্ট কবিদের কবিতার বাইরে, দেশকালের সংক্ষুব্ধ দিনলিপি অথবা মাটির কাছাকাছি থাকা সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, যন্ত্রণা ও লড়াই নিয়ে যাঁরা ভাবিত হয়েছেন, অনুভবে অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষভাবে আলোড়িত হয়েছেন, ইতিহসবোধকে বুকে ধরে, ক্রম বদলের অভিজ্ঞানকে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের মাঝে কবি গণেশ বসু হয়ে উঠেছেন এক খরস্রোতা নদীর মতো স্পন্দিত। এক উজ্জ্বল কবিব্যক্তিত্ব। নির্দ্বিধায় বলা যায় বহমান কবিতার ধারায় একজন অন্যতম উত্তরাধিকার। প্রায় ষাট বছরের কবিতাযাপনে শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছিলেন জীবনের সবকটি মাত্রা ও স্তরকে। জীবনের ভিতরের অবিরাম যে দ্বন্দ্ব ক্ষত-বিক্ষত করে আমাদের, তাকে অতিক্রম করে জীবনের কেন্দ্রে থাকা সত্যকে ধরতে চেয়েছেন আমাদের আলোচিত কবি।

কবিতা শব্দ-ভাষায় নির্মিত অবয়ব। কবিতার বাইরের যে রূপ, তা কবির অন্তরঙ্গ অনুভবেরই প্রকাশ। কবিতাকে বোঝাবার জন্য কবির জীবন ও দর্শনকে জানা জরুরি। কবির

জীবনের সমকালীন সামাজিক পরিমণ্ডল জানা থাকলে অনুভবের পরিসর বিস্তৃত হয়। সুতরাং কবির ক্রম-পরিণতির এক সংক্ষিপ্ত স্কেচ এই নিবেদন।

দেশভাগের ঝড়ে বাস্তুচ্যুত। আট বছর বয়স। প্রশ্নভরা মন, বেদনাভরা হৃদয় এবং বিস্ময়ভরা চোখ সেই বালকের। সপরিবারে শহর কলকাতার মাঝখানে এসে দাঁড়ান। দেখতে পান জীবনের মধ্যে অনেক জীবন। 'আট বছর বয়সেই এলাম ফেলে যাওয়া সেনাদের ছাউনিতে/আট বছর বয়সেই পেলাম ছন্নছাড়া স্বদেশভূমি। 'ডানাভাঙা পাখি এলাম এদেশে।/ মেঘের মতো দুলতো তখন সংশয়/ কোড়াপাখির মতো, কুরে কুরে খেত নিরাপত্তার অভাব/ শিকড় বাকড় ছড়িয়ে দিত অনিশ্চয়তা/ছায়ার মতো লেগে থাকতো সন্দেহ।"—একদিকে বাস্তুহারা কিশোরের জীবনসংগ্রাম, অন্যত্র বিশ্বজোড়া শ্রমিক জাগরণ, নতুন যুগের স্বপ্ন কবিকে স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন বামপন্থী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত করে। যে আদর্শ তিনি আজীবন বুকের ভিতর লালন করেছেন। তাঁর তিরাশি বছর বয়সে 'স্মৃতির বিষণ্ণতম ক্ষতার্ত দিবস' (অগ্রন্থিত) কবিতায় তিনি লিখলেন 'কলোনির ভিতর কলোনি/দেশের ভিতরে দেশ মিশ্র জনজাতিদের জনপদভূমি/মুরুব্বি হয়েই আসে ভিন্‌ভাষী কেন্দ্রের মুখোশ।/স্বদেশভাগের কূটকচালিতে/ শরণার্থী জীবনের যন্ত্রণা এখনো বুকে তিরাশি বছরে।/ তবু আমি চোখ তুলি, মুঠো রাখি হাত/ গান গাই, ছবি আঁকি, কবিতাও লিখি/ মাথা না-বিকিয়ে'।

আর পাঁচজন কবির মতন কবির কবিতা অঙ্গনে প্রবেশ প্রেমের কবিতায়। প্রেমের কবিতায়, সে যেন বাঁচার গান শুনিয়ে যায়। জীবন সংরাগের দর্পণ। খণ্ড খণ্ড অনুভবের হীরক দ্যুতি। "আগ্নেয়গিরির গর্ভে তুমি শান্ত দোল পূর্ণিমার। নিবিড় আলপনা হয়ে বেঁচে আছো, বেঁচে আছি আমি/ছিন্ন ভিন্ন সভ্যতার ছায়া হয়ে।" (বনানীকে কবিতাগুচ্ছ-২৩) ব্যক্তিক অনুভূতি কিভাবে সার্বিক বোধের অংশ হয়ে ওঠে স্পষ্ট হয় এই পঙ্‌ক্তি গুচ্ছে: "প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে বেঁচে থাকা অলক্ষ্যে শেখায়/ ভালোবাসা? 'যুদ্ধের ভিতরে নয়, সীমানা পেরোনা/ প্রভুত্ব বিস্তারও নয় ভালোবাসা, দিগন্তরেখায়/ ফোটায় আকন্দ ভাঁট অতসী অপরাজিতা কোনো"। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ কাব্যগ্রন্থের প্রেমভাবনা তাঁর ব্যক্তি ভাবনার গণ্ডী পেরিয়ে প্রসারিত হয়েছে বাস্তব সময়ের বুকে জন্ম নেওয়া সার্বিক অনুভবের।

'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি' প্রবন্ধে কবি বিষ্ণু দে লেখকধর্মী প্রস্তুতির কথা জানাতে বলছেন 'আপন সমস্যাকে শুধু নিজের মনের গহ্বর নিষ্ক্রান্ত স্বয়ম্ভু জীব না ভেবে সে যে ইতিহাসব্যাপী সমস্যারও অংশ, এই উপলব্ধি নিয়তচর্চা লেখকের প্রস্তুতির সহায়। এ চর্চায় বিষয়বস্তুর ও আধারের বিস্তার ঘটে, অধিকন্তু জীবনের ধারা বহুমিশ্রিত সমগ্রতা পায়"। প্রথম কবিতা সংকলনের প্রেমক্ষরিত স্মৃতি অনুভব থেকে নেমে এসে যত তিনি পথ চলেছেন সময়ের সাথে ততই তিনি আক্রান্ত হয়েছেন অস্থিরতায়, হয়েছেন বিচলিত, ক্রুদ্ধ—'প্রতিটি মুহূর্তে ভাবি বিষণ্ণ যুবারা সব কী করে এখনো/ বেঁচে আছে অন্ধকারে, নাস্তিময় শতাব্দীর বিষাক্ত বিবরে.../ এখন যৌবন কাঁদে অন্ধকার সময়ের সাহারা সংকটে/চোখের কোটর জুড়ে অন্ধ

অমা, বুকে জ্বালা আর্তনাদ বাজে।" (নিজের মুখোমুখি/ অন্ধকার সময়ে) 'সোনালি গির্জার মোরগচূড়ায়' কবিতায় যেমন হতাশার উচ্চারণ, সময়ের অস্থিরতা— "সোনালী গির্জার সেই মোরগচূড়ায় আর পৌছনো যাবে না বুঝি কোনোদিন।/ এখানে কেবল/ রক্তের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে/ সংখ্যাহীন মানুষের রক্তের ওপর দিয়ে। সেখানে সমস্ত মৃত প্রেমিকের মুখ ভাসে আশ্চর্য উজ্জ্বল।/ এবং বিবর্ণ সব প্রেমিকার চোখ হয় সজল গভীর/ বসন্তের গানে।"

চারদিকের বিরুদ্ধে ধ্বনির মাঝে নিজের বাস্তবে প্রবেশ করার জন্য অভিজ্ঞতার দরজাটি খুলে ফেলে বলেন—'নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালে প্রতারণা/ অন্ধতা আরো গভীরতর/হাতের নদী এবং পাহাড়গুলোয় সূর্য বিবর্ণ-/ মৃত চিন্তা এবং পাশুটে চুলের মতো/ রক্তহীন।" প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রেমভাবনা ব্যক্তিক পরিসরে আবদ্ধ না থেকে যেমন ছড়িয়ে পড়ে জীবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে তেমনই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের কবিতায় নিজেকে দেখা নিজের দর্পণে, ব্যক্তি সত্তা ও সামাজিক সত্তার দ্বৈতরূপ। একদিকে আপসমুখী, বিপরীতে প্রতিবাদী মানুষের মুখোমুখি অবস্থান। এরপর পরই আমরা পেয়ে যাই 'সমুদ্র মহিষ', 'রক্তের ভিতর রৌদ্র' (১৯৬৯), 'অধিকার রক্তের কবিতার' (১৯৭০), 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' (১৯৭১)। সেই সময়ে সাড়া জাগিয়েছিল 'সমুদ্র মহিষ' সীমান্ত পত্রিকায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'সীমান্ত পত্রিকায় লেখেন 'সম্প্রতি বাংলা কবিতায় যখন সব-ছড়ানো সব-হারানোর যুগ তখন কবি গণেশ বসুকে আত্মীয় বোধ করতে পেরে স্বস্তি পেলাম। মনে হল আমারও 'রক্তের মধ্যে শাস ফেলে দূরন্ত মহিষ'। এই কবিতাটি পাঠ করে কবি বিষ্ণু দে একটি পুরো কবিতা লিখে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কবিকে 'তখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্তমহিষ/ নীলে লাল আহিরভৈরবে, আর দশ প্রহর হাতে হাতে তুলে দেয়/ তোমার কাব্যের খিনি মরণমর্দিনী'। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০-৭১ এই সময় সীমায় 'সারাভারত নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি স্থাপন, ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন, পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন, সিপিআই (এম এল) পার্টির প্রতিষ্ঠা। সমাজ পরিবর্তনের শপথে স্থির। আত্মত্যাগী আদর্শবাদী যুবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, এ সব কবিকে আলোড়িত করে—'রক্তের ভিতরে স্বপ্ন, হাজার হাজার স্বপ্ন, অভিমন্যু আমার অনুজ/ সময়ের বুকে কিছু হাড়গোড়, ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা পড়ে, তৃতীয় পুরুষ উঠে আসে,/ হিংসার জবাবে হিংসা, দুরন্ত দৌড়োয় ঊনসত্তরের দিনগুলি। লাশ ঠেলে ঠেলে/এক একটা স্ফুলিঙ্গ দেখি ছবি হয়ে বসে থাকে কবন্ধের ঘাড়ে'। (রক্তের ভিতরে রৌদ্র) রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে রৌদ্রের উত্তাপ 'ধমনী নিদ্রিত সিংহ ফুঁসে ওঠে রৌদ্রের কেশরে।

সংকটককালেই সমাজের চেতনাজগতে মন্থন হয় সবচেয়ে বেশি। মন্থন থেকেই উঠে আসে সত্য আর মিথ্যা—অমৃত ও গরল। কবিকে জীবনে ধারণ করে নিতে হয় মন্থনজাত গরল আর সত্যকে প্রকাশ করতে হয় শব্দে। 'এখন কেবলি শুনি রুগ্ন ফুসফুসে শুনি

অন্ধকূপ আন্দোলিত গান;/ এখন কেবলি দেখি লক-আপে পিটিয়ে মারা দুরন্ত সাহস/ কখন কেমন যেন কীর্তিনাশা অপরাধ, রক্তে ভরে দেয় নাম: জীবন মমতা, কখন কেমন যেন সমুদ্রকেশরে ফোঁসে ফসফরাস মণি হয়ে সে ধ্বস্ত কিশোর,/ইস্পাতের ফলা হয়ে ঝলসে ওঠে, মুচড়ে দেয় বুকের ভিতর" (সহোদর-বাঘের থাবার নিচে)।

বক্তব্যের কবিতা নয়, কবিতার বক্তব্যই আধুনিক কবির এষণার বিষয়'—লিখেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। 'লেনিন : অধিকার রক্তের কবিতার'। এই আঙ্গিক ও নির্মাণঋদ্ধ দীর্ঘ কবিতাটি কেবল লেনিনবাদের ও লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ নয়, পদ্য গদ্যের ছন্দ তালমিলে, শব্দের মাপা ওজনে কবিতার শরীর গড়ে তুলেছেন ইতিহাস বোধর নিপুণতায়। 'এ-সময় বেজে ওঠে বড়ো,/ পাকদণ্ডী পথে অভিযান/বাঘের পিঠের রাজনীতি....বিপ্লবের যন্ত্রণায়, মায়ের মমতা শুদ্ধ আলো/ হঠারিকার খাদ থেকে/ শোধনবাদের চোরাবালি....ধর্ম ছিঁড়ে খায় মানুষকে, জাত ছিঁড়ে খায় মানুষকে, মানুষকে ছিঁড়ে খায় মানুষ,/তখন সঙ্গীকে ? আগুনের অন্য নাম লেনিন, ইলিচ লেনিন।' এই কবিতা শরীরে মূর্ত অন্ধকার পেরনোর চিত্রকল্প। ভারতবর্ষের বুকে যে আদর্শহীন অনাচার, অত্যাচার, হিংসা, প্রতিহিংসার অন্ধকার, সেই সময়ের প্রতিলিপি। বক্তব্যের কবিতা নয়, কবিতায় বক্তব্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। সমাজ জীবনে ঘটমান ইতিহাসকে তিনি তুলে ধরেছেন ভাবনার সংযত উচ্চারণে।

'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ' (১৯৭১) কাব্যগ্রন্থের মূল বিষয় স্বাধীনতা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, সংগ্রাম, বহু মানুষের প্রাণ বিসর্জনের পর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। ছিন্নমূল হবার যন্ত্রণা বুকে, কলকাতায় চলে আসার ২৩ বছর পর এই নতুন দেশের অভ্যুদয়, গণেশ বসুর হৃদয়ে 'স্বদেশ' কথা বলে। পূর্ববাংলার লড়াকু যুব নেতানেত্রীর সংগ্রামের দুর্মর প্রাণশক্তি। 'তোমার চোখে স্বদেশ কাঁপে আরেক চেতনা/ আত্মঘাতী মিছিলে নয়, স্মৃতি চাঁচরে'। (তোমার চোখে)। 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশে' কবিতায় তিনি মনে করিয়ে দেন— "এ এক দুঃসহ দিন"। এ এক আনন্দ অবাক। স্মৃতির লণ্ঠন ঝাড়। এ-এক বিস্মিত লড়াই। এ-এ দূরন্ত সাহস, স্বাধীনতা। স্বাধিকারে প্রাণমন্ত স্বাদ'। প্রায় ১১ বছর বাদে ১৯৮ হতে প্রকাশিত 'বাঘের থাবার নিচে"। এই এগারো বছর অনেক বদল ঘটেছে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে। তিনিও বদলেছেন তাঁর ভাবনাচিন্তায়, যাপিত জীবনে। 'জঙধরা লোহার মতো তাঁর কথা এখন ছেঁড়া মেঘের গান,....বাঘের থাবার নিচেই এখন তাঁর স্বপ্ন....তাঁর রোদ্দুর'। কবির বয়স এখন বিয়াল্লিশ। অধ্যাপনা করেছেন। ঘুরে এসেছেন জার্মানি। তাই তিনি বলতে পারেন পরিণত উচ্চারণে 'দিনগুলো নয় কচি রোদের পালিশ করা স্তন/বুঝতে পারি, বুড়ো ঘোড়ার ঘাড়ের ধনু খ্যাপাটে যৌবন'। 'কে জানত এ দেশে অধ্যাপক মানেই করুণা/অধ্যাপক মানেই মন্ত্রী আমলার গেরো, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের পাঁচালি/ অধ্যাপক মানেই সরকারের টালবাহানা, বিশ্বাসঘাতকতার দলিল'। ১৯৮২ এর পর ১৯৯৯তে প্রকাশিত হয় কাব্যগন্থ 'নীরব সন্ত্রাস', ব্যক্তিগত জীবনে সহকর্মী অধ্যাপকদের অসহনীয়

আচরণে, ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি মনে করলেন এ যেন লাল-নীল-গেরুয়া সন্ত্রাসের থেকেও ভয়ংকর এক সন্ত্রাস যা দেখা যায় না। শিরায় শিরায় উপলব্ধি করা যায়। এ কেবল নিজের ক্ষেত্রে নয়, গোটা দেশ নীরব সন্ত্রাসে আক্রান্ত। দীর্ঘ কয়েক বছর কবির কলম নীরব থাকার পর নতুন উদ্যমে সন্ত্রাসের, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা সোচ্চার। 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন', 'ভাসান দরিয়া' ও 'ভাঙা বইঠার গান'—সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতি অবস্থার পটপ্রেক্ষায় মানুষের যন্ত্রণা, ছিন্নমূল মানুষের কান্না, আদর্শের, মানবিকতার অপমৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেন: 'ক্ষমতার চিটেগুড়ে সাদা-কালো ভেন্ন নয়, জানে নীলমাছি।' কবিকণ্ঠে বেজে ওঠে কোথায় নিয়ে যাও, কোন অন্ধ কবন্ধের দেশে/ মর্গের মাদল বাজে উচ্ছন্নের বরমুদ্রা শ্মশান উৎসব।" 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন' কাব্যগ্রন্থের একটি অসাধারণ কবিতা 'আর্কিমিদিস'। আর্কিমিদিস একজন গণিতজ্ঞ। সিরাকিউজ নগরীতে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় রোম সেনাপতির আদেশ সত্বেও একজন সৈনিক সেনাপতির কাছে যেতে বলায় তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করলে সৈনিক তার শিরোচ্ছেদ করে। ক্ষমতা স্পর্ধার এই প্রকাশ। তার বিরুদ্ধে—কবির প্রতিবাদ—'সিরাকিউজের ডানা ছিন্নভিন্ন। ক্ষমতায় সেঁকে নেয়া এক/ রোমানের স্পর্ধা ফোঁসে। উদ্যত খড়্গের ছায়া কেঁপে যায়। তাকাকলেন তিনি।.....সাবধান। রক্ত যেন মাটিতে পড়ে না।"

কবি ইঙ্গিত রেখে যান মাটিতে রক্ত পড়লে সেই মাটিতে জন্ম নেবে ক্ষমতা বিরোধী বিদ্রোহীর। এক নির্মম সত্য উচ্চারণ 'মনে রেখো/ ভোটের আনন্দ মাত্র একদিন। /একদিন/নিছকই একটি দিন গণতন্ত্র, বাক্-স্বাধীনতা। ড: জলগোপাল মণ্ডল সম্পাদিত 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ অনুসারে কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা ২০। কবিতা যাপনের কাল সীমা ১৯৬৩ (অমৃত পত্রিকায় বনানীকে নিয়ে একটি কবিতা প্রকাশ ২০২৩-এ প্রকাশিত একটি দীর্ঘ কবিতা 'খুঁজি-'গভীর গভীরতর চেতনার শিকড় বাকড় জল সৃজনের বহুধা বিস্তার,/ চাপানো ইচ্ছারও দাস দাসত্বেরই শিল্পিত বাহার।... আমারো বিপর্যয় কখনো স্বীকৃত/কখনো বৃত্তের; আমাদের বিপর্যয় সময়ের, সমাজের, বোধের বিকারে/" (শ্লোক শারদ সংখ্যা-২০২৩)। শরণার্থী জীবনের অপমান অবহেলা, দুঃখকষ্ট, জীবন-জীবিকার যন্ত্রণা, লড়াই জীবিকার জন্য বিভিন্ন রকমের পেশার সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হয়েছে পূর্ণ, ঋদ্ধ। জীবনকে তিনি দেখতে পেয়েছেন এক বড়ো ক্যানভাসে। মার্কসবাদী দর্শনে সুদৃঢ় বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছে মনুষত্য ও মানবিকতার বোধ। এ সব কিছুরই মিলিত দর্শনই কবি গণেশ বসুর কবিতাভুবন। কবিতার স্থানিক ও কাল সীমাকে অতিক্রম করে কবি প্রসারিত করেছেন কবিতার পরিসর। তিনি বিশ্বাস করেছেন শব্দই কবিদের আশা ভরসা, আশ্রয়স্থল। 'সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার'। কবিতা সংগ্রহের ভূমিকা কবি বলছেন 'শব্দই কবিতার কারু। তাতেই আমাদের আশ্রয়, অনিবার আশা।' এর পরেই তিনি সময়ের কথা বলছেন—"এখন সীমাহীন দুর্ভোগ, অনিঃশেষ অভিযোগ, নিদারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখ কষ্ট; অবক্ষয় ও আত্মপীড়ন; বশ্যতা ও বিক্ষোভ, গণতান্ত্রিক একনায়কতা ও জাতিবৈরিতা; ম্যাকার্থিবাদের আগ্রাসন জিঙ্গোবাদের ভয়াবহতা।' তার বিশ্বাস ও নির্ভরতার

প্রকাশ শব্দশক্তির উপর নির্ভর করে কবির সারাজীবনের কবিতাভুবন। 'নিজের মুখোমুখি' মতাদর্শের আন্তরিক অঙ্গীকার, সমাজ-বোধের নান্দনিক চেতনা যেমন পাই, তেমনই 'বলগা হরিণের শিং' (২০১৫) কাব্য গ্রন্থের কবিতাতে আমরা পাই শাসকশ্রেণীর জঘন্য অমানবিক সন্ত্রাসের রূপ। 'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যগ্রন্থের কবিতা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বিস্ফোরণ 'শেয়ালে শকুনে আজ ছিঁড়ে খায় মজ্জা মাংস চেতনার ঘিলু'। মানুষের পাশবিক রূপ প্রকটিত হয় 'ক্ষমতার স্বাদ পেলে কেউ কেউ হয়ে ওঠে মাতাল গণ্ডার।' শেষ পঙক্তিতে এসে অনির্বাণ প্রশ্ন— 'নিখিলের ঘোড়াগুলো কেন যে এমনভাবে বদলে যায় মাতাল গণ্ডারে'? বোধের উচ্চারণে প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের কবিতায় কবির ভাবনায় সমাজ সত্য ও জীবন সত্য শব্দের প্রতিমায় মূর্ত করে তোলেন। ২০১৫-এ প্রকাশিত 'বলগা হরিণের শিং' প্রকাশিত হবার পর কবিতা সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা পাই—'আপাতত' (২০১৬) 'মেনুতে মেঘমালা' (২০১৭), 'শহিদ চড়ুই' (২০১৮) 'মানবতা অদ্ভুত নীরবতা' (২০১৯), 'ডিকটেটর' (২০২০), 'করণি ক্যাকটাস (২০২১-২২), 'অন্তিম আলোয়' (২০২১-২২), দাদানের দরবার (২০২১-২২)। এই আটটি কাব্যগ্রন্থে নিবিড় পাঠে যথার্থই প্রতিভাত জীবন জগতের, রাজনৈতিক বিশ্বাসে তিনি কতটা অবিচল।

আমরা সবাই সাধারণভাবে গণেশ বসুকে কবি হিসেবেই প্রধানত চিনি। কবি খ্যাতির আড়ালে রয়ে যায় তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর গভীর পড়াশোনা, চিন্তার ব্যাপ্তি ও মৌলিকতার পরিচয় পাই প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সাংবাদিকতায় কার্লকার্মস'। ভূমিকা অংশে তিনি জানান 'স্বর্গ তখন দ্বিখণ্ডিত। পূবে পশ্চিমে জার্মানভূমি বিভক্ত। সেই পরিস্থিতিতে ১৯৭২-এ আমান্ত্রিত হয়ে সাংবাদিকতায় ট্রেনিং নিতে যাই পূর্বে, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম'। সেই অভিজ্ঞতারই ফসল প্রবন্ধগ্রন্থটি। আমরা জানা ও পড়া দুটি অগ্রন্থিত প্রবন্ধ (১) 'আপন বাপন' যা মূলত স্মৃতিচারণ ও তাঁর জীবনের কথা। (২) 'কথায় কথায় শ্লোক'—এই প্রবন্ধটি লিটল ম্যাগানিজ-এর ভূমিকা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা ছাড়াও ইতিহাস-বোধে উদ্দীপিত একটি বিরল সন্দর্ভ।

কবি গণেশ বসু'র কবিতাপাঠের অভিজ্ঞতা আমাদের হাত ধরে এনে দাঁড় করিয়েছে। সময়ের সত্যের কাছে। জীবনকে নগ্ন করে খুলে দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেছি। অস্তিত্বের ভিতরে যে ভয়ংকর লুকিয়ে আছে তাকে প্রকাশ করে দেবার প্রেরণা পেয়েছি। সভ্যতার নোনা পলেস্তারা খুলে ফেলে আসল চেহারা দেখতে চেয়েছি। বুঝতে পেরেছি প্রতিষ্ঠানই অপশক্তির লালনক্ষেত্র। আমরা বুঝে যাই সভ্যতার মেকি রং তুলে ফেলে চামড়ার আদিম লাবণ্যের যে আভা-তাই কবিতা।

**তথ্যসূত্র :**

গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড : সম্পাদক ডঃ জয়গোপাল মণ্ডল।
সাহিত্য অঙ্গন : কবি গণেশ বসুর ৮০' সংখ্যা : সম্পাদক : ড: জয়গোপাল মণ্ডল।

# কবি গণেশ বসুর 'সমুদ্র মহিষ' ও 'নিজের মুখোমুখি' হয়ে লেখা অন্যান্য কবিতা কবি গণেশ বসু

**স্বরাজ কুমার দাশ**

গণেশ বসু ষাটের দশকের কবি। বিধ্বস্ত সময়পর্বের দাবদাহে ঝলসানো কবিতা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কলমে। সব কবিতাই হল কবির নিজের মুখোমুখি হয়ে ফুটে ওঠা শিল্পিত আত্মপ্রতিকৃতি। বিশেষ করে গণেশ বসুর কবিতার ক্ষেত্রে আরও বেশি করে এই কথা প্রযোজ্য। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নামই হল "নিজের মুখোমুখি" (১৯৬৭)। এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতা কবির যাপিত সময়ের শাব্দিক অভিজ্ঞান। এর কবিতাগুলিকে আত্তীকরণ করতে হলে ষাটের দশকে কবির যাপিত সময়কে জরিপ করতে হবে। স্বাধীনতা দেশবাসী তথা বাঙালিদের মনে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সবাই ভেবেছিল দেশ স্বাধীন হলে দেশ হয়ে উঠবে সব পেয়েছির দেশ। কিন্তু সেই স্বপ্নে বিরাট ফাটল ধরা পড়ল দশ-বারো বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই। খণ্ডিত স্বাধীনতার সাথেই দেশবাসী উপহার হিসেবে পেয়েছিল উদ্বাস্তু সমস্যা ও খাদ্যসংকট। দেশবাসী দেখেছে ১৯৫০-এ শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুর ভিড় ও প্রবল খাদ্যসংকট। ৩১ আগস্ট ১৯৫৯-এর খাদ্য সংকটের স্মৃতি ছিল এইরকম :

"ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে ৩১ শে আগস্ট দিনটি কোনদিন মুছে যাবে না। খাদ্য চাই, খাদ্য দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও এই স্লোগানে কলকাতায় রাজপথ মুখরিত হয়েছিল ৩১ শে আগস্ট ১৯৫৯।"[১]

বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন বলেছিলেন "খাদ্যাভ্যাস পাল্টাতে হবে। ভাতের বদলে কাঁচকলা খেতে হবে ইত্যাদি।"[২] ১৯৬৮ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হল। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলে শুরু হয় নকশালবাড়ি আন্দোলন। জমির নতুন বন্টন ব্যবস্থা, শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, মহার্ঘভাতা, সারাদেশে কুড়ি হাজার কর্মচারী গ্রেপ্তার, ১৯৫১-তে কোচবিহারে ভুখা মিছিল, ১৯৫৩ সালের এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৫৪-এর শিক্ষক ধর্মঘট, ১৯৬২-এর ভারত-চীন যুদ্ধ ইত্যাদি বহু ঘটনার তাপ-উত্তাপে যাপন করতে হয়েছে পঞ্চাশ-ষাটের কবিদের। ষাটের কবিতার আলোচনার প্রেক্ষাপটে ষাটের দশকের এই আর্থরাজনৈতিক বিপন্নতা একটা বড়ো কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে।

'নিজের মুখোমুখি' কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে বহুপঠিত কবিতা 'সমুদ্র মহিষ'। এই কবিতাটির জন্য গণেশ বসু অমর হয়ে গেছেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় মার্চ ১৯৭৩-এ প্রকাশিত হয় 'স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় কবিতা' (প্রকাশক-ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট)। এই গ্রন্থে গণেশ বসুর 'সমুদ্র মহিষ' কবিতাটি স্থান পেয়েছে। কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তি 'এখন রক্তের

মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ' প্রবাদের মতো মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হয়েছিল সেকালে। মাত্র তেরো পঙ্‌ক্তির ছোটো কবিতা, অথচ তার মধ্যে রয়েছে কবি-হৃদয়ের আত্মবিস্ফোরণ। গণেশ বসুর কবিতাগুলির একটি সম্পাদিত ও সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন কবি-অধ্যাপক ড. জয়গোপাল মণ্ডল। তিনি 'সমুদ্র মহিষ' কবিতাটি সম্পর্কে সঠিক সমালোচনা করে বলেছেন :

"কবি গণেশ বসুর 'সমুদ্র মহিষ' কবিতাটি 'নিজের মুখোমুখি' নামক দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। আত্মানুভবে দেখেছেন সমাজসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার দ্বিমুখী রূপ; একদিকে ব্যক্তি মানুষের সুখ সন্ধান, অন্যদিকে আপসহীন অন্তরে গুমরে ওঠা প্রতিবাদ পরস্পর মুখোমুখি। কবি এই দুই সত্তার গভীরে প্রবেশ করে খুঁজেছেন উদ্বোধনের পথ। আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মবিস্ফোরণ ঘটেছে 'সমুদ্র মহিষ' কবিতায়।"[৩]

'সমুদ্র' ও 'মহিষ' শব্দদুটি একসাথে উচ্চারিত হয়ে একটি শব্দের মতো কাজ করছে এখানে। উপমেয় ও উপমানের অভেদ ঘটে রূপক অলংকার হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তিই হল চিত্রকল্প 'মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্রমহিষ'। 'সমুদ্র' শব্দের সঙ্গে সমুদ্র মন্থনের প্রসঙ্গ উঠে আসে দেবতা ও অসুরের দ্বন্দ্বে উঠে এসেছিল অমৃত ও বিষ। তেমনই মহিষাসুরের জন্ম মহিষ ও মানুষের মিলনে। বিষ ও অমৃত, পশু ও মানুষ এই দ্বিবিধ সত্তার উপস্থিতি 'সমুদ্রমহিষ' শব্দবন্ধে আছে। মানুষ নিজেই তো এই দ্বিবিধ সত্তার একীকরণ। মানুষ নিজেই বিষ, নিজেই অমৃত, নিজেই পশু, নিজেই মানুষ, নিজেই মন্দ, নিজেই ভালো, নিজেই অসুর, নিজেই দেবতা। এই দ্বিবিধ সত্তার আত্মমন্থন চলে মানুষের নিজের মনের মধ্যে বিশেষ করে সংবেদনশীল কবির হৃদয়ে—এই দ্বন্দ্ব আরও বেশি সক্রিয়। কবি তাই বললেন :

"মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্রমহিষ
আমার ভেতর বুকে ফসফরাস,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে, বাহুর পারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল।"[৪]

সমগ্র কবিতাটি জুড়ে আছে কবিহৃদয়ের এই দ্বান্দ্বিক আত্মমন্থন। নিজের মন্দত্বের কারণে কবি নিজেকে অপরাধী ভাবছেন "তখন নিজেকে বড়ো অপরাধ, ছত্রীসেনা নেমে পড়ে কোনো পর্দার আড়ালে..."। এত অস্থিরতা, এত 'চুল ছেঁড়া' আত্ম-বিস্ফোরণ, অসহায় আর্তনাদ সবই সংবেদনশীল হৃদয়ের দ্বন্দ্বের কারণে। এর থেকে কবির নিস্তার নেই; এই এই আত্ম-বিস্ফোরণ রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। কবি তাই শেষ পঙ্‌ক্তিতে বললেন, "এখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ।" এই আত্ম-বিস্ফোরণের নাম জীবনানন্দ দাশ দিয়েছেন 'বোধ'। সাধে কী আর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার নায়ক আত্মহত্যায় মুক্তি পেতে

একগাছা দড়ি হাতে আত্মহত্যা করতে ছোটেন? এই অন্তর্দাহ লক্ষ করা যায় গণেশ বসুর 'সোনালি মোরগ' কবিতাতেও :

"এ-এক অন্তর্দাহ, ক্রেন আর ট্রাক্টরের ভিড়ে
হারিয়ে যাবার আগে পিছুটান, দুঃখবোধ, অন্ধকারগুলি
দাঁতের করাত তীক্ষ্ণ, দ্বিধাদ্বন্দ্বে হত্যার ভূমিকা।"[৫]

জীবনানন্দের নায়কের মতো কবির দ্বিধাদ্বন্দ্বের হৃদয় এখানেও আত্মহত্যাপ্রবণ।

অবসাদ আর ক্লান্তি জীবনানন্দের মতো গণেশ বসুর কবিতাতেও বারবার দেখা গেছে। কবি তাঁর অস্তিত্ব জুড়ে অন্ধকার, শূন্যতা আর অবসাদকে অনুভব করেন :

"সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে অন্ধকার, স্মৃতিময় অপার শূন্যতা!
এখন নিভৃতে তাই আত্মহত্যা আমাদের পরম প্রার্থনা।"[৬]

কবি বুঝেছেন, আত্মহত্যা ছাড়া পৃথিবীতে উজ্জ্বল সময় আর কখনো আসবে না "আত্মহত্যা ব্যতিরেকে বুঝি আর কোনোদিন কাহারো জীবনে/উজ্জ্বল সময় কভু আসিবে না।"[৭] শূন্যতা আর হাহাকার ভরা জীবনবোধ কবির সত্তাকে রক্তাক্ত করে তোলে সর্বদা "বুকের প্রদেশে আমার বন্ধ্যাভূমির হাহাকার"।[৮]

কবি বলেছেন :

"এখন যেদিকে তাকাই শিশুর মৃতদেহ, যুবতীর
অনাবৃত অস্থি আর
আমাদের অলৌকিক ছায়া
আত্মহননের অতল গহ্বর
হিংস্রতা।"[৯]

গণেশ বসুর কবিতা 'নিজের মুখোমুখি' হয়ে লেখা কবিতা। নিজের আত্মপ্রতিকৃতি দেখে কবি নিজেই চমকে ওঠেন, "নিজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি, আমার/মুখের রেখাগুলি বিকৃত, হাতের সমতলে/পর্বতশৃঙ্গের অনুর্বরতা, এবং বুকের মধ্যে/আগ্নেয়গিরির দৃশ্যমালা।"[১০]

কবি এখানে থেমে থাকেননি, আরো সুস্পষ্টভাবে সরাসরি বলেছেন :

"নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালে প্রতারণা
অন্ধতা আরো গভীরতর
হাতের নদী এবং পাহাড়গুলোয় সূর্য বিবর্ণ
মৃত চিন্তা এবং পাঁশুটে চুলের মতো
রক্তহীন।"[১১]

শুধু নিজের দিকে তাকিয়ে নয়, পরিচিত মানুষের মুখেও ফুটে উঠতে দেখেছেন সেই একই অসুখ "পরিচিত মানুষের মুখে কিসের গভীরতা। বিভীষিকা/প্রাচীন তান্ত্রিকের অট্টহাসির

মতো, আমার/কণ্ঠনালী ছিঁড়ে যায়।"[১২] 'সুচেতনা' কবিতায় জীবনানন্দ যুগের হিংস্রতায় মূক হয়ে যাওয়া বুদ্ধ-কনফুসিয়াসের কথা উল্লেখ করেও 'সুচেতনা'র আগমনের মৃদু আশা শুনিয়েছিলেন "সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ" একথা উল্লেখ করে। কিন্তু গণেশ বসুর কবিতায় মনীষীরা সেইটুকু আশ্বাসও দিতে পারেন না। কবি বলছেন :

"এখন পৃথিবী জুড়ে নর আর নারীদের শুধু অভিনয়
নিপুণ প্রবল।
এবং নিভৃতে তাই অসহায় সক্রেটিশ, আরিস্টটল
তথাগত বুদ্ধ, খ্রিস্ট, কনফুসিয়াস মৌন যন্ত্রণায়
কেঁদে যায় অবিরল শূন্য হতে মহাশূন্যতায়।"[১৩]

—এ যেন অনন্ত দীর্ঘশ্বাস, তিনি বিস্ময় চেতনায় যেন অবাক বিশ্বকে নিয়ে চিন্তিত—

"লেনিন স্তালিন কিংবা মাওয়ের নাম ভুলে যাবে অনায়াসে;
হয়তো তখন জিশু বুদ্ধ সক্রেটিস প্লেটো কিংবা আরিস্টটল
অবিরল কেঁদে যাবে অনিকেত অন্ধকারে; প্রতিটি প্রহর
সর্বনাশে উল্লসিত।"[১৪]

প্রেম একটা আশ্রয়, সান্ত্বনা। জীবনানন্দ এই কারণে এত ক্লান্ত হয়েও বনলতার 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'-এ আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথও আশ্রয় নিয়েছেন, তবে প্রেমের মধুর স্মৃতিচারণার মধ্যে। 'শাশ্বতী' কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ বলছেন "স্মৃতি পিপিলিকা তাই পুঞ্জিত করে আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা।" কিন্তু গণেশ বসু প্রেম বা ভালোবাসার প্রতি সর্বদা অবিশ্বাসী। কবি বলছেন :

"হৃদয়ে হৃদয়ে ঘৃণা বড়ো
বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি কাঁপে থরো থরো
অনুরাগ, স্নেহ, প্রেম, করুণা ইত্যাদি
কাগজে কলমে শুধু, প্রাত্যহিক জীবনে সমাধি
হয়ে গেছে তার
অনন্ত বঞ্চনা আজ ঊর্ধে নিম্নে দিগন্ত বিস্তার।"[১৫]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রেমের প্রতি এই অবিশ্বাস দেখিয়েছিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও "প্রেম বলে কিছু নাই...চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।" প্রেম না-পাওয়ার জগৎ থেকেই তৈরি হয়েছে কবির মনে অপ্রেমের পদাবলি।

কবির শব্দ-লালনে উচ্চারিত হয়—

"দীর্ঘদিন আমি গান শুনিনি, আমি
অপ্রেমের ঘরে বন্দি ছিলাম।
ভালোবাসা পুরনো ছুরির মতো অপ্রয়োজন।"[১৬]

প্রেমের মধুর স্মৃতি কবিকে বারবার ব্যথিত করে :

১। তেপান্তরে তোমার স্মৃতির অশ্বক্ষুর
অনেক দূর
কিন্তু তুমি, এখন শুধু শূন্যতার
স্মৃতির ভার
জ্বালিয়ে দ্যায়, পুড়িয়ে দ্যায় আমার বুক;
হিংস্র মুখ
বাঘিনিদের থাবার নখে ভয়ংকর
রক্ত ঝরে মনে আমার নিরন্তর।।[১৭]

২। তোমার যৌবনে আমি ফিরে যাবো কল্যাণী আমার
স্মৃতির ধূসর পথ পার হয়ে, অজস্র পাহাড়
ডিঙিয়ে উজ্জ্বলতর বৃত্তের নিকটে।[১৮]

৩। অথচ সেদিন ছিলে তুমি
কী ভীষণ অমিত নিকটে
ছিলো এ হৃদয়ে বড়ো আশা।[১৯]

৪। পেছনের দিকে তাকাতে পারি না আর
স্বাভাবিক প্রত্যয়ে
কেননা সেখানে স্মৃতিময় সত্তার
ছায়া ঘোরে নির্ভয়ে
শ্মশানের বুকে জমাট অন্ধকার
মহাসুখী এ-হৃদয়ে।[২০]

৫। ...স্মৃতির তোরণ/তোমাতে নির্মাণ তাই...[২১]

৬। এবার বুঝি নিজের দিকে তাকাতে হবে ফিরে
কীর্তানিয়া, শুনতে হবে স্মৃতির পদাবলি।[২২]

এই পংক্তিগুলি প্রমাণ করে দেয় প্রেমে দোদুল্যমান করে মন, দীর্ণ করে—আবার কবিকে আহত করে যখন, তখন প্রেমের স্মৃতিচারণায় স্রষ্টা সৃষ্টির অনাবিল আনন্দে শুশ্রূষা লাভ করে।

পরিশেষে গণেশ বসুর কবিতার আঙ্গিক নিয়েও আলোচনা করা দরকার। তাঁর অধিকাংশ কবিতা মিশ্রকলাবৃত্তে রচিত। কখনো কখনো অন্তমিল যুক্ত মুক্তক ছন্দের চালে প্রবহমানতা লক্ষ করা যায়। যেমন :

"যখনি গভীরে দেখি আমি ১০
অগ্রজ অনুজ কিংবা/সমকাল বন্ধুরাও/যেন অনুগামী ৮ + ৮ + ৬

বিনষ্ট পুষ্পের কোনো/ স্মৃতি নিয়ে বুকে৮ + ৬
কী নিষ্ঠুর কালের কৌতুকে ১০
অধুনা একাকী। ৬
অথচ রজনী ছিলো বাকি, ১০
ছিলো কতো বন্দরের/স্বপ্ন ভবিষ্যৎ, ৮ + ৬
কিন্তু আজ মিথ্যা যেন,/প্রতারণা শিল্পের শপথ।[২৩] ৮ + ১০

উপমা ব্যবহারে গণেশ বসু সিদ্ধহস্ত। বাস্তব জীবন থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন উপমা ও চিত্রকল্প। জীবনানন্দ দাশের পরে বাংলা কবিতায় এত ভালো উপমা ব্যবহার আর কোনো কবি করেননি। যেমন :

১। ...দেয়ালের গায়ে
লটকে থাকবে শুকনো দেহটা।
ভাঙাচোরা ফ্রেমের মতো।[২৪]

২। ...পত্রহীন হেমন্তের বৃক্ষের মতন
প্রসারিত বাহু মেলে অশ্রুময় পৃথিবীর বিষাদ প্রান্তরে
একাকী দাঁড়িয়ে রয়।[২৫]

৩। দূরবর্তী পাহাড়চূড়ায় রক্তাক্ত লাশের মতো
নির্জনতা।[২৬]

৪। ভোরের মতো নির্জন হলো মাঠের গল্পগুলো...।[২৭]

৫। তোমার চুল আমার কাছে অসহ্য
গ্রীষ্মের মতো প্রচণ্ড।[২৮]

'হয়তো' 'তবু', 'কিন্তু', 'হেমন্ত', 'অন্ধকার' ইত্যাদি শব্দের বহু ব্যবহারে জীবনানন্দের কবিতা যেমন চিহ্নিত করা যায়, তেমনি গণেশ বসুর কবিতাতেও এইরকম কিছু সাধারণ শব্দের বহু ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জীবনানন্দের প্রিয় রঙ 'ধূসর' বা 'হলুদ'। গণেশ বসুর প্রিয় রঙ 'লাল' বা 'সোনালি'। তাঁর দুটি কবিতার নামই হল 'সোনালি গির্জার মোরগচূড়া' এবং 'সোনালি মোরগ'। 'রক্তাক্ত', 'মোরগ', 'মহিষ', 'অন্ধকার', 'এখন', 'এবার', 'মাঝে মাঝে' এইসব শব্দ গণেশ বসুর কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে তাঁর কবিতার পরিচিতি বাহক হয়ে উঠেছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. সোমেন পাল, খাদ্য আন্দোলনের স্মৃতি, পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন (সম্পাদক- অসিতকৃষ্ণ দে), কলকাতা, অতিথি, ১ম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৯
২. ড. সরোজমোহন মিত্র, বামপন্থী আন্দোলনের ধারা, পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন (সম্পাদক- অসিতকৃষ্ণ দে), কলকাতা, অতিথি, ১ম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৬

৩. ড. জয়গোপাল মণ্ডল (সম্পা), পরিচিন্তন (সম্পাদকের কথা), গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০২০
৪. গণেশ বসু, সমুদ্র মহিষ, গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ (সম্পাদক- ড. জয়গোপাল মণ্ডল), কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৪৮
৫. গণেশ বসু, সোনালি মোরগ, তদেব, পৃ. ৪৮
৬. গণেশ বসু, অন্ধকার সময়ে, তদেব, পৃ. ২৯
৭. তদেব, পৃ. ২৯
৮. গণেশ বসু, তারপর, তদেব, পৃ. ৩৩
৯. গণেশ বসু, আত্মপ্রতিকৃতি দেখে, তদেব, পৃ. ৪৩
১০. তদেব, পৃ. ৪৩
১১. গণেশ বসু, নিজের মুখোমুখি, তদেব, পৃ. ৪৫
১২. গণেশ বসু, মাথায় সিংহ, দু'পায়ে পতন, তদেব, পৃ. ৪৪
১৩. গণেশ বসু, চব্বিশ হলো না শুরু, তদেব, পৃ. ২৮
১৪. গণেশ বসু, অন্ধকার সময়ে, তদেব, পৃ. ২৯
১৫. গণেশ বসু, চব্বিশ হলো না শুরু, তদেব, পৃ. ২৭
১৬. গণেশ বসু, স্বপ্ন, তদেব, পৃ. ৩৪
১৭. গণেশ বসু, রক্ত ঝরে নিরন্তর, তদেব, পৃ. ৩৪
১৮. গণেশ বসু, বৃদ্ধের ডায়েরি থেকে, তদেব, পৃ. ২৪
১৯. গণেশ বসু, স্মৃতি আজ বিবর্ণ ধূসর, তদেব, পৃ. ২৫
২০. গণেশ বসু, এ বুকে, তদেব, পৃ. ২৬
২১. গণেশ বসু, স্বীকারোক্তি, তদেব, পৃ. ৩৫
২২. গণেশ বসু, কীর্তনিয়া, তদেব, পৃ. ২৯
২৩. গণেশ বসু, চব্বিশ হলো না শুরু, তদেব, পৃ. ২৭
২৪. গণেশ বসু, সোনালি গির্জার মোরগচূড়া, তদেব, পৃ. ২৩
২৫. গণেশ বসু, অন্ধকার সময়ে, তদেব, পৃ. ২৮
২৬. গণেশ বসু, আবহমান : আমার গল্প, তদেব, পৃ. ৩২
২৭. গণেশ বসু, তারপর, তদেব, পৃ. ৩৩
২৮. গণেশ বসু, শূন্যতার পাশাপাশি, তদেব, পৃ. ৩৭

## ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে
### হাসি বসু

অনেক কথাই জানা হলো না, আর কোন দিন হবেও না কারণ তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে আমার গলার মধ্যে এক অব্যক্ত ব্যথা রেখে। হ্যাঁ আমি ষাটের দশকের উজ্জ্বল নক্ষত্র, কবি গণেশ বসুর কথাই বলছি।

সবার শ্রদ্ধেয় কবি গণেশ বসু আর আমাদের অসম বয়সী বন্ধু যাদবপুর কফি হাউসের বুধবার আর রবিবারের আড্ডার গণেশদা। খুবই কম সময়ের আলাপে গণেশ দা'র কাছে এতো স্নেহ পেয়েছি যা আমি লিখে শেষ করতে পারবো না। যখনই দেখা হতো ওঁর অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের অপরিসীম ভান্ডার আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করতো। বেশ কয়েকদিন ওঁর বাড়িতে যাওয়ায় সৌভাগ্য হয়েছিল আমার, 'বসুধারা'র দরজার দুপাশে এখনো রঙ্গন আর জুঁইফুলের স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে রয়েছে, চলে গেছেন ছোট আকৃতির, বিশাল মাপের মানুষ কবি গণেশ বসু।

জন্মেছিলেন ১৯৪০ সালের ১লা ডিসেম্বর, বরিশাল জেলায় (অধুনা বাংলাদেশ)। ছোট বয়সে কলকাতায় আসেন উদ্বাস্তু হয়ে। বড়ো হওয়া, শিক্ষা জীবন  সবই কলকাতায়। কর্মজীবন শুরু করেন গাড়ি সারাইয়ের কারখানায় শ্রমিক হিসেবে, তারপর তিনি গৃহ শিক্ষক থেকে বিভিন্ন স্কুলে এবং সব শেষে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনা করেন ২০০১ সাল পর্যন্ত। ছাত্র অবস্থায় তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, খাদ্য আন্দোলনের ছাত্রমিছিলে পুলিশি আক্রমণের শিকারও হন।

গণেশ বসুর মোট উনিশটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি শিশু-কিশোর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ডি ডি জে পুরস্কার (১৯৭৩ সাল), মঙ্গলাচরণ চট্টপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (২০০৬ সাল), 'ভারতচন্দ্র' (২০১৮ সাল) এই সমস্ত পুরস্কার ছাড়াও দেশে বিদেশে অনেক সম্মাননা পান তিনি। বিদেশি সাহিত্যের অনেক অনুবাদও করেছেন।

ড. জয়গোপাল মন্ডলের সম্পাদনায় 'কবি গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ 'পড়তে বসে প্রথমেই দেখি কবি গণেশ বসু লিখেছেন "সময় ফুরিয়ে এলো। নানাবিধ ঝড়ঝাপটা উপেক্ষা লাঞ্ছনা অসূয়া সইতে সইতে যে কোনো মুহূর্তে আমি চলে যেতে পারি বিস্মৃতির অতল আঁধারে। তবু ছাইপাঁশ যা যা লিখেছি, চেষ্টা করেছি কিছু কিছু বলতে,  সেসব দিয়েই ছিটেফোঁটা ভালোবাসাও পেয়েছি কখনোসখনো, কারো কারো থেকে তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

আবার লিখেছেন "কবি স্রষ্টা, কবি গেরিলা যোদ্ধাও। কবি চলমান ইতিহাস, আবার ভবিষ্যতের স্বপ্ন ব্যক্তি, সমাজ ও সময়ের চেতনাও তো কবিরই কলম। কবির পা থাকে মাটিতে প্রোথিত, মস্তক আকাশে। পৃথিবীর মুখই কবির মুখ।"

এইরকম ভাবে কে লিখতে পারে? কে-ই বা এমনভাবে বিনয়ের সঙ্গে আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে তা আমার জানা নেই।

তাঁর লেখা কয়েকটি কবিতার কিছু পঙক্তির উল্লেখ করছি :

'যোগ্যতা'

"সহিষ্ণুতা বাষ্পীভবন
অন্ধ 'আমি'র গোগ্রাসে
বিজ্ঞানেরও দফারফা
অপজ্ঞানের সোল্লাসে
বন্দি মনন, বিকোয় মেধা
বিশ্বায়নী ছাইপাঁশে
বুলেট কামান গুঞ্জরিত
হিটলারীয় বিশ্বাসে
যাদের যেমন যোগ্যতা
শাসক জোটে তেমনি তাদের
প্রত্নপুরাণ বৈধতা।"

এই কবিতা এখনো ঠিক ততোটাই প্রাসঙ্গিক, যতোটা সেই সময়ে তিনি লিখেছিলেন। এ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া।

'মেনুতে মেঘমালা'

"অভিযোগ নেই আক্ষেপও নেই কোনো
মেনুতে মধ্যবিত্তের মেঘমালা
রিক্ততা যদি প্রিয় পরিণাম অপেক্ষা কার জন্য?"

এখানে নির্বিকার মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্র এঁকেছেন।

'ক্ষমা করো'

"কেন বয়ে যেতে হবে, মা-বাবার মুহূর্তের বিলাসবীজাণু?
আঁধারের শুঁড়িপথ আজো খোলা আছে।
রেখে দিচ্ছি। তবু ভালো থেকো।
প্রভূ, ক্ষমা করো।"

একাকিত্বের চরম অনুভূতির কথা এই কবিতায় সুস্পষ্ট।

যেই কবিতার কথা না বললে কবি গণেশ বসুর স্মৃতি চারণ অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেই কবিতা হলো সমুদ্র মহিষ।

সমুদ্র মহিষ

"মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্রমহিষ

আমার ভেতর বুকে ফসফরাস,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে, বাহুর পারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিদ্ধস্ত চোয়াল।"

এই কবিতায় আমরা খুঁজে পাই এমন একজন প্রতিবাদী কবিকে যিনি সামাজিক অবক্ষয়েকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং প্রতিবাদ করেছেন মন প্রাণ দিয়ে, প্রতিটি ছত্রে ও প্রতিটি শব্দে। সেই সময় রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক যে অস্থিরতা চলছিল তাকে কটাক্ষ করেই কবির কলম সোচ্চার হয়েছিল। এই অকপট সাহস এবং স্বতন্ত্রতা তাঁর বেশিরভাগ কবিতার মধ্যেই আমরা পেয়েছি। পাঠকের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন কবি গণেশ বসু তাঁর এই সৃষ্টির কৌলিন্যে।

আমাদের কাছে কবি গণেশ বসুর মৃত্যু হয়নি, তিনি অমর হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।

## একাকীত্বের ইচ্ছামৃত্যু
### ডাঃ কনীনিকা বসু সাহা

বাবাকে নিয়ে কিছু লেখার মতো কঠিন কাজ আজ অবধি করিনি। সে তো আমার জীবনপঞ্জী, তাকে কি আর লেখার গণ্ডিতে বেঁধে রাখা যায়? আসল কথা হলো যে বাবাকে নিয়ে লেখা, তাও ওঁর অনুপস্থিতিতে- এ খুবই দুর্বিষহ। ভুল করলে কার কাছে ছুটে যাব শোধরাবার জন্য সেটাই চিন্তার। তাই ছোট ছোট গল্প বলি।

বাবা মানুষটি ছিলেন একাকীত্বের আরেক নাম, সেই কোন্ ছোটবেলায় বরিশাল থেকে কলকাতায় এসে নিজের চেষ্টায় পৌঁছেছেন সোনালি গির্জার সেই মোরগ চূড়ায়। তখন আমি খুব ছোট, বাঁশদ্রোণীতে থাকি। এখানে বলে রাখি, দেশভাগের সময়, কোনো মতে প্রাণ হাতে করে কলকাতায় পৌঁছে নানা জায়গা ঘুরে, চাঁদসীর দারোগা বাড়ির ছোট হিস্যার ছোট ছেলে সুমন্তনাথ বসু মজুমদার ও তাঁর পরিবারের ঠাঁই হয় বাঁশদ্রোনীতে। বাবা, জেঠুন, ঠামমু (দেহেরগতির জমিদার দত্ত বাড়ির আদরের ছোটো মেয়ে পারুলবালা) অক্লান্ত পরিশ্রম করে সংসারটা ভাসিয়ে রেখেছিলেন, ঠিক যেন Noah's arc। পরিবারের বাকিরা সঙ্গ দিয়েছেন যথাযথ। তবে এসব কথা অনেকেই জানেন।

ফিরে আসি আমার স্মৃতিকথায়! সেকালে কলকাতা শহর হামেশাই লোড শেডিং এ ডুবে যেত, আর সেই অন্ধকারে হারিকেন জ্বালিয়ে পড়তে বসলেই মন চলে যেত কোন অচিন দেশে, যার সঙ্গে atlasএ দেখা বা গল্পে বা encyclopaediaয় পড়া নানান জায়গার কী ভীষণ মিল থাকত। কখনও জার্মানি, অথবা রাশিয়া কিংবা ইংল্যান্ড বা চেকস্লভাকিয়া অথবা হাঙ্গেরি, আবার হয়তো চাঁদের পাহাড়ের দেশ। বাবার সাথে হাঁটতে বেরোতাম বাড়ির পেছনের পুকুরপাড়ে। চারিপাশে নারকেল, খেজুর, সুপুরির সারি আর জলে ঘাই দিচ্ছে রুই কাতলা কই। বর্ষার দিনে সেই সঙ্গে ব্যাঙ সংগীত। এই অদ্ভুত আবহের মধ্যে বাবার কাছে বরিশালের গল্প শুনতাম আর মনে মনে চলে যেতাম সেই মস্ত জমিদার বাড়িতে, যেখানে থাকতেন তিন ভাই ও তাঁদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র। ওই বাড়ির মেয়ে কলকাতার প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনি গাঙ্গুলি, ভাবতে তখন গায়ে কাঁটা দিত, আর আজ গর্ববোধ করি সেই বাড়ির মেয়ে হিসেবে। বাবা পাঠশালা থেকে এক ছুট্টে বেরিয়ে পড়ন্ত তাল ক্যাচ নিচ্ছেন, প্রজার নিমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে দেওয়া মোহর গ্রহণ করে তাদের আশীর্বাদ করছেন বাবার ঠাকুমা (আমারও ঠাকুমা), নুন হলুদ মাখান ইলিশ মাছ খেতে গিয়ে ঠানদির (আমার দাদুর জেঠিমা, মেজ হিস্যা) কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার গল্প, যে ঘটনার পর নাকি ঠানদি বাবার নামকরণ করেন গণেশ। আর সেই সঙ্গে মাখামাখি হয়ে থাকত দেশ ছেড়ে, নিজের জন্ম ভিটে ছেড়ে আসার অসীম যন্ত্রণা। স্মৃতি যদি চলচ্চিত্র হতো, তবে ওই সময়গুলোর স্মৃতি বুঝিবা Oscar পেয়ে যেতো। বাবার নতুন শহরে নতুন করে বাঁচার

লড়াইয়ের কথা যতো শুনেছি, ছোটোবেলার সেই ছোট্ট গ্রামের জমিদার পুত্র যে কবে সেখানে অনন্তযৌবন রাজপুত্র হয়ে গেছে বুঝিনি। সেই রাজপুত্র কখনও ছদ্মবেশে সাধারণের একজন হয়ে খাদ্য আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কবিতা আন্দোলন-এ সামিল হয়েছেন, নের্তৃত্ব দিয়েছেন, পুলিশের লাঠিও খেয়েছেন। অন্যায়-এর প্রতিবাদ করাই তাঁর অভ্যেস। আবার একাধারে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা, সময়নুবর্তিতার মাপকাঠি।

আমি আমার বাবার মতো খাদ্যরসিক! খেতে ও খাওয়াতে আমরা দুজনেই যেন এক অদৃশ্য শক্তির টানে আবদ্ধ। তবে বাবা এবিষয়ে চ্যাম্পিয়ন! কলেজ থেকে টিউশন সেরে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত। আমি অতি কষ্ট করে জেগে রয়েছি অথবা মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। গরম কালে ঘরের লাল মেঝেতে ঘুমোতে বড্ড আরাম! বাবা হাত মুখ ধুয়ে, স্নান সেরে এলে মা আমায় ডেকে দিতেন, আর বাবার হাতে আমদুধভাত খেয়ে আমি চলে যেতাম বিছানায়। যতো রাতই হোক না কেন, গরমের এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন জো ছিল না! বাবা দুধ ভাত মাখবেন আর আমায় সেখান থেকে খাইয়ে দেবেন। এ আবদার মিটিয়েছেন বহু বছর। আর একটা অদ্ভুত খেলা ছিল আমাদের- বাবা যখন বাড়ি থেকে কোথাও বেরোতেন, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে টাটা না করলে বেরোনো ছিল নিষিদ্ধ। এ খেলা চলল বাবার শেষ যাত্রা পর্যন্ত!

সালটা বোধহয় ১৯৮৬, দিনটা মনে আছে ২৩শে জানুয়ারি। আমার একটা মস্ত কুইজ কনটেস্ট ছিল রবীন্দ্র সরোবরে। বাড়ি ফিরতেই খবর পেলাম দাদু অর্থাৎ আমার ঠাকুরদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন রামধনুর দেশে। তাড়াহুড়ো করে বাবা মা ভাই আমি চলে গেলাম বাঁশদ্রোণী, বাবার নিজের হাতে গড়ে তোলা প্রথম বাড়ি, যে বাড়ি নানা আটপৌরে কারণে ছেড়ে যেতে হয়েছিল। তারপর দাদুর শেষকৃত্য, আর বাবা ও তাঁর ভাইদের এক বিষণ্ণ পোশাক। ওই বয়সে ওই পোশাকের তত্ত্ব না বুঝলেও এটা বুঝেছিলাম যে ওই পোশাকে লুকিয়ে রয়েছে একাকীত্ব আর শূন্যতা। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে বাবা একটা ছোটো চৌকিতে একা শুলেন, অশৌচএর সময় কৃচ্ছ্রসাধন অবশ্যই কর্তব্য। সারাদিন হিরোগিরী করা লোকটাকে ওই একলা সময়ে প্রথম দেখলাম নিজের বাবাকে হারানো শোকে কাঁদতে, ঠিক বাচ্চাদের মতো পিতাকে খুঁজে বেড়াতে, ঘুমের মধ্যে কথোপকথন করতে।

বাবা মনের উদ্বেগ লুকিয়ে রাখতে পারতেন না, চিৎকার করে রাগ করে তা প্রকাশ করতেন আর তাঁর নীরব শ্রোতা ও সঙ্গী ছিলেন আমার মা। সবাই যখন বাবাকে চেঁচাতে দেখত, মা যেন কী করে সব বুঝতে পারতেন, আর চুপটি করে থাকতেন। কোথাও বেরোবার সময় বিশেষ করে এই উত্তেজনা খুবই বেড়ে যেত। মনে পড়ছে, আমার বিয়ের দিন, মা আমায় সাজিয়েছেন, এদিকে জানা গেলো বরযাত্রী রওনা হতে পারছে না কারণ কনে বিয়েবাড়িতে পৌঁছায়নি। সর্বোপরি মেয়ের মা, অর্থাৎ যিনি জামাইকে বরণ করবেন,

তিনিও পৌঁছাননি! বাবা খুব উত্তেজিত, একবছর ধরে এতো প্ল্যান করে শেষে কী সময়নুবর্তিতার খাতায় হবে গরমিল?! ঠিক সেই সময়ে আমি আর মা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাবার মুখোমুখি। আমাদের দুজনেরই মুখে করুণ আবেদন যাতে আজকের দিনে অন্তত বাবা না বকেন। সবে শুরু করেছেন কী করেননি, মা বলে উঠলেন, "যখন আমি চিতায় উঠবো, তখনও কী তুমি এভাবে চেঁচাবে?" বাবা এক্কেবারে চুপ! আমি মনে মনে খুবই মজা পাচ্ছি দুজনের এই খুনশুটি দেখে! বাকি সন্ধ্যা কেটে গেলো নির্বিঘ্নে আর কোনো উত্তেজনা ছাড়াই- বাবার মুখে বিজয়ীর হাসি!

২০২২, বাবার কাছ থেকে এই খুনশুটি কেড়ে নেয়, এই উত্তেজনা প্রশমনের জায়গা শূন্য করে দ্যায়, "লাঠিটা ভাঙা হলেও তো ছিলো"। সুদীর্ঘ ৫/৬ বছর cancer এর সঙ্গে লড়াইয়ের পর, মায়ের মৃত্যু বাবার সব প্রাণশক্তি কেড়ে নেয়। মার্চে মায়ের জন্মদিন পালন হলো খুব ধুমধাম করে বাড়িতে, তারপর প্রতিদিন মা কোথাও না কোথাও বেরোতেন, সঙ্গে থাকতাম আমরা সবাই বিশেষ করে বাবা তো বটেই। শেষের দিনগুলো যতটা সম্ভব আনন্দে রাখা যায় আর কী! বাবার ইচ্ছে হলো মাকে সঙ্গে নিয়ে নলবন যাবেন আর সেখানে নাতির সাথে ক্রিকেট খেলবেন; সেই অছিলায় অতি আদরের একমাত্র নাতি দাদান আহেলকে দেবেন পরিবেশের পাঠ, দেখাবেন বাংলার জলাধার, মাছ চাষের জায়গা, কচুরিপানার বেগুনি ফুল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, যে মা শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন তিনমাস, চলছিল যমে মানুষে লড়াই, সেই মা বাবার অক্লান্ত সুশ্রুষায় এই সব এডভেঞ্চার করার শক্তি ফিরে পেলেন। মা জুলাই ২০২২-এ চলে যাওয়ার পর রোজ অন্তত একবার বাবা মনে করতেন যে মায়ের জন্য ওঁর জীবনে কত অপ্রাপ্তি রয়ে গেছে! মায়ের ছবি দেওয়ালে টাঙানো বা তাতে মালা দেওয়া অথবা মৃত্যুদিন পালন কোনটাই বুঝি সইতে পারলেন না আমার বাবা।

একাকীত্বকে ভয় পাওয়া মানুষটা, আমরা দু'ভাইবোন বাসা ছেড়ে উড়ে যেতে বুঝি হয়ে গেলেন এক অন্য দ্বীপের বাসিন্দা, অন্তত বাইরে থেকে মনে হতো ওনাদের স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে একটা দূরত্ব জন্মেছে। মা থাকতেন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে, আর বাবা তাঁর কাজ আর লেখালেখি। আমি সুদূর বিদেশ থেকে দুজনকেই বোঝাতাম একসঙ্গে সময় কাটানোর প্রয়োজনীয়তা, আনন্দ, আবার মাঝেমাঝেই দেখতে পেতাম দুজনের খুনশুটি আর ভালোবাসার প্রমাণ। অবাক হয়ে ভাবতাম, কী আশ্চর্য! দুজনে যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ, একজনকে ছাড়া অন্যজন অচল।" বাবার সংসার-চিন্তা মাক কেন্দ্র করে ঘুরত—সে পেনশনের নমিনিই হোক বা বাড়ির অধিকার। তাই মা যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, বাবার চারিদিকে তখন অদ্ভুত আঁধার। রোজ প্রায় তিনচারবার আমার সঙ্গে ভিডিও কল হত, আমার অভ্যেস হয়ে গেলো রোজ রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে উঠে পড়া- মায়ের কোন ওষুধ দিতে হবে বা রাতে কী কী অসুবিধা হয়েছে সেই নিয়ে বাবার সঙ্গে চলবে কনফারেন্স। রাতে ঘুম

ভেঙে দেখতে যেতেন মায়ের নিশ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা। আর সকাল হলেই স্বমূর্তিধারণ! ভয় ছিল বাবা আগে গেলে মায়ের কী হবে। হয়তো বা বাবা মায়ের স্বপ্ন পূরণ না করেই আমায় দেশে ফিরতে হবে। মা চলে যেতেই বাবা আর তাই থাকতে পারলেন না।

কোন অজানার দেশে যাওয়ার দিন দুয়েক আগে অনেক রাত অবধি জেগে থেকে আমার সঙ্গে গল্প করলেন- জীবনের বহু না পাওয়ার গল্প, তার চেয়েও বেশি পাওয়ার কথা, স্বপ্ন পূরণ আর স্বপ্নভঙ্গের কথা, ভবিষ্যতের পাঠ দিলেন। ঘুমিয়ে পড়েও যেন ঘুমাতে চাইছেন না। এমন অনিয়ম করতে বাবাকে কখনো দেখিনি! হয়তো শেষবারের মতো অনিয়ম করতে চেয়েছেন। শুক্রবার বাবার সংসারজীবনে একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব বহন করে। বাবা-মায়ের বিয়ে হয়েছে শুক্রবার, প্রথম সন্তানের বিবাহ এক শুক্রবার গোধূলি লগ্নে আর চলেও গেলেন সেই শুক্রবার। হয়তো একেই ডেসটিনি বলে! বেঁচে থাকতে যা লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজের মনের মধ্যে, স্ত্রী-র প্রতি সেই অফুরান ভালোবাসা প্রকাশ করলেন মৃত্যুতে। পণ করেছিলেন নিজের কাজ নিজে করবেন, স্বাবলম্বী হবেন শেষ জীবনে, নিজের বাড়িতে নিজের বিছানায় শেষবারের মতো ঘুমোবেন।

একটা ছোট গল্প বলে লেখাটা শেষ করব, চশমাটা বড্ডো ঝাপসা হয়ে আসছে এটা লিখতে গিয়ে। তখন আমি খুব ছোটো, জানি বাবা একজন দাঁড়ি-গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক, যিনি বাড়ি ফিরেই আমায় কোলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ান আর আমি ঝাঁপ দিয়ে চলে যাই সারাদিনের রোজনামচা শুনতে। একদিন সে এক মহা অনিয়ম- বাবার দাড়ি উধাও!! আমি তো কিছুতেই এই অচেনা মানুষের কাছে যাব না! অবশেষে অন্য প্রমাণপত্র দেখিয়ে ছাড় পেয়েছিলেন সেই ভদ্রলোক। তাই বুঝি আজ উধাও হলেন দাড়ি সহ, যাতে এরপর দেখা যখন হবে আমার অন্তত চিনতে অসুবিধা না হয়।

## শিক্ষক গণেশ বসু স্মরণে

**ডাঃ চন্দন সাহা**

অধ্যাপক গণেশ চন্দ্র বসু কর্মজীবনে বাংলা বিষয়ের অধ্যাপনা করতেন, ওনার বহুবিদ প্রতিভা ছিল। উনি ছিলেন নিজস্ব ঘরানার কবি, লিখেছেন বহু বই বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। ওনার মৃত্যুর পরে জানতে পারলাম যে অনেকে ওনার লেখা কবিতা ও অন্যান্য বইয়ের ওপর গবেষণা করেন। সেই বিষয়ে মূল্যায়ন করার যোগ্যতা অবশ্য আমার নেই। আমি সে চেষ্টাও ক'রব না। কাকু ভালো চিত্রকর ছিলেন। তার নমুনা ওনার পাঠঘরের দেওয়ালে আজও বিরাজমান। এক সময়ে উনি নিজেই বইয়ের প্রচ্ছদ তৈরী করতেন। সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। Photographyতেও বেশ হাত পাকিয়েছিলেন সেই সময়। সত্যিই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে উনি মূলতঃ শিক্ষক ছিলেন আজীবন, সেইজন্যই হয়তঃ ব্যাংক-এর চাকরী না নিয়ে শিক্ষকতাকেই গ্রহণ করেন পেশা হিসেবে, পাঠদান করেছেন সারাজীবন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যায়ে, বহুমুখী কর্মজীবনেও বাংলার শিক্ষক হিসেবে স্বনামধন্য ছিলেন।

আমি অবশ্য ওনার ক্লাশরুম-এর ছাত্র ছিলাম না কোনোদিনই। সম্পর্কে কাকু, আমার শ্বশুর মশাই ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের বাইরেন। কৌতুহল বশে কাকুর কিছু লেখা পড়েছি। সেখানে দেখেছি কল্পনার চেয়ে বাস্তবতার আধিক্য। জীবনের ছোট বড় বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, অনুভূতিকে সুসংগঠিত ও বিস্তারিত অথচ সাবলীল ভাষায় বলতে ও লিখতে পারতেন। যে কোনও বিস্তারে লেখার আবেগ বিস্তারিত পড়াশুনা করতেন, সেই বিষয়ের ওপর, ওনার প্রতিটি লেখায় থাকতো সেই গবেষণার রূপ। আর থাকতো তথ্য, যেখানে কোনো ভুল বা ত্রুটি কাকুর কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। ওনার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল : বাংলা ভাষার জটিল বিষয়কে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা করতে পারতেন, মনে হত উনি একজন বাংলা ভাষার বিজ্ঞানী।

আমাদের এখানে এলে, বইয়ের দোকান ছিল কাকুর সবচেয়ে প্রিয় বেড়ানোর জায়গা। সকালের জল খাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়তেন। আর ফিরতেন দুপুরে। বলাই বাহুল্য সঙ্গে বেশকিছু বই আর একগাল হাসি নিয়ে। যখন Brighton-এ এলেন, তখন কাকুর ইচ্ছে হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কুল দেখার। তারপর চাই সেই সম্পর্কিত নথি। কাকু-ই বলে দিলেন City history-তে যাওয়ার কথা। সেইখানে গিয়ে পাওয়া গেলো তখনকার garret. তারপর যেতে হবে Karl Marx ও fredrick Englls-এর সমাধিস্থলে। পরে দেখালাম সেই তথ্য ওনার বইতে। আমি শিখলাম ইতিহাসের গবেষণা কিভাবে করতে হয়।

শুনেছি বাংলা স্কুলপাঠ্য বইতে রচনা বা প্রবন্ধ লেখার ধারাকে বদলে আধুনিক ধারার প্রবর্তন হয় ওনার লেখা স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ ও রচনার বই দিয়েই। সেকাজ করার ক্ষমতা ওনার ছিল। কারণ ওনার লেখা ও বলার ভাষা ছিল সরল, সাবলীল, মানুষের নিত্যদিনের ব্যবহার্য ভাষা। কাকু বিশ্বাস করতেন যে ভাষা মানুষের যোগাযোগের প্রবহমান মাধ্যম যা সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবনও সংস্কৃতির সাথে পরিবর্তনশীল।

কাকু শুধুই ভাষাশিক্ষা দিতেন না। উনি জীবনযাপনের শিক্ষা দিতেন। আর সেই শিক্ষার বিষয়বস্তু যেমন সংগৃহীত হয়েছে ওনার অবিরাম পড়াশুনা ও গবেষণা থেকে, তেমনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, জমিদার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করলেও তৎকালীন রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পট ও তার পরিবর্তন ওনাকে সমৃদ্ধ করেছে। আর সেই শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দান করেছেন সকলকে, অকাতরে। সেই শিক্ষাদান কিন্তু কোনো ক্লাসরুমের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। যদিও উনি পেশাগতভাবে শিক্ষাদান করেছেন মৃত্যুর কয়েকমাস আগে পর্য্যন্ত। সেখানে হয়তো শিখিয়েছেন স্বরের উৎপাদন, সৃষ্টি ও তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বা ভাষার উৎপত্তি বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অথবা 'পূর্বরাগ' ও অন্যান্য পাঠ্য। কিন্তু তার বাইরেও কাকু ছিলেন একজন নিরন্তর শিক্ষক, যিনি যেকোনো বিষয়কেই সাবলীল ভঙ্গিমায় শেখাতে পারতেন-যে কাউকে।

কাকুর এক ভাইপো তখন digital logo design করার বিষয়টি আয়ত্ব করার চেষ্টা করছে। আর কাকু তাকে শেখাচ্ছেন কিভাবে সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ের মূলনীতিটি আগে বুঝে তারপরে তাকে করায়ত্ত্ব করতে হয়। কাকু নিজে কখনো car driving শেখেননি। কিন্তু ওনার ড্রাইভারকে route plan করতে শেখাতেন। মেয়েকে শেখাচ্ছেন কিভাবে জার্মান ভাষায় উচ্চারণ করতে হয়। আর ভালো কাঁচাবাজার করার জন্য যে সকাল সকাল বাজার যেতে হয় সেটা আমার কাকুর কাছেই শেখা।

কাকু অবশ্যই বাংলা ভাষার একজন প্রথিতযশা, সৃজনশীল পণ্ডিত, শিক্ষক ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞানের মতো ক'রে পড়াতে পারতেন। সেখানে থাকতো সবকিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা। কিন্তু উনি কি শুধুই ভাষাশিক্ষক ছিলেন? আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে ওনার শিক্ষাদানের পরিধি ও পরিসর ছিল আরও অনেক ব্যাপ্ত। উনি ক্লাশরুমের বাইরে ও বাংলা ভাষারও বাইরে জীবনের বা জীবনযাপনের শিক্ষাদান করে গেছেন, বৈজ্ঞানিকতা ও বাস্তবিকার সমন্বয়ে—নিরন্তর, অমৃত্যু। আর সেখানেই শিক্ষক গণেশ চন্দ্র বসুর সার্থকতা। ওনাকে আমার প্রণাম।

## জ্ঞানবৃদ্ধ কবি গণেশ বসুর রসবোধের গল্প

**তাপস কুমার কোলে**

প্রায় সাত বছর আগে কবি গণেশ বসুর বাড়ি প্রথম গিয়েছিলাম। আমার এক মাসতুতো দাদা ড. জয়গোপাল মন্ডলের সাথে। দাদা গাড়ি চালাতে চালাতে ওনার বাড়ি যাওয়ার পথে ওনার সম্বন্ধে অনেক কিছু কথা বলেছিল। সবই ওনার কবিতা ও সাহিত্যের লেখালেখি নিয়ে। গাড়ি থেকে নেমে দাদা বেল দিতেই উপরের বারান্দা থেকে বললেন, 'ও জয়গোপাল, একটু দাঁড়াও'। উনি গেটের চাবি খুলতে খুলতে এক গাল হেসে বললেন, 'জয় এসো'। গেটে ঢুকতে ঢুকতে দাদা পরিচয় করে দিল। দাদার পর আমিও স্যারকে প্রণাম করলাম। আমার শিক্ষকতা নিয়ে খোঁজখবর নিলেন। আমার স্কুল হুগলীর আরামবাগ নিকটস্থ এক গ্রামে। এই কথা শুনে উনি বললেন, 'আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম অধ্যাপক সংগঠনের দৌলতে'। ওনার বসার ঘরে বসতাম, দেখে স্তম্ভিত—যেন সত্যিকারের এক শিল্পীর হাতে সাজানো, টেবিল জুড়ে নতুন কবির কবিতার বই, পত্রিকার স্তুপ; তার অভ্যন্তরে দেখি দাদার কবিতার বই ও পত্রিকার সম্মানিত স্থান আছে। কবিতা ও সাহিত্যের আলোচনা বা অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে হোক, এই বসার ঘরে, তিনটি চেয়ার আর একটা সিঙ্গল সোফা। বিশেষ করে যখন কবিতা নিয়ে জয়দার সাথে আলোচনা করছেন, অবাক হই—তারিখসহ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ; কী নিপুণ, রসবোধে পূর্ণ; বক্তব্যের কী সাবলীল ভঙ্গি : কোন শব্দের পরে কোন শব্দ বসলে ভালো হয়। এই সব বাচনভঙ্গি আমাকে মোহিত করত, কী জ্ঞান, অনন্ত গভীরতা যেন এই কবির অতলান্ত সৃষ্টিসুখের সন্ধান দেয়। আমি কবিতার পাঠক নই, আমার এক মামা অসিতকুমার রায় এবং এই দাদা-বৌদির কবিতাচর্চা থেকে সামান্য আগ্রহ জন্মায়। কিন্তু এই জ্ঞানবৃদ্ধ কবির কবিতা ও সাহিত্যালোচনা থেকে প্রথম সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে করতে শব্দ প্রয়োগ ও শব্দচয়ন এর ফসল যেন মনের অঙ্গনে তুলেছি। তাঁর কবিতার শিরোনাম হয় 'শব্দেরা', তিনি লেখেন : "বর্ণ তো বস্তুত চিত্র, রূপবাণী লিখিত শব্দের / নিপুণ বাঁধনে তারা সেতু গড়ে, স্বপ্ন রচে, ডানা মেলে"। (দাদাকে দেওয়া অগ্রন্থিত সংগ্রহ থেকে)

কবি সাহিত্যিকদের মূল মন্ত্র হল তাঁর ভাষা। কবি গণেশ বসু যখন কোনো কবিতা নিয়ে চর্চা করতেন তখন দেখেছি ওনার ভাষাস্রোত যেন কবিতা-শিল্পের অনন্য জোয়ার। ওনার ভাষাশিল্পের হাত ধরে কবিতা ও সাহিত্য পল্লবিত হতো। আমি বিস্মিত হতাম তাঁর কবিতার পাঠ শুনে। দাদা আগেই বলেছিলেন, 'কবি গণেশ বসু নিখাদ বামপন্থী মানুষ'। অথচ আমাদের সামনে তিনি কী কঠোর সমালোচনা করতেন শাসক বামপন্থীদের। তাঁর কবিতায় শুনেছি সেসবের মন্দ্র প্রতিধ্বনি আছে। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন বাংলায় শাসকের বদল ঘটেছে। তখনও দেখছি শাসকের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছেন কবিতায়। আসলে তাঁর কবিতাই বলে দেয় তাঁর জীবনদর্শনের রূপ কী :

"আমাদের ডানা ছাঁটা হবে? ঘাতকের খড়্গ বিদ্বেষের /বিশ্বাসের পায়ের নিচে মাটি আর পোক্ত নেই, রাষ্ট্রযন্ত্র নাৎসি পুলিশের"। —এ যেন তাঁর কবি জীবনের শাশ্বত ধর্ম। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন,

"তবু আমি চোখ তুলি, মুঠো রাখি হাত
গান গাই, ছবি আঁকি, কবিতাও লিখি
মাথা না বিকিয়ে।"

এজন্য তিনিও নিজেকে যেন ক্ষমাহীন চোখে দেখেছেন, একজন নাগরিক হিসেবে নিজেকেও দোষী মনে করছেন,

"হঠাৎ সেদিন মনে হলো চায়ে ওদেরই রক্তরস
ভয়াবহতম নিঃস্বতা জায়মান
আমিও কি তবে নিমিত্তের ভাগী অবিরাম ত্রাশনের
অপরাধবোধ চেতনায় বেগবান।"

কবি কত সহজ সরল ভাষ্যে বলছেন, যেন তাঁর মতে—গণতান্ত্রিক দেশের একজন নাগরিক কখনো কি পারে শাসকের শোষণের কারণ হিসেবে নিজের দায় অস্বীকার করতে? এই হলেন আমার দেখা এবং কানে শোনা অনন্য কবিতার স্রষ্টা কবি গণেশ বসু।

..... একবার 'সাহিত্য অঙ্গন' পত্রিকায় আমার এক কবিতা প্রকাশিত হয়। ওই সংখ্যায় ওনারও এক অসাধারণ লেখা ছিল। সেই সংখ্যায় আমার কবিতা পড়ে আমাকে বললেন,' 'খুব ভালো লিখেছো তুমি কবিতাটা'। শুনে আমার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। আমি জানি আমার কবিতার স্থান কোথায়। এই রকম উনি উৎসাহমুলক কথা ছোটদের প্রায় বলতেন।

উনি জয়দার কাছে শুনেছিলেন আমি অবিবাহিত। আমি বিয়ে করবো না শুনে আমাকে বললেন ,'তাপস বিয়ে করো'। স্যারের কথার উত্তরে শুধু হেসে চুপ থাকলাম। সেইদিনই যখন ওনার বাড়ি থেকে বার হচ্ছি তখন গেটের কাছে এসে বললেন, 'তাপসের চেহারা খুব সুন্দর, লম্বা ছিপছিপে, মেয়েরা তো প্রেমে পড়ে যাবে'। কথাটা জয়দার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন। ওনার পরের বাক্যটা ছিল, 'তাপস প্রেমের হাত প্রসারিত করলে একাধিক টুপসির হাত মিলবে।" টুপসির নাম জয়দার কাছে জেনে গেছেন। থাক সেকথা না জানাই ভালো।

কবি গণেশ বসু বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক খবরাখবর রাখতেন এই প্রান্তিক বয়সেও। যখন কিনা সমগ্র যুবসমাজ দিশাহীন, রাজনৈতিক নগ্নতায় আবিষ্ট। জয়দা ওনার কবিতা সংগ্রহ—এক এবং দুই, প্রকাশ করেছেন। কবির একটি প্রবন্ধগ্রন্থ আছে 'নরকরোটিতে প্রজাপতি', নামকরণের মধ্যেও কবির শব্দখেলা।

ওনার জীবনের শেষের দিকে অনেক কবিতা প্রকাশ করেননি বা করতে পারেননি মৃত্যু নামক বজ্রপাতের জন্য। তখনও তাঁর বিদায় নেওয়ার কথা ছিল না, একেবারে সুস্থ ও সবল দেখেছি এক সপ্তাহ আগেই। ঠিক পূজার আগে সেই সব কবিতা প্রকাশিত করার জন্য জয়দা

স্যারকে বলে। তখন স্যার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শান্তভাবে বলেছিলেন , 'আমি এতো ছোটাছুটি করতে পারবো না। আমার অনেক কবিশত্রু আছে, প্রকাশকদের বলে আসবে গণেশ বসুর কবিতা ও প্রবন্ধের বই প্রকাশের আগ্রহ একটুও দেখাবে না। অনেক কষ্ট লাগে জয়। পারলে তুমি করো'। সেদিন থেকে কবি গণেশ বসুর অপ্রকাশিত কবিতাগুলো প্রকাশের জন্য জয়দার দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। জয়দার নিজের অনেক বই প্রকাশ হয়েছে, কে টাইপ করবে, কে ছাপবে, কে বাইন্ডিং করবে, জায়গাগুলো জানা। যেভাবে দাদা কবির 'কবিতা সংগ্রহ' প্রকাশ করেছেন, সেজন্য কবি বার বার বলতেন, 'জয় তোমার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না। আগের জন্মে তুমি আমার নিশ্চয়ই কেউ ছিলে। তুমিই আমাকে আবার উজ্জীবিত করেছ।' ইতিমধ্যে কাকিমা হঠাৎ চলে গেলেন (ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে, দীর্ঘ রোগভোগের পর) গত বছর জুলাই মাসে।

তারপর আগস্ট মাসের একটি ঘটনা স্যারের মুখে শুনে খুবই মনটা খারাপ হয়েছিল। ঘটনাটা হলো ; স্যারের মেয়ে জামাই এসেছেন কিছুদিন হয়েছে। ওনারা ইংল্যান্ডে থাকেন। যে দিনের ঘটনা ঠিক পরেরদিন আমি ও জয়দা ওনার বাড়ি গেছি। ঘটনাক্রমে ওনার মেয়ে — জামাই সেদিন বাইরে ছিলেন নিজস্ব কাজে। ওনার এক প্রতিবেশী আগের দিন বিকালে কিছু তালের বড়া (একপ্রকারের তালের পিঠে) খেতে ভালোবাসেন বলে খেতে দিয়ে গেছেন। ওই পিঠে দেওয়াটা ওনার জামাই ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। স্যার তো উদার মনের মানুষ, সেই জন্য উনি দুঃখ পেয়েছিলেন। খুব কষ্ট করে আমাদের শুনিয়েছিলেন বেদনার কথা। এই প্রসঙ্গে এসেছিল পুত্রের কথাও। তার বিবাহ না করার জন্য মনের দুঃখগাথা। ওনার কাছ থেকে ওনার ছোটোবেলার কথা শুনেছি, বিদেশের যখন সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশুনা করতেন সেই সব বলতেন। অধ্যাপনা করার সময় উনি পশ্চিমবঙ্গে ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষা ও সাহিত্যের কাজে ঘুরেছেন, সেই সময়কালের অনেক ঘটনার কথা ওনার কাছ থেকে শুনেছি।

অনেক অকথিত কথা থেকে গেল গোপনে, বলা যায় না। ব্যক্তি বা কবি গণেশ বসুর জীবন ও সাহিত্য সত্যি বিস্ময়কর। নিখিল চন্দ্র মাহাতো ড. জয়গোপাল মণ্ডল তথা আমার দাদার অধীনে ওনাকে নিয়ে গবেষণা করছে। কবি বার বার বলতেন, 'জয়, নিখিল খুব ভালো লিখছে, ভালো বিশ্লেষণ করছে। আমি দেখে যাব তো!" গত বছর দশ নভেম্বর যেভাবে শেষ কথাটুকু শোনার সৌভাগ্য না দিয়ে চলে গেলেন সে দীর্ঘশ্বাস কার কাছে রাখব। আমরা দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ।

কবি গণেশ বসুর আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে, অনেক কিছু শিখেছি। আমরা যখনই যেতাম, ওনার পড়াশুনার ঘর থেকে রান্নার মাসীকে বলতেন যে, জয় - তাপস এসেছে, চা করো। ওনার মেয়ে জামাই ইংল্যান্ড থেকে যখন কলকাতায় আসতেন, স্যারের জন্য অনেক কিছু আনতেন। সেই সব বিদেশী বিস্কুট, কেক আমাদের স্যার খাওয়াতেন।

একবার ওনার বাড়ির রান্নার মাসি আসেনি, আমরা গেছি, চা খাওয়াবেন কীভাবে, স্যারের স্ত্রী অসুস্থ। স্যার জয়দার কাছে শুনেছিলেন, আমি নাকি ভালো চা বানাই। আমি জানি

চা মোটামুটি খাওয়া যাবে সেরকম বানিয়ে দেবো। উনি বললেন, 'তাপস তুমি তো চা বানাতে পারো, চলো তুমি চা বানাবে, আমি তোমাকে একটু সাহায্য করবো'। এই বলে আমাকে দোতলায় রান্না ঘরে নিয়ে গেলেন, ওনার পরিচালনায় আমি চা বানিয়ে নিয়ে এলাম। যখনই যেতাম বলতেন, 'এসো ভায়া '। ফেরার সময় ওই একই কথা 'এসো ভায়া'। বড়ো মনের মানুষ ছিলেন এই কবি।

একদিন জয়দা জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যার, আমি যখন বারুইপুর স্কুলে পড়াতাম, তখন নতুন সিলেবাস নিয়ে একটা বাংলা সহায়িকা দেখেছি, ব্যতিক্রমী লেখা, লেখক বাসু গণেশন। আপনি চেনেন তাঁকে?" কবি হাসতে হাসতে বললেন, "পবিত্রদার (পবিত্র সরকার) সঙ্গে যুগ্মভাবে ব্যাকরণ বই লিখেছি, সংসার টানতে মানে বইও বহু লিখেছি, ওটা তারই একটা নমুনা।"—এভাবে অচেনা কবিতে আমরা চিনতে পারি। কী বিচিত্র সংগ্রামী জীবন তাঁর!

'সাহিত্য অঙ্গন' পত্রিকার বিভিন্ন সময়ে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উনি যেতেন, সেটা কলেজ স্ট্রিট বা সূর্য সেন স্ট্রিট যেখানেই হোক। উনি বলতেন, 'জয় তোমার জন্য বহুদিন পর যাদবপুর কফি হাউসে এলাম।' যাদবপুর কফি হাউসে 'কবি গণেশ বসুর আশি' সংখ্যাটি প্রকাশ করেন তাঁর অগ্রজ পবিত্র সরকার। ছিলেন ষাট দশকের আর একজন কবি অনন্ত দাশ এবং কবি-কথাসাহিত্যিক তাপস রায় সহ অনেকে। এই সব অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখতেন। আমরা ছোটো এবং বিজ্ঞানের ছাত্র—সেকালের একালের সাহিত্যের কথা শুনে সমৃদ্ধ হতাম।

২০২৩ সালে ১৫ অক্টোবর শুভ মহালয়ার দিনে সূর্য সেন স্ট্রিট-এ, নির্মল ভবনে 'সাহিত্য অঙ্গন' পত্রিকার জুলাই - ডিসেম্বর ২০২৩ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী। সেই অনুষ্ঠানে স্যারকে গাড়ি থেকে হাত ধরে নামানো থেকে লিফটে উঠা, হলে পৌঁছানো এবং অনুষ্ঠানের শেষে ওনাকে গাড়িতে পৌঁছানো পর্যন্ত স্যারের পাশে থেকেছি, আর ছিলেন কবি হাসি বসু; ওনার গাড়িতে এসেছিলেন কবি। এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যঅঙ্গন পত্রিকার পক্ষ থেকে 'উজ্জ্বলকুমার মজুমদার স্মারক সম্মান' দেওয়া হয়। কবি বার বার আমাকে কৃতজ্ঞতার কথা বলছিলেন। উনি জয়দা ও আমাকে ভীষণ ভালবাসতেন। জানি না এ ভালবাসা এ জীবনে আর পাব কিনা! যখনই 'সাহিত্য অঙ্গন' পত্রিকার কাজ করে দাদা, যখনই আলোচনা হয় কবিতার, তখনই তিনি চিন্তনে দেখা দেন, প্রতি মুহূর্তে। তাঁর অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত কবিতাগুলি প্রকাশের জন্য শুনেছি ওনার সুযোগ্য কন্যা ডাক্তার কনীনিকা বসু সাহা উদ্যোগ নিয়েছেন, টাইপের কাজ শেষ। শুনছি, আগামী জুলাই মাসে প্রকাশিত হবে। শুনে খুশি হয়েছি। পাঠকের হৃদয়ে তাঁর স্থান এভাবেই আছে, থাকবে।

# সমরেশ মজুমদার স্মরণে

## স্মরণে মননে সমরেশ মজুমদার
## অর্পিতা ঘোষ পালিত

বাংলা সাহিত্য জগতের এক অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার। তিনি বহু জনপ্রিয় উপন্যাসের স্রষ্টা। বেশ কিছু টিভি ধারাবাহিকের কাহিনিকার। শহরকেন্দ্রিক জীবনের চিত্রপট বারবার উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। বহু সংখ্যক সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন।

সমরেশ মজুমদার ১৯৪২ সালের ১০ই মার্চ (বাংলা ১৩৪৮ সনের ২৬শে ফাল্গুন) পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ির গয়েরকাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কৃষ্ণদাস মজুমদার ও মাতা শ্যামলী দেবী। তাঁর জন্মের সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল সমগ্র বিশ্বে। তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ ঠাকুরদাদা পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, পেশায় তিনি চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই তাঁর ঠাকুরদাদা পূর্ণচন্দ্র নদিয়ার গেদে গ্রাম থেকে উত্তরবঙ্গের চা বাগানে এসে ইংরেজি জানার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ম্যানেজারের চাকরি পেয়েছিলেন।

বাল্যকালে সমরেশের ডাকনাম ছিল বাবলু। তাঁর জন্মের পরেই তাঁর মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি সেজো পিসিমার কাছে বড় হয়েছিলেন। বাবা-মায়ের বদলে তাঁর ঠাকুরদাদার কাছেই মানুষ হয়েছেন সমরেশ। একাধারে কঠোর অনুশাসন, সংযম, অধ্যবসায় এবং নিয়মানুবর্তিতার পাঠ তিনি শিখেছিলেন ঠাকুরদাদার কাছেই। পূর্ণচন্দ্রের প্রভাব সব থেকে বেশি ছিল তাঁর জীবনে। মাত্র চার বছর বয়সে ঠাকুরদাদার সঙ্গে জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ায় এসে ওঠেন। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি হাকিমপাড়ার বাড়িতে ছিলেন। যুদ্ধের সময় কেরোসিন না থাকায় সমস্ত পাড়া অন্ধকার থাকার গল্প শুনেছেন ঠাকুরদাদার কাছেই।

গয়েরকাটা চা বাগানের ভবানী মাস্টারের পাঠশালায় সমরেশ মজুমদারের প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। সেখানে তাঁর হয়ে পরীক্ষা দেন এক দিদি। ধরা পড়ল শিশু সমরেশ। ভবানী মাস্টার উপদেশ দিলেন, "তোমার তো অনেক দূর যাওয়ার কথা। আর কাউকে অ্যালাও করবা না।" মাস্টারমশাইয়ের এই নির্দেশ তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবনভর অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন তিনি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিকে ঘুরে দেখে।

সমরেশের বাড়ির কাছেই আংরাভাসা নদী। তাঁর উপন্যাসে বারবার ফিরে এসেছে এই নদীর কথা। তাঁর শৈশব কাটে প্রকৃতির কোলে, চা বাগানে ঘুরে, আদিবাসী শিশুদের সাথে খেলে। স্থানীয় মদেশিয়া ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করে। রাজবংশি এবং বাহে সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গেও তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। পাঠশালার শিক্ষার পর জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে ভর্তি হন তিনি। বারো বছর সেখানে পড়াশোনা করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছোটোবেলা থেকেই গল্পের বই পড়ার নেশা ছিল সমরেশের। বাবার পত্র-পত্রিকা এবং মায়ের বইপত্র লুকিয়ে পড়তে পড়তেই তাঁর মধ্যে সাহিত্য-চেতনা জেগে ওঠে। স্কুলে

সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় একটি গল্প লিখে পত্রিকা দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন যা পরে চিত্রবাণী পত্রিকায় 'নাজলী' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্যপ্রীতির কথা জানতে পেরে স্কুলের সতী মাস্টার বাংলা সাহিত্যের নানা লেখকদের লেখা পড়তে তাঁকে আগ্রহী করে তোলেন। তিনিই প্রথম সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার বই পড়তে দিয়েছিলেন সমরেশ মজুমদারকে। এই সতী মাস্টারের কাছেই তিনি কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের কথা জেনেছেন ও উপলব্ধি করেছেন। মার্কস ও গোর্কির কথা জেনেছেন। ১৯৬০ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলায় সাম্মানিক নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পান। কিন্তু তাঁর পরিবারের ইচ্ছে ছিল তিনি যেন অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন। ফলে অর্থনীতির বদলে বাংলা নিয়ে পড়ার কারণে পারিবারিক মনোমালিন্যের শিকার হন। স্কটিশ চার্চ কলেজের পড়া শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

পারিবারিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুণ কলেজে পড়ার দিনগুলিতে একজায়গায় থিতু হতে পারেননি সমরেশ মজুমদার। প্রথমে কিছুদিন অনিলবাবুর মেসে, তারপরে স্কটিশচার্চ কলেজের হোস্টেল টমোরিতে, হাতিবাগানের রেসিডেন্ট হোস্টেলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলেও দিন কাটিয়েছিলেন সমরেশ। এই হোস্টেল জীবন বা মেস জীবনের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে তাঁর 'কালবেলা' উপন্যাসে।

'সংবিত্তি' পত্রিকার সম্পাদক সুশীল মুখোপাধায়ের সৌজন্যে আমহার্স্ট স্ট্রিটে তাঁদের পত্রিকার প্রেসে একটি অস্থায়ী প্রুফ রিডারের কাজের মাধ্যমেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে এই কাজে তখন বেতন ছিল তিরিশ টাকা। রাত ন'টা থেকে সকাল ন'টা পর্যন্ত এই প্রেসের অফিসেই সময় কাটাতেন। ১৯৬৭ সালে আয়কর দপ্তরের চাকরিতে যোগ দেন সমরেশ মজুমদার। ২২৮ টাকা বেতনের এই চাকরি করার সময় ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির পেছনে একটি মেসে ভাড়া থাকতেন।

১৯৭৫ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি, ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এখানেই নিযুক্ত ছিলেন। এরপর সাহিত্য সাধনাকেই ব্রত করে নেন সমরেশ মজুমদার। কর্মজীবনে তিনি আনন্দবাজার পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

গ্রুপ থিয়েটারের প্রতি সমরেশের প্রচণ্ড আসক্তি ছিলো। তাঁর প্রথম গল্প 'অন্যমাত্রা' লেখা হয়েছিলো মঞ্চনাটক হিসাবে, আর সেখান থেকেই তাঁর লেখক জীবনের শুরু। সেই গল্প নাটক রূপে মঞ্চায়িত না হলেও পশ্চিমবঙ্গের পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যজীবনে পদার্পণের আগে ১৯৬৫ সাল নাগাদ বন্ধুস্থানীয় সুব্রত ভট্টাচার্য ও হরেন মল্লিকের সাথে একসঙ্গে তিনি 'শাতকর্ণী' নামের একটি নাটকের দল তৈরি করেছিলেন।

বিমল করের একটি গল্প অবলম্বনে পিয়ারিলাল বার্জ নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন সমরেশ মজুমদার। সেসময় দেশ পত্রিকার যাত্রা-নাটক বিভাগের সম্পাদক প্রবোধচন্দ্র অধিকারী সমরেশ মজুমদারকে নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। নিজেদের দলের জন্য নতুন নতুন নাটক লিখতে গিয়েই গল্প-উপন্যাস লেখা শুরু হয়। প্রথম গল্প লিখে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক বিমল করের দপ্তরে জমা দিয়ে আসেন। কিন্তু ছয় মাস পরে সেই গল্প অমনোনীত অবস্থায় ফেরত এলে ফোন করে বিমল করকে ফেরত পাঠানোর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন সমরেশ। শুনে বিমল কর গল্প নিয়ে পত্রিকা দপ্তরে আসতে বলেন তাঁকে এবং জানান যে পিওনের ভুলেই সেই গল্প ফেরত গেছে। ফলে ১৯৬৭ সালে 'অন্যমাত্রা' নামের তাঁর লেখা প্রথম গল্প ছাপা হয়। গল্প লেখার পারিশ্রমিক হিসেবে পঁচিশ টাকা পেয়েছিলেন।

দেশ পত্রিকায় আট বছরে মোট ২৪টি গল্প লিখেছিলেন সমরেশ মজুমদার এবং পরের দিকের প্রতিটি গল্পের জন্য ৫০ টাকা করে পারিশ্রমিক পেতেন। এই দেশ পত্রিকাতেই 'দৌড়' নামে প্রথম উপন্যাস লেখেন,নি ১৯৭৬ সালে। 'দৌড়' উপন্যাসের মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছিলেন সমরেশ। দেশ পত্রিকার তখনকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের অনুরোধে এরপর থেকে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখা শুরু করেন তিনি, তাঁর প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস বেরোয় 'উত্তরাধিকার' নামে ১৯৮৯ সালে। পাঠকের মধ্যে প্রবলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই উপন্যাস। পাঠকের আবেদনে সাড়া দিয়ে আরো দুটি পর্ব লেখেন 'কালবেলা' ও 'কালপুরুষ' নামে। এই তিনটি উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন সমরেশ মজুমদার। জলপাইগুড়ির জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা সমরেশ মজুমদারের লেখায় বারবার ফুটে ওঠে রাজনৈতিক চেতনা, প্রেম, অপ্রাপ্তি, হতাশা এবং আধুনিক নাগরিক জীবনের নানা গোপন ঘাত- প্রতিঘাতের ছবি। উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গের জল-জঙ্গলের প্রতি লেখকের যে মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে তা বহু মানুষকে উত্তরবঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। নকশাল আমলের প্রেক্ষাপটে লেখা 'কালবেলা' উপন্যাসে অনিমেষ ও মাধবীলতা, 'সাতকাহন' উপন্যাসের দীপাবলি অসাধারণ সৃষ্টি। কিশোর মনের জন্য লেখেন অ্যাডভেঞ্চার মূলক উপন্যাসের চরিত্র 'অর্জুন' গোয়েন্দার গল্প। বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে আজও তা অমলিন।

সমরেশের লেখা বিখ্যাত একটি উপন্যাস 'তেরো পার্বণ' অবলম্বনে দূরদর্শনে প্রথম বাংলা ধারাবাহিক নির্মিত হয়।

সমরেশের প্রত্যেকটি উপন্যাসের বিষয় আলাদা, গল্প রচনার গতি এবং ভঙ্গি পাঠকদের আন্দলিত করে। চা বাগানের মদেসিয়া সমাজ, এবং কলকাতার নিম্নবিত্ত মানুষেরা তাঁর কলমে উঠে এসেছে। সমরেশ মজুমদারের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে সাতকাহন, তেরো পার্বণ, স্বপ্নের বাজার, উজান, গঙ্গা, ভিক্টোরিয়ার বাগান, আট কুঠুরি নয় দরজা, অনুরাগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তার ট্রিলজি "উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ" বাংলা

সাহিত্য জগতে তাকে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী করেছে। তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে বিখ্যাত হলেও, ছোটগল্প, কিশোর উপন্যাস, নাটক, চিত্রনাট্যসহ, গোয়েন্দাকাহিনীও রচনা করেছেন। সমরেশ মজুমদারের লেখা গর্ভধারিণী, মৌষককাল, উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ, স্বপ্নের বাজার, উজান, গঙ্গা, ভিক্টোরিয়ার বাগান, সত্যমেব জয়তে, আকাশ না পাতাল, সওয়ার, টাকাপয়সা, তীর্থযাত্রী, ভালবাসা থেকে যায়, নিকট কথা, ডানায় রোদের গন্ধ, জলছবির সিংহ, মেয়েরা যেমন হয়, একশো পঞ্চাশ (গল্প সংকলন), গর্ভধারিণী, হৃদয় আছে যার, সর্বনাশের নেশায়, ছায়া পূর্বগামিনী, এখনও সময় আছে, স্বনামধন্য, কলিকাল, কলকাতা, অনুরাগ, তিনসঙ্গী, সহজপুর কতদূর, অনি, সিনেমাওয়ালা, সূর্য ঢলে গেলে, আশ্চর্য কথা হয়ে গেছে, অগ্নিরথ, অনেকই একা, আত্মীয়স্বজন, আবাস, আমাকে চাই প্রভৃতি আরো অনেক লেখা পড়ে আজো পাঠক অভিভূত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র অনিমেষ, মাধবীলতা, দীপাবলী আর জয়িতা পাঠকমনে আজও বিরাজমান।

সমরেশ মজুমদার কবিতাও লিখেছেন। তাঁর লেখা একটি কবিতা 'তুমি ফিরবে'-র কটি লাইন :

"তুমি ফিরবে কোন একদিন
হয়তো নীলিমায় হারানো কোন এক নিষ্প্রভ বেলায়।
নতুবা কোন এক নবীন হেমন্তে,
এক নতুন দিনের নির্মল খোলা হাওয়ায়।
অথবা কোন এক শ্রাবণের দিনে
অহরহ ঝরা ঘন কাল মেঘ বৃষ্টির
মুহু মুহু নির্ঝর খেলায়।"

সমরেশ মজুমদার শুধু গল্প, উপন্যাসই নয়, প্রবন্ধ, সমালোচনাতেও তাঁর কলম মহান। এখানেও তিনি স্বাধীন, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তাই শেষ বয়সের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তিনি বলতে পেরেছেন, "এখন ওঁর উচিত গান না গেয়ে সুর দিয়ে যাওয়া।"

সমরেশ মজুমদারের ছদ্মনাম ছিল যীশু দাসগুপ্ত।

শেষ জীবনে সিওপিডি রোগে ভুগছিলেন লেখক সমরেশ মজুমদার। এর সাথে ছিল স্লিপ অ্যাপনিয়াও (ঘুমের মধ্যে শ্বাসকষ্টের সমস্যা)। ২০২৩ সালের ২৫ এপ্রিল মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যার কারণে তাঁকে বাইপাসের ধারে অ্যাপেলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুস্থও হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৮মে সোমবার ৭৯ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য জগতে যেন ঝুপ করে নেমে এলো গাঢ় অন্ধকার। বাংলা সাহিত্যের আকাশ থেকে যেন খসে পড়ল গোটা 'কালপুরুষ'।

সাহিত্যে সমরেশ মজুমদার অনন্য এবং অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৮২ সালে প্রথম উপন্যাস 'দৌড়'-এর জন্য আনন্দ পুরস্কার পান। বাংলা চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার,

দিশারী ও চলচিত্র প্রসার সমিতি শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্ট রাইটার পুরস্কার পান ১৯৮২ সালে। ১৯৮৪ সালে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার পান 'কালবেলা' উপন্যাসের জন্য। ২০০৯ সালে বঙ্কিম পুরস্কার এবং আইআইএমএস পুরস্কার পেয়েছেন। বঙ্গবিভূষণ ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার পেয়েছেন।

সমরেশ মজুমদারের অসংখ্য মহামূল্যবান বাণী আছে। তার থেকে অনুপ্রেরণামূলক কিছু উক্তি :

১. নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা মেয়েগুলো তাদের সব রকম কনজারভেটিভ ধারণা বুকে পুষে রেখে এমন ভাবভঙ্গী করে যেন পৃথিবীর সব ছেলেই তাদের দিকে হামলে পড়ছে।

২. নিজের বোকামি বুঝতে পারার পর কারো দুঃখ হয়, কারো হাসি পায়।

৩. পৃথিবীর নিয়ম বড় অদ্ভুত, যাকে তুমি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসো সেই তোমার দু:খের কারণ হবে।

৪. ছেলেরা ভালোবাসার অভিনয় করতে করতে যে কখন সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলে তারা তা নিজেও জানেনা। মেয়েরা সত্যিকার ভালোবাসতে বাসতে যে কখন অভিনয় শুরু করে তারা তা নিজেও জানেনা।

৫. ছাইটা হলো স্মৃতি, আগুনটা হলো বর্তমান।

৬. মৃত্যু কি সহজ, কি নিঃশব্দে আসে অথচ মানুষ চিরকালই জীবন নিয়ে গর্ব করে যায়।

৭. তুমি যদি জিততে চাও তাহলে তোমাকে নির্মম হতে হবে। অভিযানে বেরিয়ে দলের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অভিযান বাতিল হয়না, অসুস্থকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেই উপায় না থাকলে তাকে ফেলে রেখেই এগোতে হবে। এক্ষেত্রে দয়ামায়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলো খুবই প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। কোনও কোনও মানুষ জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষে এগিয়ে যাওয়ার সময় এমনই কঠোর হন। তাদের নিষ্ঠুর বলা হয়। ইতিহাস ওইসব মানুষের জন্য শেষ পর্যন্ত জায়গা রাখে।

৮. স্বাধীনতার জন্য যোগ্য হতে হবে তারপর বাইরের স্বাধীনতা আদায় করতে হবে।

৯. বিষয় সম্পত্তি মানুষকে নির্লজ্জ করে। বিশেষ করে আর্থিক দুরবস্থায় পড়লে এবং সামনে কোন নির্দিষ্ট উপায় না থাকলে সে অসহায় হয়ে পড়ে। তরুণ বয়সে যা সহনীয় হয় যৌবন পেরিয়ে তা হয়ে দাঁড়ায় পীড়াদায়ক। তখন ডুবন্ত মানুষের পায়ের মতো মানুষের মন কিলবিল করতে থাকে একটু শক্ত জমির জন্য। ন্যায়, নীতি, স্নেহ, ভালোবাসা ইত্যাদির ওপর নিজেকে স্তোক দেয়া পোশাক পরিয়ে দিতে সে মোটেই দেরি করে না।

১০. মানুষ যখন কোন কিছুকে মরীয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে তখন তার ওপর প্রচণ্ড

নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন কারণে অকৃতকার্য হলে সে দিশেহারা হয়ে যায় তা থেকে নতুন করে উঠে দাঁড়ানো অসম্ভব।

১১. পৃথিবীর অর্ধেক কাজ যুক্তি দিয়ে হয় না।

১২. কোন মানুষের যদি জেদ, পরিশ্রম, সততা এবং সেই সঙ্গে প্রতিভা থাকে জীবন তাকে সাফল্য দেবেই।

১৩. সব কিছু মনের মত মেলে না, মানিয়ে নিতে হয়। মেনে নিলে একসময় ঠিক সুখ ফিরে আসে।

১৪. আকাঙ্ক্ষার জিনিস পাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে শিশুরা যেমন হেলায় ফেলে রাখে ঠিক তেমনি করে ভালবাসা ফেলে রাখতে নেই। কারণ ভালবাসা প্রতিমুহূর্তে প্রতিপালিত হতে চায় তাকে আগলে রাখতে হয়।

সমরেশ মজুমদার বাঙালি তথা দুই বাংলায় সর্বকালের অন্যতম সেরা লেখক হিসাবে পাঠকমন জয় করেছেন। দুই বাংলাতেই তিনি সমান জনপ্রিয়। তাঁর লেখা বই বহু মানুষ পড়তে ভালোবাসেন।

পাঠকের আবেগ, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা পেয়ে তিনি চিরজীবী হয়ে রয়েছেন।

**তথ্যসূত্র :**

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

# সমরেশ মজুমদার : তাঁর সাহিত্যিক পথ এবং বাঙালি সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ

**অমিতাভ ব্যানার্জী**

**বিমূর্ত :**

এই গবেষণাপত্রটি বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সমরেশ মজুমদারের জীবন, কাজ এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। মজুমদার তার বহুমুখী সাহিত্যিক অবদানের মাধ্যমে শুধু বাংলা সাহিত্যে একটি অমোঘ চিহ্ন রেখে যাননি বরং তার বর্ণনাগুলিকে বাঙালি সংস্কৃতির সমৃদ্ধতার সাথে জড়িয়ে রেখেছেন। এই গবেষণাপত্রটির লক্ষ্য লেখক হিসাবে মজুমদারের বিবর্তন অন্বেষণ করা, থিম, শৈলী এবং প্রভাবগুলি পরীক্ষা করা যা তার সাহিত্যিক যাত্রাকে রূপ দিয়েছে। এটি মজুমদারের লেখা এবং বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সিম্বিওটিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে, তার বর্ণনাগুলি কীভাবে এই অঞ্চলের নীতি, ঐতিহ্য এবং সামাজিক পরিবর্তনগুলিকে প্রতিধ্বনিত করে তা তুলে ধরে।

গবেষণাটি মজুমদারের সাহিত্য সৃষ্টি এবং বৃহত্তর বাংলা সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে গভীর সংযোগ ব্যাখ্যা করার জন্য সাহিত্য বিশ্লেষণ, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বহু-বিষয়ক পদ্ধতি ব্যবহার করে। উপন্যাস, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ সহ তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের একটি বিস্তৃত পর্যালোচনার মাধ্যমে, এই কাগজটির লক্ষ্য তার লেখায় প্রচলিত পুনরাবৃত্ত মোটিফ, চরিত্র এবং সামাজিক প্রতিচ্ছবি বোঝানো।

তদ্ব্যতীত, এই গবেষণাটি মজুমদারের রচনাগুলির অভ্যর্থনা এবং সমালোচনামূলক মূল্যায়ন, বাংলার অভ্যন্তরে এবং এর ভৌগলিক সীমানার বাইরে, পাঠক, সমালোচক এবং বৃহত্তর সাহিত্য জগতের উপর তার প্রভাবের উপর আলোকপাত করে। এটি অন্বেষণ করে যে কীভাবে তার আখ্যানগুলি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে পাঠকদের সাথে অনুরণিত হয়, ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে বাঙালি সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতার সারাংশ সংরক্ষণ করে।

পরিশেষে, এই গবেষণাপত্রটি সমরেশ মজুমদারের সাহিত্যিক গতিপথের একটি বিস্তৃত ওভারভিউ প্রদান করার চেষ্টা করে, তার সাহিত্যিক অবদান এবং বাংলা সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ট্যাপেস্ট্রির মধ্যে গভীর সম্পর্কের উপর জোর দেয়, যার ফলে বাংলা সাহিত্যে তার স্থায়ী উত্তরাধিকারের গভীর উপলব্ধি এবং উপলব্ধিতে অবদান রাখে।

**কীওয়ার্ড:** বাঙালি সংস্কৃতি, সাহিত্য বিশ্লেষণ, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাব, বাংলার সমাজ, সাংস্কৃতিক মোটিফ, আঞ্চলিক সাহিত্য।

**ভূমিকা :**

সমরেশ মজুমদার ১৯৪৪ সালের ১০ মার্চ জলপাইগুড়ি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন,

যেখানে তার শৈশব এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের দিনগুলি কেটেছে। স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলা সাহিত্য পড়ার জন্য কলকাতায় আসেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

সাহিত্য জগতে মজুমদারের প্রবেশ পরিকল্পিত ছিল না। শৈশব থেকেই একজন উদাসী পাঠক হওয়ায়, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে প্রচুর পড়া চালিয়েছিলেন এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ তাকে তৎকালীন বাংলার প্রাণবন্ত থিয়েটার সংস্কৃতিতে আগ্রহী করেছিল। তাঁর বন্ধুদের নিয়ে একটি নাট্যদল গঠন করেন এবং সেই যুগের প্রখ্যাত নাট্যকারদের লেখা কয়েকটি প্রশংসিত নাটক পরিবেশন করেন। মৌলিক কিছু করার এই তাগিদই মজুমদারকে তার লেখা প্রথম ছোটগল্প - 'অন্তরাত্মা' লিখতে প্রেরিত করেছিল। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথমবার কলকাতার রেসকোর্সে প্রবেশের সময় মজুমদারের বয়স ছিল ২৬ বা ২৭। সেখানে প্রশংসিত লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং গায়ক দেবব্রত বিশ্বাসকে পেয়ে তিনি অবাক হয়েছিলেন। জীবনের প্রথম ঘোড়দৌড়ের ইভেন্টে যা দেখলেন, তা মাথায় আটকে গেল। একটি ঘোড়া-ঘোড়া কেবল তখনই মূল্যবান, যদি এটি দৌড়ে জয়ের জন্য যথেষ্ট দ্রুত দৌড়াতে পারে। একবার এটি আহত হয়ে গেলে, এটি বেঁচে থাকার কোন কারণ নেই। "আমরা সবাই দৌড়ে দৌড়াচ্ছি" — মজুমদার বললেন — "অন্তত ঘোড়ার একটা লক্ষ্য আছে। আমাদের কি আছে?' আর তাই তিনি লেখেন তার প্রথম উপন্যাস, 'দৌড়' [দ্য রেস]। এটি তাকে তাৎক্ষণিক খ্যাতির দিকে নিয়ে যায় এবং এর পরে লেখক হ'তে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

যখন সমরেশ মজুমদারের কথাসাহিত্যের কথা আসে, তখন তাঁর প্রায় সব পাঠকই প্রথম যে বিষয়ে কথা বলেন তা হল তাঁর রাজনৈতিক ট্রিলজি — 'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা' এবং 'কালপুরুষ', ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত।

যদিও তৎকালীন সাহিত্যের একটি বড় অংশ এই অস্থির রাজনৈতিক উত্থান-পতনে সাড়া দিয়েছিল, তবে খুব কম লোকই সাধারণ শহুরে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে মজুমদার তার ট্রিলজিতে যথাযথ কার্যকরীভাবে তা তুলে ধরেছিল।

**সমরেশ মজুমদারের জীবন কথা :**

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২৬-এ ফাল্গুন উত্তরবঙ্গে সমরেশ মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম ছিল কৃষ্ণদাস মজুমদার ও ঠাকুরদা পূর্ণচন্দ্র মজুমদার দু'জনে চাকরি করতেন টি এস্টেটে। সেই কারণে তাঁর জীবন কাটে চা বাগানের প্রাকৃতিক নির্মল পরিবেশ, অথচ আদি নিবাস নদীয়ার গেদে গ্রামে। তাঁর মায়ের নাম ছিল শ্যামলী দেবী। সমরেশ মজুমদারের শিক্ষাজীবন শুরু হয় চা বাগানের পাঠশালাতে ১৯৪৫ সালে মাত্র তিন বছর বয়সে। ঠাকুরদা ভবানী মাস্টারের পাঠশালায় ভর্তি করেন। তাকে পাঠশালা থেকে নিয়ে যাওয়া ও আসার কাজ

করতেন তাদের বাড়ির কাজের লোক ঝাড়ি। তাকে সমরেশ মজুমদার ঝাড়ি কাকু নামে ডাকতেন। ছেলেবেলায় আর একজন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসেন তাঁর নাম ছিল 'সতী মাস্টার' এই মানুষটির সাথে তিনি ছেলেবেলায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯৪৭ সালে সমরেশ মজুমদার যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন তখন তার বয়স ছিল ছ' বছর। তার কিছুদিন পর ১৯৪৮ সালে সমরেশ মজুমদারের পরিবার চা বাগান ছেড়ে জলপাইগুড়িতে চলে আসেন এবং জলপাইগুড়ির তিস্তা পাহাড়ের হাকিম পাড়াতে বসবাস করতে থাকেন। জলপাইগুড়ির সবচেয়ে ভালো স্কুল ছিল জেলাস্কুল, সমরেশ মজুমদার জলপাইগুড়ি এসে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেননি কারণ সেই সময়টা ছিল শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি, এই জেলা স্কুলে ভর্তির সময় এই স্কুলের হেডমাস্টার নারায়ণ চন্দ্র সমরেশ মজুমদারকে প্রশ্ন করেন; 'তোর কটা মা?' সমরেশ মজুমদার উত্তরে বলেন একজন জন্মদাত্রী, দ্বিতীয় জন জন্মভূমি, তৃতীয় মা সারদা। তিনি তাঁর বড় পিসি মায়ের কাছ থেকে এই কথা শিখিয়েছিলেন। সমরেশ মজুমদারের ছোটবেলা থেকে গল্প উপন্যাস পড়ার প্রতি ঝোঁক ছিল। তিনি জলপাইগুড়িতে থাকাকালীন 'দেশ' পত্রিকার সাথে পরিচিত হন। সমরেশ মজুমদারের ঠাকুরদা ছিলেন তাঁর জীবনের প্রধান আশ্রয়, যিনি তাঁর স্বপ্ন ছেলেদের মধ্যে দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছিলেন, তা বাস্তবায়িত না হলে তিনি তার নাতিকেই বেছে নিয়েছিলেন। বড় পিসিমা ছিল সমরেশ মজুমদারের একমাত্র স্নেহের ঠিকানা। নামমাত্র কর্তব্য পালন করে গিয়েছেন তার পিতা। পরীক্ষায় যদি কখনো সমরেশ মজুমদারের কম নম্বর আসত তখন তার পিতা বকাবকি করতেন। সমরেশ মজুমদারের স্মৃতিচারণা থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

"মনে আছে পিতামহের কোন উক্তিতে খুব অপ্রসন্ন হয়েছিলেন বাবা। কিন্তু সেটা তিনি বড় দিদিকে বলেছিলেন, পিতামহকে বুঝতে দেন নি। বাড়িতে এলেই উনি আমার পড়ার ঘরে চলে আসতেন। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করতেন, 'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?' মাথা নেড়ে বলতাম ভালো, 'বিড়ি সিগারেট খাচ্ছ নাকি?' 'যখন নিজের রোজগার করবে তখন ওসব খাবে।" (জীবনটাকে চোখে দেখুন, পৃ.৩১)

১৯৬০ সালে সমরেশ মজুমদার ইকোনমিক্স অনার্স নিয়ে কলকাতায় পড়তে আসবেন বলে ঠিক হয়। "এক জীবনে অনেক জীবন" এই রচনাটির প্রাপ্ত তথ্য থেকে পাওয়া যায় কলকাতায় এসে সমরেশ মজুমদারের দুটি অভিজ্ঞতা হয়, এক পতিতাপল্লী দর্শন, দুই রুমমেট দিলীপ বাবুর সাথে রাত্রিবেলায় কলকাতা দর্শনে বেরিয়ে রাতের কলকাতার অনন্য রূপ দেখা। সমরেশ মজুমদারের সময় স্কটিশ চার্চ কলেজে দুটি দল ছিল একটি ছিল ছাত্র ফেডারেশন অপরটি ছিল ছাত্র পরিষদ। তিনি ছাত্র ফেডারেশনের সমর্থক ছিলেন। সতী মাস্টারের হাতে বাল্যকালে কমিউনিজম এর পাঠ গ্রহণ করেন, কলেজ জীবনে এসে তা পূর্ণতা পায়। ১৯৬৩ সালে সমরেশ মজুমদার বাংলা অনার্সে ভালো রেজাল্ট করে ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমরেশ মজুমদার পত্রিকা বের করার জন্য কলেজে পড়ার শেষের

দিক থেকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের শেষে তিনি দুটি পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন। যেগুলি হল 'পাবক' এবং 'সময় চিহ্ন কণ্ঠস্বর'।

সমরেশ মজুমদারের জীবনে প্রেম এসেছিল জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু সেই প্রেমে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। এই ঘটনা নিয়ে 'এই আমি রেনু' নামে ১৯৭৬ সালে তার দ্বিতীয় উপন্যাস 'আনন্দলোক' পত্রিকায় এবং 'শিলালিপি' থেকে ১৯৭৮ সালের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সমরেশ মজুমদার এর 'দৌড়' নামের প্রথম উপন্যাসটি ১৯৭৫ সালে প্রকাশ পায়। যেটি লিখে সমরেশ মজুমদার জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বুদ্ধদেব গুহ সমরেশ মজুমদারের 'দৌড়' উপন্যাসটি পড়ে বলেছিলেন,

"তোমার দৌড় অনবদ্য অনেক দূর দৌড়াবে তুমি।"

আবির্ভাব লগ্ন থেকে সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসের কাহিনী উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রিক হলেও তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি কলকাতাকেন্দ্রিক নগর জীবনকে উপস্থাপিত করেছে। সমরেশ মজুমদার কলকাতার নগর জীবন ও প্রকৃতি কেন্দ্রিক উত্তরবঙ্গের জীবনের মেলবন্ধন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস প্রকৃতিকেন্দ্রিক, উত্তরবঙ্গের জীবন দিয়ে শুরু হলেও কলকাতার জীবন প্রবাহে তা শেষ হয়েছে। সমরেশ মজুমদারের লেখনীর কাহিনী সীমা বাঁকুড়া, পুরুলিয়, মেদিনীপুর, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন পুরুলিয়ার প্রেক্ষাপটে 'ঠিকানা ভারতবর্ষ, বীরভূমের প্রেক্ষাপটে 'কালবেলা', সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে 'দাউ দাউ আগুন', লেখা হয়েছে।

**সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট :**

সেই সময় বৃহত্তম ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দল ছিল জাতীয় কংগ্রেস। ভারতবর্ষকে কংগ্রেসের হাতে সমর্পণ করা ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে স্বাধীনতার অনেক আগে থেকে। সমরেশ মজুমদারের 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসটিতে পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন রাজনৈতিক বিবর্তনের চিত্র রচিত হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে সমকালের খাদ্য আন্দোলনের রাজনৈতিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে এই উপন্যাসের কাহিনীর আড়ালে। স্বাধীনতা দিবসের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এই উপন্যাসের প্রথম ভাগে, যেখানে হরবিলাস রায়কে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করার জন্য। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ছিলেন যিনি। দেশভাগে কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে কমিউনিস্টরা মেনে নিতে পারেননি। প্রকাশ্য মিছিল বের করে বিরোধিতা করেছে। গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ হীন ভারতবর্ষের দাবি তুলেছিল তারা। যার ছবি উপন্যাসে বর্তমান।

জলপাইগুড়িতে হঠাৎ একটা মিছিল বেরিয়েছে সেটা নাকি কংগ্রেসীদের মিছিল নয়। তারা কংগ্রেসীদের গালাগালি দিচ্ছিল। পুলিশ নাকি খুব লাঠির বাড়ি মেরেছে। (উত্তরাধিকার, পৃ.৬২)

**চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য:**

মজুমদারের ছোটগল্প এবং উপন্যাসগুলি নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের জন্য অভিযোজিত হত। নির্দেশক গৌতম ঘোষ মজুমদারের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'কালবেলা' এর ভিত্তিতে ২০০৯ সালে চলচ্চিত্র 'কালবেলা' নির্মাণ করেন, যা ছাত্র আন্দোলন, আইডিয়লজি, এবং রাজনৈতিক উত্থানের সময়ে প্রেমের গল্প। ২০১৪ সালে, নির্দেশক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী আরো একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে 'বুনো হাঁশ' নামক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, যা একটি উদ্দীপক যুবকের সঙ্গে থাইল্যান্ডে মাইগ্রেট করার চেষ্টা সম্পর্কে বলে।

মজুমদারের 'যুবক অর্জুনও' ২০১৭ সালে বড় পর্দায় এসেছে। এর আগে, তিনি নিজেই তার নিজের উপন্যাস থেকে 'তেরো পার্বন' নামে একটি দৈনিক সোপ তৈরি করেছিলেন, যা টেলিভিশনে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তার 'সাতকাহন' উপন্যাসটিও দুটি ভিন্ন বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল দ্বারা দুবার রূপান্তরিত হয়েছিল। মজুমদার বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্য তার নিজস্ব উপায়ে সিনেমার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।

চা বাগানে বেড়ে ওঠা মজুমদার তার বেশিরভাগ উপন্যাস ও ছোটগল্পের সূচনা করেছেন বা উত্তরবঙ্গের সবুজ ও কুয়াশাচ্ছন্ন ভূখণ্ডে ফিরে গেছেন। তার বেশিরভাগ লেখার মধ্যে যা প্রধান হয়ে উঠেছিল তা হল অভিবাসী চা বাগান সম্প্রদায় এবং উপজাতীয় জনগণের সাথে তার বন্ধুত্ব। 'দেশ' পত্রিকার দুর্গাপূজা সংস্করণে প্রকাশিত তাঁর শেষ উপন্যাস 'উনকি'ও পাঠকদের সেই জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তিনি বড় হয়েছিলেন, চা বাগান গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে।

সমরেশ মজুমদার ছিলেন সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য লেখক। তিনি থ্রিলার, ভ্রমণকাহিনী, কথাসাহিত্য এবং শিশুদের সহ ২০০ টিরও বেশি উপন্যাস এবং ছোটগল্প লিখেছেন।

**সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসগুলির সাধারণ শ্রেণিবিভাগ :**

**১। পারিবারিক সামাজিক উপন্যাস :**

সামাজিক উপন্যাস বলতে আমরা যেটা বুঝি যে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিবরণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা। সমরেশ মজুমদারের সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম হলো 'আত্মীয়-স্বজন' ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস গুলির মধ্যে অন্যান্য উপন্যাস গুলি হল—

'অসুখ লতার ফুল', 'উত্তরাধিকার', 'জন্ম দাগ', 'বালিকার প্রথম প্রেম', 'মেঘ ছিল বৃষ্টিও', 'ছায়ার শরীর', 'দায় বন্ধন', 'অনেকেই একা', 'গর্ভধারিনী', 'সাতকাহন', 'নিকট কথা', 'বিলে পানি নেই'।

**২। রাজনৈতিক উপন্যাস :**

মজুমদারের নামটা রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি সার্থক নাম। সমরেশ মজুমদারের রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম হলো 'এত রক্ত কেন' এই উপন্যাসের কাহিনী ত্রিপুরার রাজনৈতিক অবস্থা কে কেন্দ্র করে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি হল—

'কাঠ কয়লার আগুন', 'আট কুঠির নয় দরজা', 'দাউ দাউ আগুন', 'গর্ভধারিনী', 'কালপুরুষ', 'ঠিকানা ভারতবর্ষ', 'কালবেলা'।

**৩। ঐতিহাসিক উপন্যাস :**

'শরণাগত' উপন্যাসটি সমরেশ মজুমদারের একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস এখানে বিন্দুসারের পুত্র অশোকের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।।

**৪। রোমান্টিক উপন্যাস :**

রোমান্টিক উপন্যাস বলতে প্রেম সম্পর্কীয় বিচিত্র ঘটনা দুঃসাহসিকতা অতিপ্রাকৃতিক এর সমাবেশকে বোঝায়। 'এখনও সময় আছে' উপন্যাসটি সমরেশ মজুমদারের একটি সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস। লেখক তাঁর রচনার মধ্যে এই উপন্যাসটিকে সবথেকে প্রিয় রচনা বলে মনে করেছেন।

এছাড়াও সমরেশ মজুমদারের অন্যান্য রোমান্টিক উপন্যাসগুলি হল—

'আকাশে হেলান দিয়ে', 'বৃষ্টিতে ভেজার বয়স', 'ভালো থেকো ভালোবাসা', 'এই আমি রেনু', 'দিন যায় রাত যায়', 'বাসভূমি', 'নিকট কথা', 'তীর্থযাত্রী', 'তেরো পার্বণ', 'অহংকার', 'মনের মত মন'।

**৫। নগর-জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস :**

নগর-জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস বলতে নাগরিক সমাজ, সাংস্কৃতিক অর্থনীতির প্রসঙ্গ নিয়ে গড়ে ওঠে। সমরেশ মজুমদারের নগরজীবন নিয়ে লেখা অন্যতম উপন্যাস হলো 'কলিকাতা' উপন্যাসটি ১৯৮৭ সালে 'কথা সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে গ্রন্থ রূপে লাভ করে।

নগর কলকাতার কাহিনীকে কেন্দ্র করে সমরেশ মজুমদারের অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল–

'স্বপ্ন সন্ধানে', 'হরিণ বাড়ি', 'জল ছবির সিংহ', 'ভিক্টোরিয়া বাগান', 'অনেকেই একা', 'কলিকাতায় নবকুমার', 'জলের নিচে আকাশ', 'কালপুরুষ', 'দৌড়'।

**৬। রহস্য উপন্যাস :**

রহস্য উপন্যাস মূলত অপরাধমূলক ঘটনা—খুন, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি ঘটনা রহস্যজনক গোয়েন্দার বুদ্ধি ও দক্ষতার বলে উন্মোচিত কাহিনীকে বোঝায়। 'অনুরাগ' হল সমরেশ মজুমদার-এর একটি অন্যতম রহস্য উপন্যাস, এছাড়াও অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল-

'কালাপাহাড়', 'খুন-খারাবপি', 'লবণ হ্রদ', 'কালিম্পঙ্গে সীতাহরণ', 'দিনদুপুরেই রাত দুপুর', 'অর্জুন বেরিয়ে এলো', 'লাইটার', 'একমুখী রুদ্রাক্ষ', 'জুতোই রক্তের দাগ', 'ফুলে বিষের গন্ধ', 'দেড় দিন'।

এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা সমরেশ মজুমদারের সাহিত্যিক পথ এবং তার কৃতিত্বের বাঙালি সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ বিষয়ে এক পর্যালোচনা প্রদান করেছি। সমরেশ মজুমদার যেহেতু একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, তাঁর লেখা-কথার মাধ্যমে সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছেন। এই গবেষণার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক ও বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে কীভাবে একটি প্রাক্তন সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে, তা আমরা উপলব্ধি করেছি। সমরেশ মজুমদারের লেখার মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস, কবিতা, এবং লেখা পাঠ থেকে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ভাবনার গভীরতা ও প্রতিষ্ঠানের মানবিক বিপণন দেখা যায়। এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা সমরেশ মজুমদারের সাহিত্যিক কার্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছি এবং তার প্রতিষ্ঠানের বাঙালি সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগের উপায় উল্লেখ করেছি। এ কেবল তাঁর প্রতি একজন পাঠকের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

**উল্লেখপঞ্জি :**

১। মজুমদার সমরেশ : এক জীবনে অনেক জীবন, অগ্রহায়ণ ১৪১৯, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৮।
২। মজুমদার সমরেশ : জীবনটাকে চেখে দেখুন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৭, পত্র ভারতী, পৃ. ৩০।
৩। মজুমদার সমরেশ: বাঙালির নষ্টামি, তৃতীয় মুদ্রণ, দীপ প্রকাশন, নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ১৭২।
৪। মজুদমদার সমরেশ : আকাশ না পাতাল ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, পৃ. ৮।
৫। মজুদমদার সমরেশ : খোলাখুলি বলছি, জানুয়ারি ২০১১, পত্র ভারতী, পৃ. ৮৯।
৬। মজুদমদার সমরেশ পরাণের পদ্মবনে, বইমেলা জানুয়ারি ২০১২, সাহিত্যম, পৃ. ১২৪।
৭। মজুদমদার সমরেশ : কইতে কথা বাধে, আগস্ট ২০০০, অরুণি পাবলিকেশন, পৃ. ২৩।

*হাসান আজিজুল হক স্মরণে*

# একটা করবী গাছের পাশে স্বয়ং হাসান

**তাপস রায়**

বাংলাদেশের অন্যতম কথাকার হাসান আজিজুল হক বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিগত সমগ্র আবেগ-আকাঙ্ক্ষা কবিতার ছোট ছোট ক্ষেপে ধরে দিতে পারছিলেন না বলে ছোটগল্পের সৃষ্টি করেছিলেন। এই বক্তব্যের ভেতর কোথায় যেন কবিতার পক্ষে একটা জোরাল সমর্থন থাকে। অবশ্য বাংলাভাষার প্রথিতযশা অনেক কবিকে নিয়ে তাঁর শ্লেষদুষ্ট বক্তব্যেরও উপস্থিতি আছে। শুদ্ধ কবিতায় আস্থাহীন শক্তির পদ্যকে সমর্থন জানাতে গিয়ে হাসান একসময় বলেছিলেন, "খুব ক্যাজুয়ালি কথা বলাটা শক্তি চমৎকার রপ্ত করেছেন --- কথাটা যাই হোক না। তিরিশের বিখ্যাত কবিরা সবাই বেশ ধোপদুরস্ত, গোছগাছ না করে কোনো কথাই বলেন না। বেশ পাঁয়তারা আছে, ভাষাকে ধরে বেশ জামাকাপড় পরানো আছে, বলা হচ্ছে গদ্য প্রবন্ধ নয় বাপু, এ হচ্ছে কবিতা, ইয়ার্কি নয়। মনে হতো পদ্মাসনে না বসে সুধীন দত্তের কবিতা পড়া যাবে না --- কত জ্ঞান, কত পাণ্ডিত্য, কি বিপুল পড়াশোনা--- কবিতা পড়বো কি কেবলই মনে হতো, আরে এসব কিছুই তো জানি না। প্রেমেন্দ্র মিত্র অসম্ভব চেঁচিয়ে কথা বলতেন, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় কিসব মহাজাগতিক ব্যাপার আর বুদ্ধদেব বসুর আদিখ্যেতার জ্বালায় তাঁর কবিতা প্রবন্ধ পড়া ভারি বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াতো। কি কি ভালো লাগতে হবে, ভালো লাগাতে হবে সব তিনি বলে দিতেন আর ছিল একটা বাবু আলগোছ ভাব যা ধুলোবালি কাঁকর ধোঁয়া কুয়াশাভরা জগৎটাকে ভারি ঘেন্না করত।"

এই কথাগুলো জানার পর বলা যেতে পারে হাসান আজিজুল হক সমকালীন বাংলা কবিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন একটু বেশিই। তাঁর গদ্য রচনার ভেতর একটা কবিমন বিশেষ হয়ে দেখা দেয়নি কি! মনে হবে না কি 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' যদি কোনো গল্প গ্রন্থের নাম হয়, তবে লেখক সচেতনভাবে ভাবনা বৃত্তে সুররিয়ালিজমকে প্রশ্রয় দেন! এটা কোনো কবিতা বইয়ের নাম হতে পারে! ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হলেও এই বই আমার হাতে আসে ১৯৮৫ সালে। তখনই প্রথম আমার হাসান আজিজুল হক পাঠ।

উৎসর্গ পাতায় লেখা আছে, 'আব্বাকে, যাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার রৌদ্রে বার বার ফিরে গেছি।' অভিজ্ঞতাকে কোন গদ্যকার রৌদ্রের রূপকে পরিবেশন করেন! পাতা ওল্টানোর আগেই শিহরণ ঘটে যেতে পারে নবীন পাঠকের।

তারপর পাতা ওল্টাতেই স্নিগ্ধতা ডানা মেলে দিল। প্রথম বাক্য এরকম। "এখন নির্দয় শীতকাল, ঠান্ডা নামছে, হিম আর চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়।" --- কল্পনার উড়ানে পাঠককে চাপিয়ে নেয়া গেল। এই কাজ কবি করে। কবি রূপের ভেতর অরূপের সাধনা করে।

এরপর খোঁজ করতে করতে দেখা গেল, হাসানের উপন্যাসের সংখ্যা পাঁচ। গল্পের বই দশ। আর কিশোর সাহিত্য দুটি। কোনো কবিতার বই নেই। কিন্তু তা কী করে সম্ভব! এই যে যাঁর হাতে কবিতার টান-টোন তিনি কবিতা না লিখে থাকতে পারেন নাকি! এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল, অনীক মাহমুদ ও রফিকুল হাসান সম্পাদিত 'নবতরঙ্গের ধ্বনিবদ্ধ' বইতে হাসানের সাতটি কবিতা একত্রে ছাপা হয়েছে।

তা কি এমনি এমনি! হাসান যে তাঁর সমকালের প্রখ্যাত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ফ্যান। তাঁর যে একটা প্রবন্ধ আছে, 'শক্তি, শক্তিদা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়' নামে। এই নামকরণ থেকে লেখকের প্রাণের আকুলতার ঝোঁকটিকে দেখে নেয়া যায় বৈকি! হাসানের শক্তিপ্রেম, নিজেই বলছেন 'টাইম' পত্রিকায় দেখা শক্তির ছবি থেকে। সেই ছবিতে ছিল শক্তিকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তো এর পরে ওই একই গদ্যে হাসান জানাচ্ছেন তিনি শক্তির কবিতা কিছু কিছু পড়েছেন। আবার পর মুহূর্তে বলছেন, পুরো ষাটের দশক জুড়ে শক্তির কবিতা খুব পড়েছি। আর মতামতও দিচ্ছেন, " আমার মনে হত, শক্তির কবিতা সুবোধ্য কি দুর্বোধ্য জানি না, কবিতার বেলায় সেটা জানা তেমন জরুরি নয়, কারণ কবিতা গণিতের আঁক নয় যে দুশো তিনশো বছর ধরে এক একটা জটিল ধাঁধাঁ প্রহেলিকা হয়ে থাকবে। কবিতা থেকে যা পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট, এক-একটা নিটোল বোধের এককের মতো।"

এদেশে কবিদের গদ্যকার বলা হত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দীকে। জীবনানন্দের কবিতা পড়ে সেই আবেশে গল্প লিখতে বসে যেতেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রধান শক্তি ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি। কাহিনির বর্ণনার স্বতঃস্ফূর্ততাই তাঁর গল্পের প্রাণ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই গল্পের সঙ্গে পথচলা শুরু করে। এই যাওয়ার ভেতর তিনি নিশ্চিত করে নিতেন—গল্প যেন পাঠকের হাতে না চলে যায়। চাইতেন একটা ম্যাজিক। চাইতেন সূক্ষ্ম, সংবেদনশীল হৃদয়ের বনে ক্রমাগত সৌন্দর্যবোধের সত্য। তাঁর 'চন্দ্রমল্লিকা' গল্প শুরু হচ্ছে এভাবে, "আকাশটা সুন্দর ছিল। ভারী সুন্দর আকাশ। মেঘ ছিল বকের পাখার মতন শাদা। ধবধবে দুখণ্ড মেঘ পশ্চিমদিকে চুপ করে শুয়ে ছিল। আর সারা আকাশ জুড়ে গভীর নীল প্রশান্তি। আর কিছু ছিল না। একটা পাখিও না। দূরগামী উদাসী কোনো চিলের ক্ষীণতম চিহ্নও কোথাও ছিল না। ছিল শুধু ঝকঝকে রৌদ্র।" পাঠকের মনে হবে না কি কবিতা এসে দৃশ্য অধিকার করে রেখেছে! আমরা হাসানের গল্পের ভেতর এই অমেয় কবিতার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়তে দেখিনি কি? দেখুন 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পটি কীভাবে শুরু হচ্ছে। --- " এখন নির্দয় শীতকাল, ঠান্ডা নামছে, হিম আর চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়। অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়। ওদিকে বড় গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাহাত খানের বাড়ীর টিনের চাল হিমঝকঝক করে।"

এই লেখার শুরুতে তাঁর কবিসত্ত্বা খুঁজতে গিয়ে সাতটি কবিতা লেখার কথা বলেছি, আবার শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিয়ে তাঁর ভাবনা জগৎ দেখে বেশ প্রফুল্ল হয়ে গেছি। হায় আল্লা, হাসান যে একটা গদ্য লিখেছেন, 'ফুরায় না সব লেনদেন' নামে! চমকে উঠতেই হবে।

জীবনানন্দের কবিতার একটা লাইনকে টুকুস পালটে দিয়ে নিজের মতো করে ফেলার জন্য যে অনুভবের গভীরতা দরকার হয়, তাতে তো কবিতাময়তা ধরা দিচ্ছে! এই গদ্যটিতে জীবনানন্দ না বলে তিনি যে বুদ্ধদেব বসুকে বলছেন! তিনি যে দেখতে পেয়েছেন আধুনিক বাংলা কবিতার ভগীরথকে। একজন সফল গল্পকারের চোখে বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ার যেন মায়াঅঞ্জন পরিয়ে দিয়েছে। হাসান বাংলা কবিতার তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট --- তীক্ষ্ণ, নিবিড় অনুসন্ধান করে গেছেন বুদ্ধদেব ঝোঁকে। বলেছেন টানা ২৫ বছর কেমন করে বুদ্ধদেব তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় বাংলা কবিতাকে ধারণ করে রেখেছিলেন।

বুদ্ধদেবকে বাংলা আধুনিক কবিতার গঙ্গা উৎস বলে চেনাতে চেনাতে বাংলাদেশের কবিতা জগতে যে অনায়াস পায়ে ঢুকে পড়েন, তাতে গল্পসম্রাট হাসানকে আর কবিতা-পৃথিবীর বাইরের লোক বলে ভেবে নেয়া যায় না। আর তাঁর সেই গদ্যের ভাষাও তো নদীর স্রোতের মতো কুলকুল করে --- " বন্দরে এসেছিল ঠুনকো ফিনফিনে কাঁচের তৈরি একটি আলোকিত জাহাজ। তার মাল খালাস করে যা ঘরে তোলা হয়েছিল, কিছুই তার টেকেনি। দেশের রোদ জল হাওয়া সইতে পারেনি। তবু সেসব সামনে রেখে, তাদের আদর্শ হিসেব নিয়ে ষাটের দশকের নতুন প্রজন্ম, প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে, ভুলে দেবতাদের সাধনায় অর্ধেক একটা দশক প্রায় অপচয় করে বসেছিল। আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর পিছনে দৃষ্টি দিলে মনে হবে মাঠভর্তি ফসল আদৌ পুষ্ট হয়নি, পাকেনি, রং ধরেনি, টেকেনি অকালেই ঝরে পড়েছে। যা টিকে গেছে তা দশকের তোয়াক্কা রাখেনি। দুই বাংলার সাহিত্যেই এই একই ঘটনা ঘটে গেছে। তর্কের উদ্দেশ্যে হয়তো শামসুর রাহমান, সৈয়দ হক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, শহীদ কাদরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহদের উল্লেখ হবে। এঁদের কারো শুরু ষাটের দশকে নয়। অন্যদিকে অবশ্যই উল্লেখ হবে আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহার। তখন মনে পড়বে গ্রহণ-লাগা সূর্যের দিকে খালি চোখে তাকাননি। শেষ ষাট থেকে তাঁদের উঠে আসা, বিকাশ পূর্ণতা মুক্তিযুদ্ধের পরে। আর রফিক আজাদ যতোই থাকুন ষাটের দশকের উন্মাদনার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে, তিনি যে শেষ পর্যন্ত মাটিতে পা রাখেন, তিনি যে কৃষক হয়ে যান, তার ঘন ঘন সর্দির ধাত কেটে যায় খালি-মাথায় রোদবৃষ্টিসাঁতলা বাতাসে বাংলার বুকের ভিতরে ঢুকে পড়ার আকুতিতে। আর খুব তর্ক হবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে নিয়ে। বুদ্ধদেব বসুর চাই আনন্দের সাহিত্য, চাই বুদবুদের সাহিত্য, চাই কবিতার মধ্যে শুধু কবিতা, আত্মপরতায় পরিপূর্ণ দায়হীন নিছক শিল্পের কাছে নতজানু ---- এই মন্ত্র ইলিয়াস কতকাল জপেছিলেন, এখন আর তা খুঁজে পেতে অসুবিধা নেই।"

অনুভবের চলাচল হলো কবিতা। বা অনুভবের শরীর পাওয়ার নাম কবিতা ধরে নেয়া যাক। রবীন্দ্রনাথ রাজা নাটকে বলছেন, "কোন মাধুর্যের সন্ন্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো— ইচ্ছে করছে চোখে দেখা, কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই, হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহনপথের কুঞ্জবন আছে, সেখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে যাই।" স্তেফান মালার্মে শুদ্ধ কবিতার সন্ধানে ভাষার অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলেন। কবিতা তো অনুভব, আর ভাষা

তার আবরণ। সে এক ইনভিজব্যল ম্যানের মতো, দেখা যাচ্ছে না তাকে, তার কার্যকলাপ টের পাওয়া যাচ্ছে। "তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলে আর পাব না।" একটা করবী গাছ কীভাবে নিজের মেয়ের প্রতিরূপ হয়ে যায় তা দেখাতে যে বাকপ্রতিমার ব্যবহার তা তাবড় কবির সামনে অপার বিস্ময় মেলে ধরতে পারে এই ' আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে তাই-ই উপস্থিত।

মন্দিরের ঘন্টাধ্বনির ভেতর যেমন কোনো বক্তব্য থাকে না, ঘোষণা থাকে না, কবিতা তেমন একটা অনুভবের কাছে যেন পৌঁছে যাওয়া। আমরা জানি শব্দের নিজস্ব কোনো রং নেই, মাত্রা নেই, সংকেত নেই। ব্যবহারকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে শব্দ কী মানে বয়ে আনবে। মানে আমারই চেতনার রঙে পান্না সবুজ হবে কি না আমি ঠিক করব। আমার ঠিক করার আগে সে টুকরো পাথর, তার কোনো দাম নেই। এখানেই কবির কেরামতি। এমন একটা আন্তঃসম্পর্ক বয়ন করবেন যে দৃশ্য নতুন হয়ে উঠবে। তার হাতের তাঁতের মাকুটিকে দিয়ে তিনি বলিয়ে নেন, তাঁতের শাড়িটি দেখতে কেমন হবে। কবি যেভাবে দেখবেন, সেভাবেই দেখতে হবে শাড়িটি। তাতে চোখের অভ্যাস, মনের অভ্যাস-এ ধাক্কা লাগলে কিচ্ছুটি করার নেই। কবি এই ফাঁদ পাতবেনই। তাঁর দৃশ্যের ভেতর দিয়ে যেতে হবে পাঠককে। বলা যেতে পারে, এ হল জাদুকরের খেলা রে ভাই, জাদুকরের খেলা। হাসান জাদু ছড়িয়েছেন এই গল্পে।

"রাহাত খানের টিনের চাল দেখা যাচ্ছে না আর, পুল কোথায়, বিল সরে গেছে কখন। চাঁদমণির বাড়ির লোকজন চুপ করে গেছে এখন। একটা মুরগীর শোক আর কতক্ষণ থাকে! কাল হয়ত বসু বাবুদের ইঁটখোলায়, না হয় সরকারদের পড়ো বাড়ির ভেঙে-পড়া সিঁড়ির ঘরের মধ্যে বেচারীর চকচকে পালক, হলদে ঠ্যাং কিংবা ঠোঁটের খণ্ডাংশ পাওয়া যাবে। চাঁদমণির বাড়ির লোকজন কাজেই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু বুড়িটা বসে আছে, ফাটা পায়ে তেল ঢালছে আর পিদিমটা কেন নিভছে না তা পিদিমটা ছাড়া আর কেউ জানে না। কি ঠাণ্ডারে বাবা—বউ অ বউ, আর একটা খ্যাতা দে, মরে গেলাম, হেই বউ।"

রূপ আর রূপকের হাত ধরে চলাচল। ছবির কথা বলে ওঠা। রূপকে, প্রতীকে, ইঙ্গিতে আখ্যান কীভাবে রসবতী হয় হাসান দেখান এই গল্পে। গদ্য ও পদ্যের অন্তর্বর্তী যে সরু রেখাটি তা তিনি নিজে নিজে টপকে যান আবার ফিরে আসেন। তাঁকে এই যাতায়াত করতেই হয়। তিনি যে এই গল্পে বাঙ্গালির মননজগতে র‍্যাডক্লিফ লাইনের যে বিপর্যয় ঘটে গেছে তাকে প্রকাশ করতে চান। এই মারাত্মক রেখাটি কি পাহাড়ের মতো দূর্ভেদ্য হবে, নাকি নদীর জলের মতো সুরেলা হবে, তার বিবাদভঞ্জনে নির্দিষ্ট হতে পারে না ভাষা। হাসান গ্রামের সূচিভেদ্য দারিদ্রের ছেঁড়াকাঁথায় দোরখা সেলাই দিয়ে সুজনীকাঁথাটি বয়ন করেন।

আমাদের শিল্পে বিষয় প্রতিষ্ঠার প্রচলিত ধারণাটিকে তাৎপর্যহীন করে চিন্তার উদ্ভাষণে ব্রেতোঁ বলেছেন, " A psychic automatism with the help of which we propose to express the real functioning of thought, either orally or in writing or in any

other way, a dictation of thought without any control by reason outside all aesthetic or moral preoccupation." আমরা দেখেছি নতুন পৃথিবী তৈরি করছেন কবি জীবনানন্দ, যা সত্যি নয়। বলা যাবে যা কেজো নয়। "হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে/ সাদা থাবা বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে/ তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে, / সমস্ত পৃথিবীর ভেতর ছড়িয়ে দিল।" 'বেড়াল' কবিতায় এই বিড়ালটি কবিরই সৃজন, তার জাগতিক কোনো অস্তিত্ব নেই। তাকে দিয়ে জাগতিক মানুষের মাথাব্যথাও নেই।

হাসান আজিজুল হক এরকম একটা ঝিমধরা অন্ধ রাতের দৃশ্য আঁকেন। "পাখিদের কোনো গান নেই এখন। শব্দ যা শোনা যাচ্ছে চাপা। কুয়াশা আর হিম জড়িয়ে আছে ওদের। সামনে বিড়ালটা যখন পার হয়ে গেল, শুধু দুটি জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল তার।" একটা ভয়ঙ্করকে তুলে আনার জন্য এই অন্ধকার আঁকা। হাসান সর্বনাশ দেখানোর আগে আরো অন্ধকার তুলে আনেন, "পেছনের জামগাছটা কালো—তার পেছনে সব কালো এবং নির্জনতা। আর এইসব ছাড়িয়ে যেতে আরো নির্জনতা, পোড়ো জমি, জঙ্গল, পানের বরজটা, কাশ আর লম্বা ঘাস, আর মজা পুকুর এবং বিল। এখন ডাইনে দড়ি দিয়ে ঝোলানো বাঁশের গেট। গেট পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জমি চিৎ হয়ে শুয়ে। কিছুই ফলেনি সেখানে। ইনাম এখন পিছনে আছে, অনেকটা পিছনে, এমনকী ফিরে যেতে পারে হঠাৎ এমন মনে হচ্ছে। লাল আলোটা আসছে কাঠের রড লাগানো জানালা দিয়ে, মজা পুকুরে শিয়ালের চকচকে চোখ ঝিলিক দিচ্ছে কিছু খুঁজে।"

এটি তাঁর দ্বিতীয় বই। প্রথম বই 'সমুদ্রের স্বপ্নঃ শীতের অরণ্য' বেরিয়েছিল ১৯৬৪-তে। আমাদের এই আত্মজাকে নিয়ে লেখা দ্বিতীয় বইটি ১৯৬৭-র। এই সময়টুকুর ভেতর নিজের লিখনশৈলীর ছেঁড়া-ফাটা তিনি সারিয়ে তুলেছেন। মানে নিজের আইডন্টিটি কীভাবে হবে, তার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। প্রথম থেকেই তাঁর তীব্র অন্তর্দৃষ্টি আর দৃশ্যের নিখুঁততার দিকে নজর তো ছিলই, এখন যোগ হলো ভাষার স্বকীয়তা। কবিতার ছন্দ-প্রতিমা দিয়ে গল্পের শরীর বয়নের অধিকার হাতে নিয়ে ফেললেন। গল্পের ভেতরের সত্য প্রতিষ্ঠায় রুপক-প্রতীককে শাণিত করে নিলেন। তিনি অধ্যাপক, জানেন শিল্পের ইতিহাস কন্টেন্টের ইতিহাস নয় ততটা যতটা ফর্মের। মানে একটি দেখাকে তিনি কীভাবে দেখবেন, তাই-ই নতুন। গল্প নতুন নয়। এই ফর্মের কথা কবি উৎপলকুমার বসু বলছিলেন এরকম, "এই ফর্মের সেন্সিটিভিটি কীভাবে আসে? ওই যে শাওন রাতে যদি / স্মরণে আসে মোরে'—এটা গাইলে বাঙ্গালির মনোজগতের প্রতিক্রিয়ার কথা যদি ভাবেন, তাহলে ইউ আর থিংকিং ইন টার্মস অফ ফর্ম, নট ইন টার্মস অফ কনটেন্ট। কনটেন্ট ওয়াইজ জিনিসটা অত্যন্ত বাজে। রাবিশ।"

'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পও দেশভাগের প্রতিক্রিয়ার গল্প। বাঙালির মনোজগতে যে বিপুল বিপর্যয় ঘটে গেল তার গল্প। এই গল্পের গল্পটি হলো ১৯৪৭ সালের দেশভাগের

কালের। অ্যাজমার রোগী বুড়ো মানুষটি সেই সময়ের প্রতিনিধি। — " জানালার কাঠের রডে মুখ লাগিয়ে বুড়োটা চিৎকার করে, কে, কে ওখানে গোঅ্যাঁ। লাল আলোটা সরে যায় জানালা থেকে, হড়াম করে দরজা খোলে, হাতে হ্যারিকেন নিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে গেটের কাছে আসে মানুষটা। সমস্ত উঠোনটায় বিরাট ছায়া, খাটো লুঙ্গির নীচে শুকনো দুটো পা। এসে গেটের পাশে করবী গাছটার কাছে দাঁড়ায়। আলোটা মুখের কাছে তুলে ধরে লোকটা। বোশেখ মাসের তাপে মাটিতে যেন ফাটলের আঁকিবুঁকি এমনি ওর মুখ। ঠান্ডা চোখে ইনামকে দেখে। সুহাসকে দেখে, ফেকুকে দেখে, দেখতেই থাকে, বিঁধতেই থাকে, হারিকেনের বাতিটা তোলে কাঁপা হাতে, এসো, তোমরা ভাবলাম কে আসছে এত রাতে। কে আর আসবে এখানে মরতে। জেগেই তো ছিলাম। ঘুম হয় না মোটেই — ইচ্ছে করলেই কি আর ঘুমনো যায়—তার একটা বয়েস আছে — অজস্র কথা বলতে থাকে সে— মানে হয় না, বাজে কথা বকবক করেই যায়। এসো, বড্ড ঠাণ্ডা হে, ভেতরে এসো। কিন্তু ভেতরে কি ঠাণ্ডা নেই? একই রকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে।"

বাঙালির জাতিসত্তায় চুনা লাগাতে গত শতকের সবচে অবিসংবাদিত কারিক্রমটি ছিল দেশভাগ। এই সম্ভাবনাপ্রসারী লেনদেনের কারবারে কেবল র‍্যাডক্লিফ সাহেবদের গরিমা উপস্থাপন করলে চলবে না। গোবলয় সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি যে। স্বাধীনতাকামী পালের গোদাদ্বয়ের কোমরভাঙার কাজ, মানে বিয়ের রাতেই বিড়াল মারা যাকে বলে, করে দেয়া গেল। বলাবাহুল্য, পালের গোদাদ্বয় হল পাঞ্জাব আর বাংলা। তা এই ভাঙাভাঙির কারবারে বাঙালি কি দুধুভাতু ছিল! মানে খেলাটেলা জানত না! জানত। আত্মঘাতী বাঙালি ধর্মের কার্ড খেলল খিলখিলিয়ে। এইসব ডাটাচচ্চরি ইতিহাস সবাই জানে। কিন্তু এই দেশভাগে বাঙ্গালির মননের সর্বনাশের খবর কে কতটা রাখে! একটা ঋত্বিক ঘটককে দেখিয়ে আমরা মনকে চোখ ঠারি খুব।

ঋত্বিককে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, আচ্ছা 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', আর 'সুবর্ণরেখা' —এই তিনটির মধ্যে কি কোনো অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আছে? ঋত্বিক বললেন, "যোগসূত্র এই তিনটার মধ্যে একই মাত্র। সেটা হচ্ছে দুই বাংলার মিলন। দুইডা বাংলারে আমি মিলাইতে চাইছি। দুইভাবে আমি ভালোবাসি হেইডা কমু গিয়া মিঞা, এবং আমি আজীবন কইয়া যামু। আমি পরোয়াই করি না। আমার পয়সার পরোয়াই নাই। আই ক্যান ফাইট দ্যাট আউট। ঋত্বিক ঘটক ক্যান ডু দ্যাট আউট হিয়ার অ্যান্ড ইন ঢাকা। আমারে কে মারব লাথি, মারুক গা যাক। বইয়া গ্যাছে গিয়া।"

আজিজুল হক তাঁর আত্মজা ও করবী গাছকে নিয়ে এই রকম, ঋত্বিকের মতো একটা ডেস্প্যারেট চরিত্র আঁকেন। অ্যাজমার বুড়োকে সামনে রেখে অসহায় মানুষের চূড়ান্ত অসহায়তার ছবি আঁকেন। নিজের মেয়েকে তিন লোচ্চা, চোর, পকেটমারের হাতে তুলে দিতে পেছপা হয় না। ওই বুড়োর অসহায়তা মূর্ত করতে, অন্তঃসংলাপে, বিক্ষিপ্ত কথনে,

আর ঘরের ভেতর থেকে অন্ধ রাতে বেদনার্ত, অপমানে নীল হয়ে যাওয়া কান্নার স্বর শুনিয়ে হাসান দেশভাগের মর্মব্যাথা পাঠকের বুকে তুলে দিতে চান। আমাদের মনে পড়ে, 'মেঘে ঢাকা তারা'র শেষ দৃশ্যে সুপ্রিয়াদেবীর আর্তস্বর শোনা যাচ্ছিল, দাদা, আমি বাঁচব। হাসান লিখলেন, "এখানে যখন এলাম — আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই— তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ীর শব্দ আর অনুভবে নিটোল সোনারঙের দেহ—সুহাস হাসছে হি হি হি —আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে —বলে থামলো বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল—ফুলের জন্য নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।"

গল্পের উপস্থাপণ ও শৈলিতে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' একটা ইউনিক সৃষ্টি। সমস্ত গল্পের আবহ তৈরি হয়েছে উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায়। আমরা শুরুতে কেন বলছিলাম হাসান কবিতায় চুবিয়ে গল্প লেখেন, তার মোদ্দা সাপোর্টটিই হলো এই রূপক আর প্রতীকের ব্যবহার। তাঁর রূপক প্রয়োগ বহুকৌণিক। একটা কবিতা থেকে যেমন নানা ডাইমেনশনে রং-তুলির খেলা চলে, হাসানের গল্পের গোড়াতেও তেমন বহুমাত্রিকতা। গল্পকার হিসেবে অবশ্য তাঁর তেমন কোনো ঝোঁক চোখে পড়বে না। ভাষা যেন এমনি এমনি গড়িয়ে গিয়েছে। শিবনারায়ণ রায় একসময় হাসানের গল্প নিয়ে বলেছিলেন, "নিরুচ্ছ্বাস আর্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে হাসান আজিজুল হকের ধ্রূপদী বিশাল গল্পভুবন।"

হাসানের গল্প নিয়ে কথা বলার অধিকার কোনো অবস্থাতেই আমার নেই। আর আমার সব সময় মনে থাকে সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে হাসানের নিজের বলা কথাগুলিঃ "সন্দেহ নেই যে সমালোচকের নিজের যোগ্যতার মান অনুযায়ী পাঠের মান স্থির হবে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমই বা কীকরে ঘটানো যায়? সমালোচনা তো একজন পাঠক ব্যক্তি হিসেবে করবেন। কিন্তু বিপদ ঠিক এখানেই ঘটে। অধিকাংশ সমালোচকই একটা উপরের জায়গায় হাজির হতে চান, তিনি এই মৌলিক কথাটা ভুলে যান যে আগে শিল্প, তার পিছু পিছু শিল্পের সমালোচনা। আগে সাহিত্যের সৃষ্টি, তারপর সাহিত্য সমালোচনা। যদি সাহিত্য সৃষ্টি না হয় সমালোচনার কোনো জায়গা থাকে না, আগে মানুষ তারপরে তার ছায়াটা।"

এটুকু জানার পর ইঙ্গিত স্পষ্ট হয় যে হাসান জীবনবিমুখ সাহিত্যিক নন। তিনি ঘটনার দায়, সময়ের দায়, মানুষের অপচয়ের দায় বহন করতে জানেন। সামাজিক কাজ হিসেবেই তিনি লেখাকে আশ্রয় করেছিলেন। মানে কলমকে তরবারির মতো ব্যবহার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, যে বাংলাদেশের ইতিহাসই শিল্পী হিসেবে হাসানের দায়িত্ব স্থির করে দিয়েছে। এই দায়িত্বের দায় হিসেবে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' হাসানের সমগ্র শিল্পকর্মের প্রতিনিধি হিসেবে মাল্যভূষিত হবে বৈকি।

সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার দশম বর্ষ সূচনা উপলক্ষে সাহিত্য অঙ্গন সম্মান প্রদান করা হচ্ছে
কবি ও প্রাবন্ধিক অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
(কবি অলোক বন্দ্যোধ্যায় তখন অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দি)

সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার দশম বর্ষ সূচনা উপলক্ষে সাহিত্য অঙ্গন সম্মান প্রদান করা হচ্ছে
কবি সুশীল মণ্ডলকে।
(কবি সুশীল মণ্ডল তখন অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দি)

সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার দশম বর্ষ সূচনা অনুষ্ঠানে উদ্বোধক সুমিতা চক্রবর্তী।

সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার দশম বর্ষ সূচনা উপলক্ষে সোহারাব হোসেন পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে কথা সাহিত্যিক উৎপলেন্দু মণ্ডলকে।

সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার দশম বর্ষ সূচনা অনুষ্ঠানে সাহিত্য অঙ্গন সম্মান প্রদান করা হচ্ছে কথাসাহিত্যিক অমর মিত্রকে।

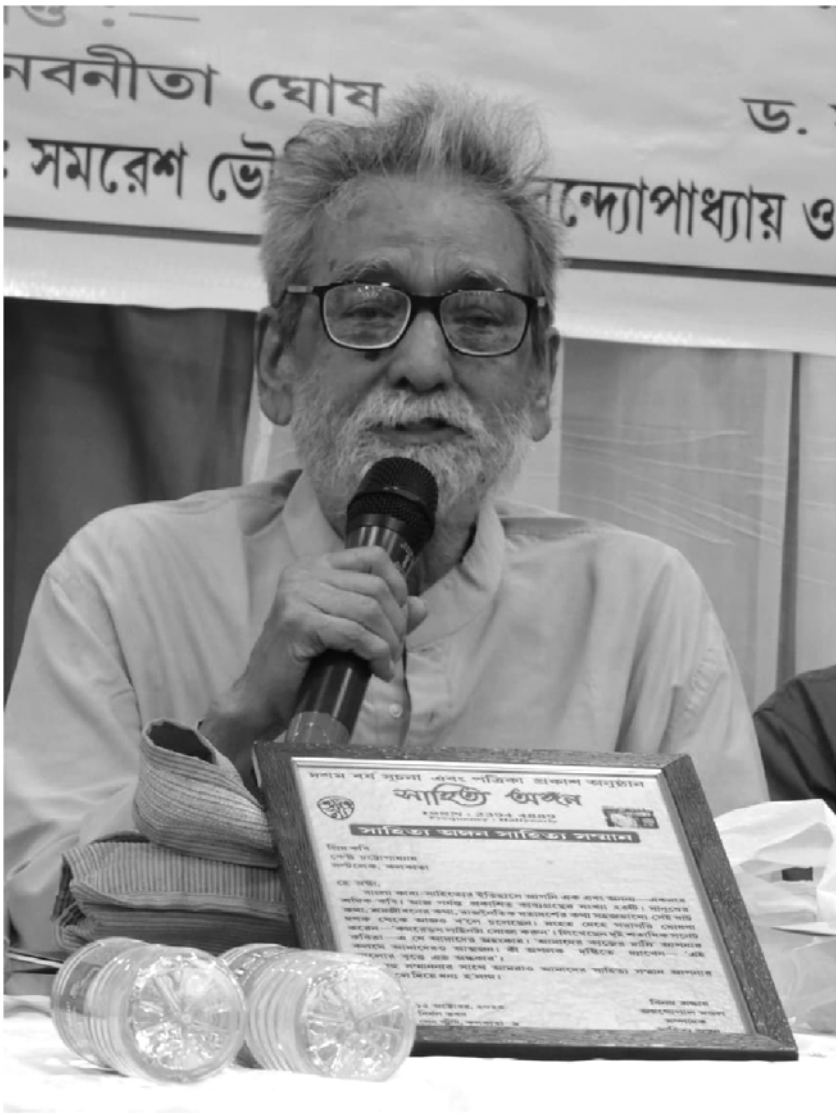


সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার দশম বর্ষ সূচনা অনুষ্ঠানে সাহিত্য অঙ্গন সম্মান প্রদান করা হয়েছে শ্রমিক-কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়কে।

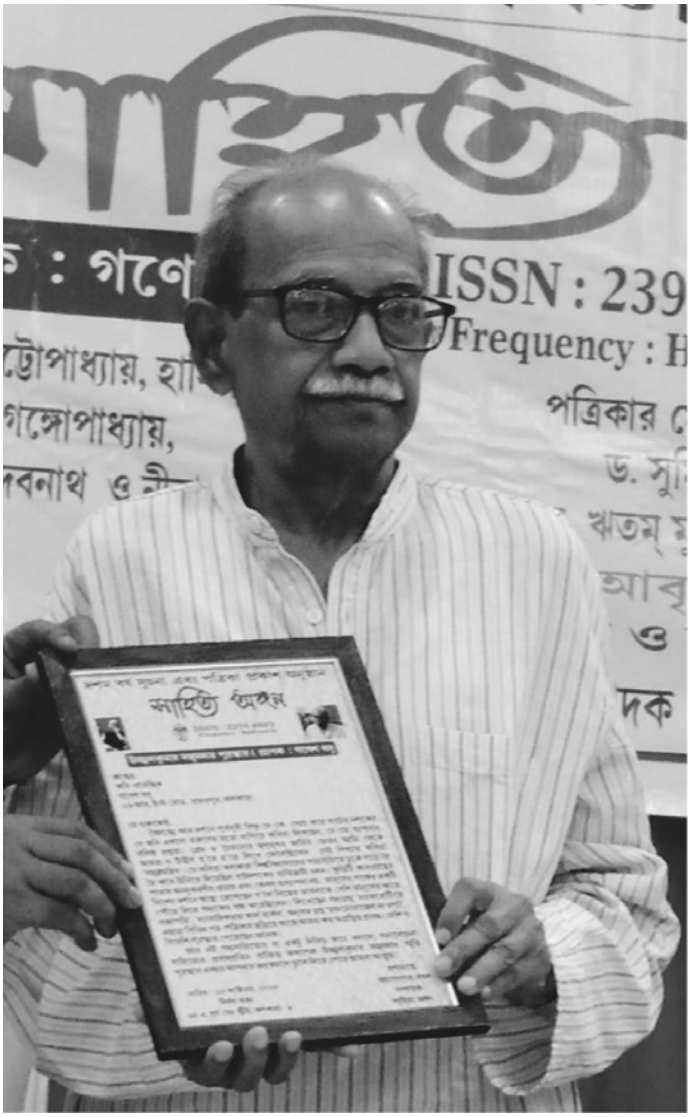


সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার দশম বর্ষ সূচনা অনুষ্ঠানে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার স্মারক সম্মান প্রদান করা হচ্ছে কবি গণেশ বসুকে।